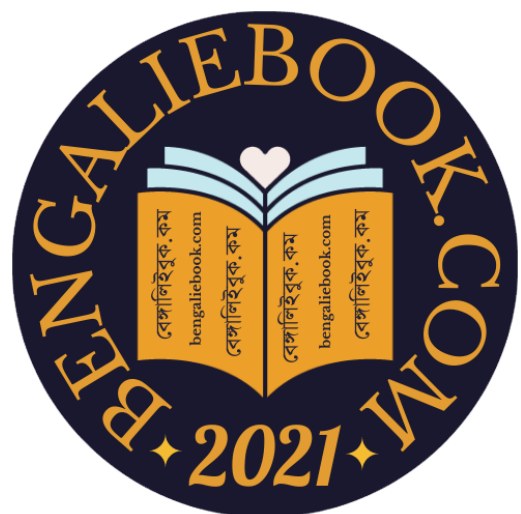


উপন্যাস

অহিংসা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়



## সূচিপত্র

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| ১. সদানন্দ সাধুর আশ্রম.....                               | 3     |
| ২. মাধবীলতা সম্বন্ধে সদানন্দের আবিষ্কার .....             | 1 7   |
| ৩. মাধবীলতাকে নিয়ে বাইরে কিছু হৈচৈ হইল না .....          | 2 7   |
| ৪. বর্ষাকালে সদানন্দ অবসর পায় বেশি.....                  | 3 7   |
| ৫. বাগবাদা গাঁয়ের মহেশ চৌধুরী .....                      | 4 7   |
| ৬. আকাশের মেঘ কাটিয়া গিয়া রোদ উঠিল.....                 | 7 1   |
| ৭. কয়েকদিন জুরে ভুগিয়া মহেশ চৌধুরী সারিয়া উঠিলেন ..... | 9 2   |
| ৮. বিপিন ভাবিতেছিল.....                                   | 1 0 2 |
| ৯. বিকালে মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে .....                      | 1 1 7 |
| ১০. এ কথা কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল .....                | 1 2 2 |
| ১১. দিন কাটিয়া যায়.....                                 | 1 3 7 |
| ১২. বিভূতি সত্যই বড় ছেলেমানুষ.....                       | 1 5 0 |
| ১৩. বিভূতি আর মাধবীলতার বিবাহ .....                       | 1 6 0 |
| ১৪. সদানন্দ ভাবে .....                                    | 1 7 1 |
| ১৫. বলামাত্র সদানন্দ রাজি হইল না.....                     | 1 8 1 |

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| ১৬. দেখলে বাবা তোমার দেবতার কীর্তি ..... | 1 9 3 |
| ১৭. সত্য কথা বলতে .....                  | 2 0 8 |

## ১. সদানন্দ সাধুর আশ্রম

সদানন্দ সাধুর আশ্রমের তিনদিকটা তপোবনের মতো। বাকি দিকটাতে একটা নদী আছে। আশ্রম ঘিরিয়া অবশ্য তপোবনটি গড়িয়া ওঠে নাই, স্থানটি তপোবনের মতো নির্জন আর শান্তিপূর্ণ দেখিয়াই আশ্রম গড়িয়া তোলা হইয়াছে। আশ্রমের বয়স আর কত হইবে, বছর পাঁচেকের বেশি নয়। তপোবনের বড় বড় গাছগুলির কোনো কোনোটা হয়তো শতাব্দীরও বেশি সময় ধরিয়া নিবিড় ছায়া বিলাইয়া আসিতেছে।

তপোবনের সমস্তটা আশ্রমের সম্পত্তি নয়। দলিলপত্রের হিসাবে দেখা যায়, আশ্রমের ভূমির পরিমাণ শতানেক বিঘার কাছাকাছি। তপোবন আরো বিস্তীর্ণ—উত্তরে বাসুপুরের গা-ঘেঁষা প্রকাণ্ড কলাবাগান এবং দক্ষিণে সাতুনার বাণীপাড়া পর্যন্ত এলোমেলোভাবে ছড়ানো আরো বড় আমবাগানটা ধরিলে আশ্রমের ভূমির দশ-বার গুণ। তবে দলিলপত্র ছাড়া আশ্রমের সীমানা ভালো। করিয়া কোথাও দেখানো নাই কিনা, তাই বন, উপবন, আমবাগান, কলাবাগান, সমস্তই আশ্রমের তপোবন বলিয়া মনে হয়।

নদী পূর্বদিকে।

একটি শাখানদীর এই উপশাখাটিকে স্থানীয় লোক আদর করিয়া ডাকিত রাধা বলিয়া, বোধহয়, আদরের আতিশয্যেই একটা ইকার জুটিয়া এখন হইয়াছে রাধাই।

বড় আশ্চর্য নদী। প্রতিবছর বাঁচে আর মরে। আকাশে যেই কালো মেঘ জমিয়া থমথম করে, লোকে জল আটকানোর জন্য চালের ফুটা আর ছাতির ফুটা মেরামত না করিয়া আর উপায় খুঁজিয়া পায় না, রাধাই নদীতে অমনি দেখা দেয় ঘোলা জলের স্রোত। কমাস ধরিয়া রোদে যে বালি তাতিয়াছে, সে বালি যায় ঢাকিয়া, স্থানে স্থানে যে আবদ্ধ জল পচিয়া উঠিতেছিল, সে জল যায় ভাসিয়া। সকলে অবাক হইয়া একবার তাকায় আকাশের দিকে, একবার তাকায় রাধাই নদীর দ্রুতবর্ধনশীল জীবনসঞ্চারের দিকে। বড় রহস্যময় মনে হয় ব্যাপারটা সকলের কাছে। বৃষ্টি আর হইয়াছে কতটুকু, কদিনের ছাড়া ছাড়া বর্ষণে

পথঘাট ভালো করিয়া ভেজে নাই পর্যন্ত। কোনো পুকুরে জল বাড়ে নাই, কোনো ডোরায়ে জল জমে নাই। রাধাই এত জল পাইল কোথায়?

দূরদেশে কোথায় ইতিমধ্যে প্রবল বর্ষা নামিয়াছে, কোন্ বড় নদী সেই জল বহিয়া আনিয়া কোন্ শাখানদীকে দিয়াছে, আর কোন্ শাখানদীর দানে তাদের এই নদীতে দেখা দিয়াছে নবযৌবনের আবির্ভাব, এত সব রহস্যের সন্ধান কজনে আর রাখে। চোখের সামনে মরা নদীকে বচিতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হয়।

নদীর একেবারে ধারে প্রকাণ্ড চালাটায় বিকালের দিকে সাধুজীর দর্শনকামীদের সমাগম হয়। আশ্রমের সকলে তো উপস্থিত থাকেই, কাছাকাছি গ্রাম হইতে অনেকে আসে, দূরের গ্রাম ও শহর হইতেও আসে। সদানন্দ সকলকে দর্শনও দেয়, দর্শনের মনোমত ব্যাখ্যাও শোনায়ে।

এবার যেদিন প্রথম রাধাই নদীর বুকে স্রোত দেখা দিল, সেদিন অহিংসা ও প্রেমের কথা। বলিতে বলিতে সদানন্দ হঠাৎ আনমনে চুপ করিয়া গেল। নদীর স্রোতের দিকে পলকহীন চোখে এমনভাবে চাহিয়া রহিল যে, কারো বুঝিবার উপায় রহিল না, অন্যমনস্ক সে ইচ্ছা করিয়া হইয়াছে। আজ কথা জমিতেছিল না। যার কথা মনের মধ্যে কাটার মতো বেঁধে, মধুর মতো মাখা হইয়া যায়, মধুপের মতো গুঞ্জন করে, শুনিতে শুনিতে থাকিয়া থাকিয়া হয় রোমাঞ্চ, আজ যেন তার কথায় জোর নাই, সুর নাই—নিছক কতকগুলি নীরস, ভেতা শব্দমাত্র পরিবেশন করিতেছে। অস্বস্তিবোধ করিতে করিতে এতক্ষণে কারণটা টের পাইয়া সকলে স্বস্তিলাভ করে। তাই বটে, সাধুজী আজ অন্যমনস্ক হইয়া আছেন। কথায় সাধুজীর মন নাই।

পুরুষরা চুপ করিয়া রহিল, মেয়েদের মধ্যে শোনা গেল ফিসফিস কথার গুঞ্জন। এখানে মেয়ে-পুরুষের বসিবার পৃথক ব্যবস্থা নাই, সদানন্দ পুরুষ ও নারীর পার্থক্য স্বীকার করে, পৃথক রাখিবার প্রয়োজন স্বীকার করে না। এই সভায় যারা বসে, তাদের মধ্যে যেমন ছোট-বড় নাই, আপনপর নাই, তেমনি মেয়ে-পুরুষও নাই। অন্তত, সাধুজীর তাই নির্দেশ।

তবু, মেয়েরা দল বাঁধিয়া একপাশে তফাতে সরিয়া বসে, ব্যবধানটা ঘুচাইবার চেষ্টাও পুরুষদের মধ্যে কখনো দেখা যায় না। চালার নিচে স্থানাভাব ঘটিলেও নয়।

চালার কাছে খানিকটা জায়গা গাছপালা কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এখানে গাছের ছায়া নাই। তপোবনের মাথা ডিঙাইয়া বাকাভাবে রোদ আসিয়া মেয়েদের বসিবার জায়গায় পড়িয়াছে, বড় তেজ এখানকার রোদের। ঘামে সকলে ভিজিয়া গিয়াছে, তবু সরিয়া ছায়ায় গিয়া বসিবার সাহস কারো নাই। একটি কমবয়সী বিধবা, গায়ের রংটা যার আশ্চর্যরকমের ফর্সা, মুখখানা সিঁদুরের মতো রাঙা করিয়া চোখ বুজিয়া পাশের ঘোমটা-টানা বৌটির গায়ে নির্লজ্জ ভঙ্গিতে হেলান দিয়া আছে। হয় মূর্ছা গিয়াছে, নয় যাওয়ার উপক্রম করিয়াছে।

আনমনে নদীর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই সদানন্দ বলিল, মেয়েদের গায়ে রোদ লাগছে বিপিন।

বিপিন সদানন্দের বন্ধু, শিষ্য এবং আশ্রমের জেনারেল ম্যানেজার। একদিন সে সদানন্দের। নাম ধরিয়াও ডাকিত, হাসিতামাশাও করিত। আজো অন্তরালে করিলে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু দশজনের সামনে আনমনে হঠাৎ ভুল করিয়া বসিবার ভয়ে প্রকাশ্যেঅপ্রকাশ্যে সব সময়েই

সে শিষ্যত্বের খোলসটা বজায় রাখিয়া চলে।

বিপিন হাতজোড় করিয়া বলিল, কি করব প্রভু?

ছায়ার ব্যবস্থা করে দাও।

দিই প্রভু।

হোগলার বেড়া আনিয়া চালার খুঁটিতে ঠেস দিয়া দাড় করাইয়া বিপিন অল্পক্ষণের মধ্যেই ছায়ার ব্যবস্থা করিয়া দিল। আগেও কদিন মেয়েরা রোদে কষ্ট পাইয়াছে, রৌদ্র নিবারণের

এমন সহজ উপায় থাকিতে আগে কেন এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই, কে তা অনুমান করিবে! হয়তো কারো খেয়াল হয় নাই-সদানন্দেরও নয়। হয়তো তফাতে জমাট বাঁধিয়া বসিবার জন্য মেয়েদের উপর সদানন্দের রাগ হইয়াছিল, তাই কদিন তাদের রোদে ভাজা ভাজা করিয়া শাস্তি দিয়াছে। আজ বিধবা মেয়েটির রাঙা মুখখানা দেখিয়া মায়া হইয়াছে। কিন্তু, রাগ কি সদানন্দের। আছে? শাস্তি কি কারোকে সে দেয়? মায়া কি তার হয়? শুধু তাকে দর্শন করিয়া আর তার দর্শনের ব্যাখ্যা শুনিয়া কে তা অনুমান করিতে পারিবে!

মেয়েরা ছায়া পাওয়ামাত্র সদানন্দ মুখ ফিরাইল। মেয়েদের মৃদুগুঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গেল। প্রেম ও অহিংসা সম্বন্ধে না জানি সাধুজী এবার কি বলিবে!

নদীতে এবার অনেক আগে জল এল, না বলাই?

কোথায় প্রেম ও অহিংসা, কোথায় রাধাই নদীতে জল আসা, কোথায় শতরঞ্চি-জোড়া ভদ্রলোকের ভিড়, কোথায় এককোণে মাটির আসনে সাতুনার মূখ দোকানদার বলাই। বলাই নামে এক জন যে আসিয়া আসরের একপাশে বসিয়াছে, তাই বা এতক্ষণে কজনে খেয়াল করিয়াছিল? বলাই কৃতার্থ ও নির্বাক হইয়া রহিল।

তার হইয়া জবাব দিল শ্রীধর। অনেক বয়স হইয়াছে শ্রীধরের, ষাটের কাছাকাছি। সাতুনায় সে সম্পন্ন গৃহস্থ, তিন তিনটা রোজগেরে ছেলে লইয়া মস্ত সংসার পাতিয়াছে। রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতে সে অদ্বিতীয়। সুতাবাধা চশমা আঁটিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বাড়িতে সে রামায়ণ, মহাভারতের বাছাবাছা অংশ পাঠ করে, মাঝে মাঝে থামিয়া অতি সরল ও সহজবোধ্য কাহিনীর রসালো ব্যাখ্যা করিয়া শোনায়ে। তার বাড়িতে প্রায়ই এ রকম সভা বসে-তবে এত বড় নয়। আর সে সভায় ভদ্রলোক আসে না, সে শুধু চাষী-মজুর, তেলি-তাতি-কামার-কুমারের সভা।

বিপিনের অনুকরণে হাত জোড় করিয়া শ্রীধর বলিল, চারবাদলা নেমে গেছে, আজ্ঞা।

চারবাদলা নামার সঙ্গে রাধাই নদীতে জল আসার সম্পর্ক কি? চারবার বৃষ্টি হইয়া গেলেই রাধাই নদীতে জল আসে। চিরদিনই নিয়ম। টিপ টিপ করিয়া দু-চার ফোঁটা জলই পড়কে আর ঝম্ ঝম্ করিয়া সৃষ্টি-ভাসান বাদলাই নামুক, চারবার বর্ষণ হইয়া গেলে নদীতে জল আসিবেই আসিবে। সদানন্দ মৃদু হাসে। জবাব দিয়াছে শ্রীধর, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে তিরস্কার করিয়া বলে, এ সব ধারণা পোষণ করা কেন, এ ধরনের সব কুসংস্কার?

সাধুজীর স্নেহমধুর আবেগভরা ধমক শুনিয়া মনে হয়, আর যে সব কুসংস্কার তাদের আছে, সে সব যেন কিছু নয়, এটাই তাদের কুসংস্কারের চরম। মনে মনে এই কুসংস্কার পুষিয়া রাখিয়া ইহকাল পরকাল সব তারা নষ্ট করিয়াছে।

তারপর শুষ্ক নদীতে হঠাৎ স্রোত দেখা দিবার কারণ সে ব্যাখ্যা করে। ব্যাখ্যা করিতে করিতে আসে রহস্যময়ী প্রকৃতির কথা। প্রকৃতির আসল রহস্য কোথায়, মানুষ যে তার সন্ধান জানে না, এ কি সহজ আফসোসের কথা! অজানার মধ্যে মানুষ প্রকৃতির রহস্যকে খুঁজিয়া মরে রাধাই নদীতে জলসঞ্চারের কারণ না জানায় ভাবে, এই বুঝি তবে প্রকৃতিদেবীর দুর্বোধ্য লীলার অভিব্যক্তি। জানামাত্র যখন অজানার সমস্ত রহস্যের আবরণ খসিয়া যায়, অজানার জন্য মাথা ঘামানো কেন? জানার মধ্যে যে যতটুকু জানে তারই মধ্যে, প্রকৃতির সবটুকু রহস্যের খনি নিহিত থাকে। রাধাই নদীতে জলস্রোত আসিবার কারণ নাই বা জানিলে, জলস্রোত যে আসিয়াছে, এটুকু তো জান? এই জানাটুকুর মধ্যে সন্ধান কর, রহস্যানুভূতির অজ্ঞাত জগতের দিগন্তে আত্মজ্ঞানের ছায়া নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বের সঙ্কেতে তোমায় সাড়া দিতেছে দেখিতে পাইবে।

সকলে মশগুল হইয়া শোনে। এতক্ষণে আসর জমিয়াছে। শুধু সদানন্দের বলিবার কৌশলে প্রত্যেকের মনে হয়, দুর্বোধ্য কথাগুলি যেন জলের মতো বুঝিয়া ফেলিয়াছে। কি বুঝিয়াছে এ কথা কেউ ভাবে না, বুঝিতে পারিয়াছে, এই ধারণার উন্মাদনায় বিভোর হইয়া থাকে। বিপিনের শীর্ণ ম্লান মুখে আনন্দের ছাপ পড়ে। আজ প্রণামী জুটিবে ভালো।

মাঝে মাঝে দু-একজন নতুন শ্রোতা আসিয়া চুপিচুপি আসরের একপাশে বসিয়া পড়িতেছিল। দেরি হওয়ায় তারা গ্রাম হইতে ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছটিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তপোবনে ঢুকিবার পর আর তাদের ব্যস্ততা নাই। সমস্ত তপোবন পার হইয়া চালায় পৌঁছিতে হয়, সেই অবসরে তপোবন তাদের শান্ত করিয়া দিয়াছে। না, তাড়াহুড়া করিবার কিছু নাই। সাধুজীর কথা যদি শেষ হইয়া যায়, তাতেই বা কি? আরেকদিন সময়মতো আসিলেই হইবে। সদানন্দের কথা শুনিবার আগ্রহে যারা ছুটিয়া আসে, তাদের সকলের মনেই তপোবন কম-বেশি প্রায় এই রকম প্রভাব বিস্তার করে, সমস্ত অধীনতা যেন জুড়াইয়া যায়, আশা-আকাঙার তীব্রতা থাকে না। পতঙ্গ যেমন মধুতে ডুবিয়া চাপল্য হারায়, তপোবনের উদ্ভিদগুলির রক্ষণাবেক্ষণে যে নিবিড় শান্তি আছে, তার অদৃশ্য ঘনত্বের কবলে আসিয়া পড়ামাত্র মানুষের মনের বিভিন্ন গতিগুলি তেমনি সংযত হইয়া যায়।

তবে সকলের নাগাল পোবন পায় না। কত অন্যমনস্ক জীব আছে জগতে, কত মন ইন্দ্রিয়ের মৃদুতর উপচারগুলি নির্বিচারে প্রত্যাখ্যান করে, কত মানুষ নিজে চারিদিকে লইয়া বেড়ায় দুর্ভেদ্য আবরণ।

আট বেয়ারার হুম্ হুম্ শব্দে তপোবনকে কিছুক্ষণের জন্য নিছক জঙ্গলে পরিণত করিয়া একটি পালকি একেবারে আশ্রমের ভিতরে আসিয়া থামিল, সদানন্দের তিনমহাল কুটিরের সামনে। আসর বসিবার চালা হইতে সদানন্দের কুটির বেশি তফাতে নয়, একটা বাঁশঝাড় এবং কয়েকটা জাম ও বকুলগাছের জন্য চোখে পড়ে না।

না দেখিয়াও অনুমান করা গেল, কে আসিয়াছে। মহীগড়ের রাজা ছাড়া আট বেয়ারার পালকিতে আর যারাই চাপুক, আশ্রমে তারা আসে না। সদানন্দের কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিপিন ব্যস্ত হইয়া নিবেদন করিল, রাজাসাহেব দর্শনলাভ করতে এসেছেন প্রভু।

এখানে আসতে বল।

এখানে প্রভু?

সদানন্দের আকস্মিক বিদ্রোহ বিপিন প্রত্যাশা করে না, মুখে অনেকগুলি রেখা সৃষ্টি করিয়া সে চাহিয়া রহিল। হোক গুরুদক্ষিণা, আশ্রমের ভূমি তো রাজাসাহেবের দান, নিজে সে আশ্রমে পায়ের ধুলা দিয়াছে তাই কি যথেষ্ট নয়? তার প্রজাদের এই আসরে তাকে ডাকিয়া আনার তো কোনো মানে হয় না। যার কলমের এক খোঁচায় আশ্রম উঠিয়া যাইতে পারে, সে শিষ্য হইলেও তাকে একটু, খুব সামান্য একটু খাতির করিলে দোষ কি?

রাধাই নদীর ঘোলাটে জলস্রোতই যেন আজ সদানন্দকে আনমনা করিয়া দিতেছে। বিপিনের প্রশ্নের মানে বুঝিতে দুবার শুনিতে হয় না, মুখের রেখা, চোখের দৃষ্টির মানে বুঝিতে দুবার চাহিতে হয় না। আনমনা হইয়া না বোঝার ভান করাই সবচেয়ে সহজ।

হ্যাঁ, বল গে, আমি এখানে আছি।

বহুকাল শিষ্যত্বের অভিনয় করিতে করিতে কিভাবে যেন বিপিনের সংযম অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তাছাড়া মানুষটা সে বড় চালাক, ভাবিয়া চিন্তিয়া ফন্দি না আঁটিয়া কখনো সে কিছু করে না, যদি বা করে, অন্তরালে করে। জীবনের সমস্ত অসংযম তার গোপনীয়। সদানন্দের বোকামিতে রাগে গা জ্বলিয়া গেলেও তাই সে শুধু বলিল, প্রভু?

সদানন্দ চুপ। আনমনে কথা বলার চেয়ে নীরবে আনমনা হওয়া ঢের সহজ। একটু অপেক্ষা। করিয়া বিপিন কুটিরের দিকে চলিয়া গেল। আর ফিরিয়া আসিল না। সূর্য নামিয়া গেল তপোবনের গাছের আড়ালে, মেয়েদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল, সকলকে পা ছুঁইয়া প্রণাম করিবার ও প্রণামী দিবার অনুমতি দিয়া সদানন্দ ঠায় বসিয়া রহিল রক্তমাংসের দেবতার মতো। দেবতার মতোই তার মূর্তি, বটতলার ছবির মহাদেবের ছাচে ঢালিয়া যেন তার সৃষ্টি হইয়াছে। আসন করিয়া বসায়, ভাঁড়ি গিয়া প্রায় ঠেকিয়াছে পায়ে এবং তাতেই যেন মানাইয়াছে ভালো। নয় তো এই বৃষস্কন্ধ বিশালদেহ। পুরুষের চওড়া বুক আর পেশীবহুল সুডৌল বাহু দেখিয়া মনে হইত, দেহের শক্তি ভিন্ন আর বুঝি তার কিছু নাই। কথায় তাহা হইলে মানুষ মুগ্ধ হইত কিনা, কারো ভক্তি জাগিত কিনা সন্দেহ।

মাথায় জটা নাই বলিয়াই ভক্তেরা অনেকে মনে মনে আফসোস করে। যার সৌম্য, প্রশান্ত মূর্তি হৈর্যের নিখুঁত প্রতীক, জটা ছাড়া কি তাকে মানায়?

সদানন্দের কুটিরের সদর আর কিছুই নয়, বড় একখানা ঘর। মেঝে লাল সিমেন্ট করা, দেয়াল গেরুয়ারঙের বাদামি ভাবটা একটু প্রকট। আশ্রমের ছোট-বড় সমস্ত ঘরই এই ধরনের, উপরে ছাউনি ছাড়া বাকি সব চুনসুরকি ইটকাঠের ব্যাপার। কিন্তু বিপিনের ভাষায় এগুলি সব কুটির।

সদরের ঘরখানায় কতকটা বৈঠকখানার কাজ চলে, মাঝে মাঝে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ছোটখাটো সভাও বসে। তবে সে সভা হয় অনেকটা ঘরোয়া মজলিসের মতো, সকলে অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা পায়। সদানন্দকে যেমন ব্যক্তিগত সুখদুঃখ দ্বিধা-সন্দেহ নিবেদন করা চলে তেমনি চলে নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা, এমন কি উঁচু গলায় তফাতের মানুষকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করা চলে, কেমন আছ ভায়? শিষ্য ও ভক্তের ব্যক্তিত্বকে এখানে সদানন্দ প্রশ্রয় দেয়, নদীর ধারে আটচালার নিচে এদের সঙ্গে তার যে ব্যবধানটা থাকে প্রায় দেবতা ও অধঃপতিতের, এখানে সেটা হয় অবতার ও মানুষের। কত তুচ্ছ বিষয়েই মাথা ঘামায় সদানন্দ, কত তুচ্ছ মানুষের কত তুচ্ছ পারিবারিক জীবনের কত তুচ্ছ খবরই যে জানিতে চায়। আগ্রহ দেখায় না বটে, দুঃসংবাদে বিচলিত হয় না, সুসংবাদে খুশিও হয় না, তবু নির্বিকার সহিষ্ণুতার সঙ্গে কান পাতিয়া সব কথা তো শোনে, মুখ ফুটিয়া তো বলে তাই নাকি অথবা বেশ বেশ।

সদর পার হইয়া আসিলে অন্দরের উঠান, ফুলের চারায় ও ফলের গাছে বাগানের মতো। একপাশে প্রকাণ্ড একটা বাধানো ইদারা, জল বড় মিষ্টি আর ঠাণ্ডা। গরমের দিনে সূর্য যখন মাথার উপরে থাকে আর ইদারার নতুন সিমেন্ট করা গোলাকার চওড়া বাঁধটা হইয়া থাকে আগুন, হামাগুড়ি দিয়া একটিবার শুধু ক্ষণেকের জন্য ভিতরে উঁকি দিলে মনে হয়, জলে ডুবিয়া মরাই বুঝি ভালো : পূর্ণিমার চাঁদের আলোতেও অত নিচের জল তো দেখা যায় না, গরমের দিনে-রাত্রে তাই যেভাবেই হোক মরার সাধ জাগানোর জন্য খালি গায়ে ঠাণ্ডা সিমেন্টে গা এলাইয়া দিতে সাধ যায়। ফুরফুরে হাওয়া থাক, অথবা দারুণ গুমোট

হোক, রাশি রাশি ফুলের ঘন মিশ্রিত গন্ধে প্রথমে মন কেমন করিয়া ঘুম আসিয়া পড়ে, এইটুকু যা অসুবিধা। একদিনও কি সদানন্দ পুরা একটা ঘণ্টা জাগিয়া থাকিতে পারিয়াছে।

উঠানের একদিকে সদর, বাকি তিনদিকেই প্রায় ঘর কোনো ঘরের সামনে বারান্দা আছে, কোনো ঘরের সামনে নাই। অন্দর পার হইয়া নদীর দিকে অন্তঃপুর। অন্তঃপুরেও উঠান আছে, তবে অন্দরের উঠানটির তুলনায় আকারে অনেক ছোট আর আগাগোড়া সিমেন্ট করা। না আছে ফুলের চারা, না আছে ফলের গাছ, শুধু ঝকঝকে তকতকে মাজাঘষা পরিচ্ছন্নতা। এক কোণে কেবল একটা তালগাছ আকাশে মাথা তুলিয়াছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় বুঝি জীবন্ত কিছু চিরদিনের জন্য সদানন্দের অন্তঃপুরে বন্দি হওয়ায় ব্যাকুল আগ্রহে মাথা উঁচু করিয়া বাহিরের জগতে উঁকি দিতেছে। গাছটায় ফল ধরে না, কোনোদিন নাকি ধরিবেও না।

অন্তঃপুরে ঢুকিবার একটি খিড়কি পথ আছে, নদীর দিকে প্রাচীরের গায়ে বসানো ছোট একটি দরজা। ঘরের জানালা দিয়া সারাদিন সদানন্দ আজ রাধাই নদীতে জলের আবির্ভাব দেখিয়াছিল, তারপর খিড়কির দরজায় বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া গিয়াছিল আটচালা সভায়। এখন মন্তরপদে ফিরিয়া আসিয়া শিকলতোলা দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, বাহিরের মায়া-মদপায়ী মাতালের মতো উঁড়ির উপর দুটি হাত রাখিয়া সামনে-পিছনে একটুখানি টলিতে টলিতে। বিড়বিড় করিয়া কি যে বলিতে লাগিল, নিজের কানেই তা গেল না। নিজের কথা শুনিবার স্পৃহাও আর নাই। মনে তার শান্তি নাই কেন, এত মানুষকে সে শান্তি বিলাইতেছে? এত ক্ষোভ কেন তার, এমন আকস্মিক ত্রোদের সঞ্চারণ? কারো সে ক্ষতি করে নাই, কারো উপরে তার হিংসা নাই, বিদ্বেষ নাই—বিপিনের কাছে মাঝে মাঝে রাগও হয়, ঘৃণাও জাগে বটে, কিন্তু বিপিনকে সে ভালোই বাসে, এ জগতে বিপিন তার সবচেয়ে আপন, একমাত্র প্রাণের বন্ধু। এমন জ্বালাভরা অস্থিরতা তবে সে বোধ করে কেন? ভাবিতে ভাবিতে বাহিরের মায়ার নেশা যেন গাঢ় হইয়া আসে, আশ্রমে ঢুকিতে অনিচ্ছা বাড়িয়া যায়। শিকল খুলিয়া

সদানন্দ তাই গায়ের জোরেই অন্তঃপুরে ঢুকিয়া পড়ে, সশব্দে ভিতর হইতে খিল বন্ধ করিয়া দেয়।

উঠানের তালগাছে ঠেস দিয়া একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সদানন্দের বিরক্তির সীমা থাকে না। রাগ করিয়া বলে, কে গা তুমি? কি করছ এখানে?

চুপ। আমি কেউ না।

কথাগুলি জড়ানো কিন্তু গলাটি মিষ্টি—অল্পবয়সী মেয়ে। দক্ষিণের বড় ঘরের বারান্দায় আর পশ্চিমের ঘোট ঘরখানার বোয়াকে দুটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে, মেয়েটির গায়ে আলো পড়িয়াছিল যথেষ্ট। সদানন্দ চাহিয়া দেখে নাই, নতুবা বুঝিতে পারিত মেয়েটি আশ্রমের কেউ নয়। এত কমবয়সী। মেয়েও আশ্রমে কেউ থাকে না, আশ্রমে মেয়েদের বেশভূষাও এরকম নয়।

কাণ্টা বিপিনের, বুঝিতে পারিয়া সদানন্দের বিরক্তি আরো বাড়িয়া গেল। আগে হইতে কিছু না জানাইয়া বিপিন যে কোথা হইতে এরকম এক একটি খাপছাড়া মেয়েকে আশ্রমে আনিয়া হাজির করে। গত বৈশাখের মাঝবয়সী স্ত্রীলোকটিকে ধরিলে এটি বিপিনের সাত নম্বরের ম্যাজিক। পালকিতে তবে মহীগড়ের রাজাসাহেব আসে নাই, আসিয়াছেন ইনি। বৈশাখের ব্যাপারে সদানন্দ ভয়ানক রাগ করায় বিপিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর এসব ঘটবে না, কোনোদিন নয়। কমাসের মধ্যেই বিপিন প্রতিজ্ঞার কথাটা তাহা হইলে ভুলিয়া গিয়াছে। ভুলিয়া যাওয়ার আগে একটু আভাস দেওয়াও দরকার মনে করে নাই, তাকে যে কথা দিয়াছিল, সেটা মানিয়া চলা সম্ভব হইবে না। দুঃখে অপমানে নিজেকে সদানন্দের একান্ত অসহায় বলিয়া মনে হয়। বিনামূল্যে কিনিয়া বিপিন যেন তাকে ক্রীতদাস করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এবার সে ছাড়িবে না, এবার একটা চরম বোঝাপড়া করিতে হইবে বিপিনের সঙ্গে।

খুব বেশি বিব্রতবোধ না করিলে, অন্তঃপুরের উঠানে খাপছাড়া নিঃসঙ্গ তালগাছটার গুঁড়িতে মেয়েটাকে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সদানন্দের হয়তো মনে হইত,

মন্দ মানায় নাই। কবে কে দা, কুড়াল কিছু একটা অস্ত্র দিয়া আঘাত করিয়াছিল গাছটার গুঁড়িতে, সেই ক্ষতের চিহ্ন, মাটি ঘেঁষিয়া কয়েকটা সরু সরু শিকড়ের ইঙ্গিত, সিমেন্টে বিপিন কবে আনমনে পানের পিক ফেলিয়াছিল তার প্রায় মুছিয়া যাওয়া দাগ, হাত দেড়েক তফাতে নর্দমার কাছে এক বালতি জল আর একটা ঘষামাজা ঘটি আর এই আবেষ্টনীর মধ্যে অতিরিক্ত একটি মেয়ে।

কিন্তু রাগে সদানন্দ অন্ধকার দেখিতেছিল।

রাগ চাপিয়া কোনোরকমে সে বলিল, এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন বাছা, ঘরে গিয়ে বোসো? আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি, তোমার কি?

জড়ানো সুরে কথাগুলি বলিয়া গাছের আশ্রয় ছাড়িয়া সদানন্দের ঝকঝকে তকতকে সিমেন্ট করা উঠানে হিলতোলা জুতা চুকিয়া মেয়েটি আগাইয়া আসিল কাছে, খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিল সদানন্দের হাত। হয়তো টাল সামলানোর জন্য।

তুমি সাধুজী, না?

মুখে তীব্র মদের গন্ধ। যে গন্ধে সদানন্দের চিরকাল বসি আসে। জবাব না পাইয়াও আহ্বাদে মেয়েটি যেন গলিয়া গেল, দুহাতে সদানন্দের গলা জড়াইয়া গদগদ হইয়া বলিল, শোন, আমি কেউ নয়, বললাম না এম্মুনি তোমাকে, তা সত্যি নয়। আমি মাধবী, মাধবীলতা-লতাটা কেটে বাদ দিয়েছি একদম।।

বলিয়া খিলখিল করিয়া মাধবীর কি হাসি! গলায় জড়ানো হাতের বাঁধন খুলিয়া সদানন্দ তাকে। ঠেলিয়া দিয়া ঘরে চলিয়া গেল। পড়িয়া গিয়া আঘাতের ব্যথায় মাধবীলতা কেঁপাইয়া ফোপাইয়া কাঁদতে লাগিল।

মাধবীলতার কান্না শুনিয়া পূর্বের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল বিপিন আর সাহেবী। পোশাকপরা একটি যুবক। দুজনে ধরাধরি করিয়া মাধবীলতাকে লইয়া গেল ঘরে।

মাধবীলতা কাঁদিতে কাঁদিতে কেবলি নালিশ করিতে লাগিল, সাধুজী আমায় (মেরেছে) ঠেলে ফেলে দিয়েছে। আমি এখানে থাকব না, আমায় নিয়ে চল।

আটবেয়ারার পালকি চাপিয়া মহীগড়ের রাজা আজ আসে নাই। আসিয়াছে রাজপুত্র। মাধবীলতাকেও সঙ্গে আনিয়াছে সে-ই। আনিয়াছে পালকির মধ্যে এককোণে লুকাইয়া। একেবারে অন্দরে ঢুকিয়া পালকি থামিয়াছে, রাজাসাহেব স্বয়ং রানীসাহেবকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে আসিলে যেখানে থামে। রাজপুত্রের গায়ে ভর দিয়া মাধবীলতা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে।

অন্দর তখন একরকম কঁকাই ছিল, তবু মহীগড়ের রাজার বদলে রাজপুত্র আর রানীর বদলে মাধবীলতার আগমন কারো নজরে পড়িয়াছে কিনা বলা শক্ত। এ রকম অবস্থায় তাকে আশ্রমে কয়েকদিনের জন্যও রাখা সম্ভব হইবে কিনা, বিপিন ও রাজপুত্রের মধ্যে এতক্ষণ সেই পরামর্শই চলিতেছিল। বিপিন বার বার অনুযোগ দিয়া বলিতেছিল, এরকম প্রকাশ্যভাবে মাধবীলতাকে আশ্রমে আনা সত্যই বড় অন্যায় হইয়াছে রাজপুত্রের। আগে একটা খবর যদি সে পাঠাইত বিপিনকে, বিপিন সব ব্যবস্থা করিয়া দিত, এতটুকু হাস্যামোহ হইত না, রাজপুত্রের ভাবনারও কিছু থাকিত না।

রাজপুত্রের নাম নারায়ণ। দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুদর্শন চেহারা, মাঝে মাঝে মুখে অনাচারের যে ছাপটুকু পড়ে, সেটা স্থায়ী হয় না, দুদিন বিশ্রাম করিলেই মুছিয়া যায়, মুখে আবার স্বাস্থ্যের অমলিন জ্যোতি ফুটিয়া ওঠে। এমন মুখখানা উত্তেজনা ও ভয়ে অস্বাভাবিক রকম পাণ্ডুর দেখাইতেছে, চাউনি দেখিলেই টের পাওয়া যায়, মানুষটা এখন বিহ্বল।

বিপিনের অনুযোগর জবাবে সেও অনেকবার বলিয়াছে, কি করব বলুন, এমন একগুঁয়ে বলবার নয়। সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছিলাম, ওর জন্যেই সব ভেঙে গেল। শেষ মুহূর্তে কোথায় যাই, তাই এখানে ছুটে এলাম।

বিপিন তখন আশ্বাস দিয়া বলিয়াছে, যাক কি আর হবে, ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাধবীলতাকে শান্ত করিতে বেশি সময় লাগিল না, ছোট ঘরখানায় চৌকির উপর বিছানো ময়ূর-আঁকা মাদুরে সে গুম্ খাইয়া বসিয়া রহিল। রাজপুত্র নারায়ণ তখন পূর্বের ঘরে আসিয়া সদানন্দকে প্রণাম করিল। সদানন্দ কোনোদিন কাহাকেও আশীর্বাদ করে না, বিড়বিড় করিয়া মুখে একটা আওয়াজ করে মাত্র। আজ তাও করিল না।

ঘরের আলোটা সদানন্দ কমাইয়া দিয়াছিল, বিপিন বাড়াইয়া দিল। দেখা গেল, নারায়ণের মুখের পাংশু বিবর্ণ ভাবটা বড় বেশিরকম স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সদানন্দকে সে কোনোদিনই বিশেষ খাতির করে না, ভয় ভক্তি করার দরকারও কোনোদিন বোধ করে নাই। আজ তার সবটুকু তেজ আর বেপরোয়া ভাব উবিয়া গিয়াছে।

বিপিন নিবেদন করিল, রাজাসাহেব আসেন নি প্রভু। নারায়ণবাবু একটি নিরাশ্রয় মেয়েকে আশ্রমে ভর্তি করে দিতে এনেছেন। মেয়েটির কেউ নেই প্রভু।

থাকবার ব্যবস্থা করে দাও। আর তোমরা যাও বিপিন।

আসনে বসবেন প্রভু?

যেতে বললাম যাও না বিপিন, আমায় একটু একা থাকতে দাও।

বিপিনের মুখ দেখিয়া রাগ বোঝা যায় না, কেবল তার কপালে কয়েকটা রেখার সৃষ্টি হয় আর চোখের পলক পড়া অনিয়মিত হইয়া যায়। নারায়ণকে সঙ্গে করিয়া বিপিন ঘর হইতে চলিয়া গেল। ঘণ্টা দুই পরে সে যখন আবার ঘরে ফিরিয়া আসিল, সদানন্দ ঘুমের ভান করিয়া খাটের উপর গদির বিছানায় পড়িয়া আছে। গায়ে ঠেলা দিয়াও তার ঘুম ভাঙাইতে না পারিয়া চাপা গলায় তাকে একটা কুৎসিত গাল দিয়া বিপিন চলিয়া গেল। সদানন্দের বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল, সেবার ব্যবস্থাটাও আজ একটু বিশেষ রকমের হইয়াছে, কাছাকাছি একটা গ্রাম হইতে মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে কে যেন। আজ নানারকম সুখাদ্য পাঠাইয়া

দিয়াছে আশ্রমে। বিপিনের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভয়ে না খাইয়াই। আকাশপাল ভাবিতে ভাবিতে সদানন্দ এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙিল খুব ভোরে, ভালো করিয়া তখনো চারিদিক আলো হয় নাই। পাশ না ফিরিয়াই বোঝা গেল কে যেন পিঠের সঙ্গে মিশিয়া শুইয়া আছে। মশারি ফেলিতে সদানন্দের মনে ছিল না, কে যেন মশারি ফেলিয়া সযত্নে গুঁজিয়া দিয়াছে। উঠিয়া বসিয়া সদানন্দ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মাধবীলতার শুইবার ভঙ্গিটি মনোরম নয়, তাছাড়া তার নিজের দেহের উপর মাঝরাত্রি পর্যন্ত তার নিজেরই ছটফটানির ঝড় বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এদিকে সদানন্দও প্রায় একযুগ হইল, সকালে ঘুম ভাঙিয়া পিঠের সঙ্গে মেশা কুণ্ডলীপাকানো পুঁটুলির মতো নারীদেহ চাহিয়া দেখে নাই। হঠাৎ চোখ ফিরাইতে পারিল না।

তাছাড়া বিপিন যে মাধবীলতাকে আশ্রমে আনিয়াছে, এ অপমানের জ্বালা আছে প্রতিকার নাই, প্রতিকারহীন অপমানের আছে শুধু প্রতিশোধের কামনা। বিপিন যে কতদূর ছোটলোক, এই চিন্তার ছেদ দিয়া ছাড়া ছাড়া ভাবে সদানন্দ ভাবিতে থাকে, আহা মেঘলা ভোরে মেয়েটি শীতে কেমন জড়োসড়ো হইয়া গিয়াছে, দ্যাখ। গরমে নিজের দেহ যে ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, এটা সদানন্দের খেয়ালও হয় না। শীতের জন্যই মাধবীলতার এমন অদ্ভুত শোয়ার ভঙ্গি, এই অকাট্য যুক্তির কাছে গরমের অনুভূতি হার মনে। এইভাবে মাধবীলতাকে দেখিতে দেখিতে মনের আকাশপাতাল আলো-অন্ধকার কিভাবে যেন ধীরে ধীরে ঝাপসা হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল, অতীত হইতে ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত হওয়ার বদলে সময় বর্তমানকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইতে খাইতে আবর্ত রচনা করিতে লাগিল। মনটা বিদ্রোহ করিয়া বসিল সদানন্দের, একবার চাহিল রুদ্ধ দরজার দিকে, একবার চাহিল জানালা দিয়া খানিক তফাতে রাধাই নদীর দিকে, তারপরে দুহাত বাড়াইয়া পুতুলের মতো মাধবীলতাকে তুলিয়া লইল বুকে।

তখন অবশ্য মাধবীলতার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কিন্তু সে কিছুই বলিল না। পুতুলটি যেন অন্য কেউ, এমনিভাবে কৌতূহলী চোখ মেলিয়া মহাপুরুষ নামে বিখ্যাত প্রৌঢ়বয়সী দৈত্যটির পুতুলখেলার মুখভঙ্গি দেখিতে লাগিল।

## ২. মাধবীলতা সম্বন্ধে সদানন্দের আবিষ্কার

[লেখকের মন্তব্য : ভাবিয়া দেখিলাম, গল্পের ইঙ্গিতে পরিস্ফুট করিয়া তোলার পরিবর্তে মাধবীলতা সম্বন্ধে সদানন্দের আবিষ্কার ও মনোভাব পরিবর্তনের কথাটা আমার বলিয়া দেওয়াই ভালো। সংক্ষেপে বলাও হইবে, নীরস অশ্লীলতার ঝঝও এড়ানো চলিবে। সদানন্দের ধারণা হইয়াছিল, মেয়েটি ভালো নয়। মাধবীলতার প্রতিবাদহীন আত্মদান এই ধারণাকে সমর্থন করিত। কিন্তু সদানন্দ জানিতে পারিল, মাধবীলতা কুমারী।

একটা কথা স্পষ্ট বলিয়া রাখি। মাধবীলতা ভালো কি মন্দ, এটা তার প্রমাণ দিবার চেষ্টা নয়, আমার মতামতের কথা বলিতেছি না। সদানন্দের ধারণার কথা হইতেছে। আমার মন্তব্য হইতে মাধবীলতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হিসাবে বড়জোর এইটুকু অনুমান করিয়া লইবার অনুমতি দিতে পারি যে, পুরুষ সম্বন্ধে মাধবীলতার অভিজ্ঞতা ছিল না। নয় তো অবসাদে যতই কারু হইয়া পড়ক, চাদ-হারানো মাঝরাত্রির অন্ধকারে অচেনা অজানা জায়গায় আনাচে-কানাচে যত ভয়ই জমা থাক, বিপিন আর নারায়ণের চেয়ে বিখ্যাত সাধু সদানন্দকে যতই নিরাপদ মনে হোক, সদানন্দের শয়্যায় গিয়া সদানন্দের পিঠ ঘেষিয়া শুইয়া পড়িবার মধ্যে কোনো যুক্তি থাকে না। মশারি ফেলিয়া দিলে যে মশা কামড়াইবে না, এ জ্ঞানটা তো মাধবীলতার বেশ টনটনে ছিল।]

আশ্রমের খানিক তফাতে নদীর ধারে একটা মোটা কাঠের গুড়িতে সদানন্দ মাঝে মাঝে বসিয়া থাকে। সেইখানে বিপিন তাকে আবিষ্কার করিল। তখনো সূর্য আকাশে বেশি উঁচুতে ওঠে নাই। নদীর জল রাতারাতি আরো বাড়িয়াছে, ঘোলাটে জলের স্রোতে এখনো অনেক জঞ্জাল ভাসিয়া যাইতেছে, শুকনো নদীতে অনেকগুলি মাস ধরিয়া যেসব আবর্জনা জমা হইয়াছিল। কাছাকাছি। ছোট একটি আবর্তে কয়েকবার পাক খাইয়া একটা মরা কুকুর

ভাসিয়া গেল। বড় আফসোস হইতেছিল সদানন্দের, অনুতাপমিশ্রিত গ্লানিবোধ। তবু শরীর মন যেন হাল্কা হইয়া গিয়াছে। করুণা ও মমতার ব্যথায় হৃদয় ভারাক্রান্ত, তবু আনন্দের একটা অক্ষয় প্রলেপ পড়িয়াছে, মৃদু ও মধুর। ব্যাপারটা সদানন্দ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অন্যায়ের শাস্তি ও পুরস্কার কি এমনভাবে একসঙ্গে আসে?

বিপিন পাশে বসিতে বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু বিপিন বোঝাপড়া করিতে আসে নাই, ভাব করিতে আসিয়াছে। এ কাজটা বিপিন ভালো পারে না, বন্ধুত্বের ফাটল ঝালাই করার কৌশল তার জানা নাই। রাজপুত্রের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সদানন্দের ঘরে মাধবীলতার রাত কাটানো লইয়া একটু পরিহাস করিতে যায়, তারপর সদানন্দের মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া বলে, বড় ছেলেমানুষ তুই, রাগিস কেন? তুই ছাড়া আর কারো ঘরে ওকে থাকতে দিতাম? তোর কাছে ছিল বলেই নারাণবাবুরও ভাবনা হয় নি, আমারও ভাবনা হয় নি।

এত বড় তোষামোদেও সদানন্দ খুশি হইল না দেখিয়া বিপিন মনে মনে রাগিয়া গেল। বিপিন রাগিলেই সদানন্দ সঙ্গে সঙ্গে সেটা টের পায়, দুজনের মধ্যে একটা আশ্চর্য ঘনিষ্ঠতা আছে তাদের, একটা অতীন্দ্রিয় যোগাযোগ আছে, বোধহয় ইন্দ্রিয়ের যখন বিকাশ হইতে থাকে—সেই শৈশব হইতে পরস্পরকে তারা ভালবাসিয়া আর ঘৃণা করিয়া আসিতেছে, এজন্য। কতবার ছাড়াছাড়ি হইয়াছে জীবনে, কিন্তু এ জগতে নূতন আর একটি বন্ধুও তারা খুঁজিয়া পায় নাই। ছাড়াছাড়ি যখন হইয়াছে, অপর জন মরিয়া আছে না বাঁচিয়া আছে এ খবরও যখন তারা দীর্ঘকাল পায় নাই, কারো মন এতটুকু খারাপ হয় নাই, আবার যখন দেখা হইয়াছে, তখনো হয় নাই আনন্দ। কয়েকটা দিনরাত্রি কেবল তখন একসঙ্গে কাটিয়া গিয়াছে—পরস্পরের মধ্যে মশগুল হইয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলিয়া আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করিয়া থাকিয়া।

সদানন্দ ঘাড়ে হাত রাখিবামাত্র বিপিন ঘাড় ফিরাইয়া অন্যদিকে তাকায়, একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় বিপিনের এই ভাবপ্রবণতা, তার ক্রোধে অভিমানের এতখানি ভেজাল।

তুই যা ভেবেছিলি, তা ঠিক নয় সদা, মেয়েটা সত্যি ভালো। ওকে না জানিয়ে নারাণবাবু চলে গেছে বলে সেই থেকে খালি কাঁদছে।

নারাণ আর আসবে না?

আসবে-বেলা, নয় তো কাল সকালে। চার-পাচদিনের মধ্যে একটা ব্যবস্থা করে মাধবীকে নিয়ে চলে যাবে, এ কটা দিন একটু রয়ে-সয়ে কাটিয়ে দে সদা, দোহাই তোর। আর কেউ হলে কি আশ্রমে উঠতে দিতাম? রাজাসায়েবের ছেলে, দুদিন পরে নিজে সবকিছুর মালিক হবে, ওকে তো চটানো যায় না, তুই বল, যায়?

সদানন্দ গম্ভীরমুখে বলিল, বড়লোকের পা-চাটা আর টাকা রোজগারের ফন্দি আঁটবার জন্য আশ্রম করেছিলি, বিপিন? তা হলে ব্যবসা করলেই হত?

বিপিন তর্ক করিল না, হাতজোড় করিয়া হাসিয়া বলিল, এ ব্যবসা মন্দ কি প্রভু?

সদানন্দ মাথা নাড়িয়া বলিল, তামাশা রাখ, ভালো লাগে না। দিন দিন তুই যে কি ব্যাপার করে তুলছিস, বুঝতে পারি না বিপিন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আশ্রম করা হয়েছিল, সব চুলোয় গেছে, তোর খালি টাকা টাকা! টাকা ছাড়া কিছু হয় না বলেছিলি, টাকা তো অনেক হয়েছে, আবার কেন? এবার আসল কাজে মন দে না ভাই—এ সব ছেড়ে দে। আর টাকাই যদি তোর বড় হয়, তুই থাক তোর আশ্রম নিয়ে, আমি চলে যাই। দিন দিন আমার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমার আর সয় না।

নালিশটা নতুন নয়, সদানন্দের বলিবার সক্রিয় ভঙ্গিতে বিপিন আশ্চর্য হইয়া গেল। একটু ভাবিয়া সে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল জোরে, যতদূর সম্ভব মর্মান্বিত হওয়ার ভঙ্গিতে বলিতে লাগিল, টাকা? টাকা দিয়ে আমি করব কি? তুই কি ভাবিস টাকার লোভে আমি টাকা রোজগারের ফন্দি আঁটি? কতবার তোকে বলেছি সদা, তুই বুঝবি না কিছুতে, টাকা ছাড়া কিছু হয় না। কত • লোক আশ্রমে এসে থাকতে চায়, থাকবার ঘর নেই, ঘর তুলবার টাকা নেই। দক্ষিণের আমবাগানটা কিনে ফেলা দরকার, টাকা আছে কিনবার?

এবার যদি নারাণবাবু কিনে দ্যান। তুই আদর্শ জানিস সদা, কিসে কি হয় জানিস না। বড় কাজ করতে চাইলেই কি করা যায়? করতে জানা চাই। ভেবে দ্যাখ, এই যে আশ্রমটা হয়েছে, এতগুলি লোক আশ্রমে বাস করছে, দলে দলে লোক এসে তোর উপদেশ শুনে যাচ্ছে, আমি ফন্দি না আঁটলে এটুকুও কি হত? রাস্তায় রাস্তায় চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ তোর কথা শুনত না। ভালো উদ্দেশ্যে দুটো মিথ্যা কথা, একটু ভড়ং, এ সবে দোষ হয় না। নারাণবাবু একটা মেয়েকে বার করে এনেছে তো আমাদের কি? আমরা আশ্রমে উঠতে দিলেও বার করে আনত মেয়েটাকে, না দিলেও বার করে আনত। আমরা শুধু এই সুযোগে আশ্রমের একটু উন্নতি করে নিচ্ছি। এ সব কথা নিয়ে মাথা ঘামাস না, তোর কাজ তুই করে যা, আমার কাজ আমি করে যাই, একদিন দেখবি আমাদের এই আশ্রমের নাম সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে।

বিপিনের মতো বড় বক্তৃতার জবাবে সদানন্দ শুধু বলিল, আশ্রমের নাম সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাবার জন্য আমার তো ঘুম আসছে না।

ঘুম তোর খুব আসে, মোষের মতো ঘুমোস সারারাত। তোর মতো শুয়ে-বসে আরামে দিন কাটাতে পারলে আমারও ঘুম আসত।-বলিয়া বিপিন রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

খানিক পরে সদানন্দ ভিতরে গেল। ছোট ঘরের চৌকিতে সেই ময়ূরআঁকা মাদুরে মাধবীলতা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বিপিন বোধহয় তাকে চা আর খাবার আনিয়া দিয়াছে, কিন্তু সে খায় নাই। কথা বলিতে গিয়া প্রথমে সদানন্দের গলায় শব্দ আটকাইয়া গেল, তারপর এমন কথা বলিল যার কোনো মানে হয় না।

এখানে একা বসে আছ?

একটু ইতস্তত করিয়া চৌকিতেই একপাশে বসিল। মুখখানা তার অস্বাভাবিক রকম। গম্ভীর ও ম্লান হইয়া গিয়াছে। মাধবীলতা একবার চোখ তুলিয়া চাহিল, সরিয়াও বসিল না, কথাও বলিল না। সদানন্দের ইচ্ছা হইতেছিল অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে তার গায়ে

মাথায় হাত বুলাইয়া দেয় আর কিছুক্ষণের জন্য তার আঙুলগুলি যেন হইয়া যায় পাখির পালকের চেয়ে কোমল।

খাবার খাও নি কেন?

খিদে পায় নি।

কাল রাত্রে খেয়েছিলে কিছু?

মাধবী মাথা নাড়িল।

তাহলে খেয়ে নাও কিছু। চাটা বোধহয় জুড়িয়ে গেছে, গরম করে দিতে বলব?

না, কিছু খাব না। বমি হয়ে যাবে।

মাধবীলতা যেন একটু বিস্ময়ের সঙ্গে সদানন্দের মুখের ভাব দেখিতে থাকে। সদানন্দের মনে হয়, তুচ্ছ খাওয়ার কথা লইয়া এত বেশি মাথা ঘামানোর জন্য বিরক্ত হইয়া চোখের দৃষ্টি দিয়া সে তাকে ভৎসনা করিতেছে। সদানন্দ কাঠের পুতুলের মতো বসিয়া রহিল। মাধবীলতাকে তার কি বলার আছে? ভাবিতে গিয়া মনে পড়িল, একটা কথা বলা যায়, মাধবীলতার ভুলের কথা।

এমন কাজ কেন করলে মাধবী, কেন বাড়ি ছেড়ে এলে? দুদিন পরে নারাণ যখন তোমাকে ফেলে পালাবে, কি করবে তখন তুমি? সমস্ত জীবনটা নষ্ট করে ফেলছ নিজের, একটু ভুলের জন্য। এমন ছেলেমানুষি করে!

শুনিতে শুনিতে মাধবীলতার দুচোখ জ্বলজ্বল করিতে থাকে, মুখ আরক্ত হইয়া যায়। ইতিমধ্যে সে কখন স্নান করিয়াছে, ভালো করিয়া মোছা হয় নাই বলিয়া চুল এখনো ভেজা। ভেজা চুলের জলপটি থাকা সত্ত্বেও এমন মাথা গরম হইয়া যায় মাধবীলতার যে, প্রথমে সে খাবারের প্লেট আর চায়ের কাপটা সদানন্দকে ছুড়িয়া মারে, তারপর বাঘিনীর

মতো ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আঁচড়াইয়া সদানন্দের মুখে রক্ত বাহির করিয়া দেয়। তারপর সদানন্দের কোলে মুখ গুজিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে।

এই ধরনের কাণ্ড সদানন্দ আরো প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এক যুগেরও বেশি আগে আরেকজনকে এমনভাবে শান্ত ও সংযত অবস্থা হইতে চোখের পলকে উন্মাদিনীতে পরিণত হইয়া যাইতে দেখিত মাঝে মাঝে। তবে সে এভাবে খাদ্যের প্লেট, চায়ের কাপ ছুড়িয়া মরিত না, কোলে মুখ জিয়া এভাবে কাঁদিত না, দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া নিজেকে আহত করিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইত। হঠাৎ সদানন্দের মনে হইল, এতক্ষণে সে যেন বাস্তব জগতে নামিয়া আসিল, এতক্ষণে বোঝা গেল ব্যাপারখানা কি। হাত বাড়াইয়া র্যাক হইতে একটি গেরুয়া কাপড় টানিয়া আনিয়া মুখে আঁচড়ের রক্ত আর গায়ে লাগা চা ও খাবার খানিক খানিক মুছিয়া ফেলিল। মাধবীলতার গায়ে মাথায় পাখির পালকের মতো কোমল আঙুল বুলাইবার সাধটা এখন মেটানো যায়, কিন্তু এ ধরনের কবিত্বপূর্ণ সাধ আর সদানন্দের নাই। মাধবীলতার পিঠে একখানা হাত রাখিয়া সে তাকে কাঁদতে দিল। কাঁচা রক্তমাংসে গড়া এতটুকু একটা কোমল মেয়ে, এত কাণ্ডের পর ওকে কাঁদতে না দিলে চলিবে কেন?

কান্না কমিয়া আসে, মাধবী মুখ তোলে না, আরো জোরে সদানন্দকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। বাপ-মার আশ্রয় ছাড়িয়া সে আসিয়াছে কিনা কে জানে, বাপ-মা তার আছে কিনা তাও সদানন্দের জানা নাই, তবু এটুকু সদানন্দ অনুমান করিতে পারে, তারই মতো একজনের আশ্রয় ছাড়িয়া মাধবীলতা আসিয়াছে। হয়তো সে ছিল নির্মম, সেহ তার কাছে মাধবীলতা পায় নাই, শুধু নির্যাতন সহিয়াছে, হয়তো সে ছিল পরম স্নেহবান, তার আদরে জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্য গলিয়া গিয়া মাধবীলতার জীবন একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে-ই ছিল একমাত্র আশ্রয়, আর কারো কথা মাধবীলতা জানে না। প্রেমিক? এতটুকু মেয়ে, কুমারী মেয়ে, সে প্রেমের কি জানে, প্রেমিকের দাম তার কাছে কতটুকু? খেলার সাথী হিসাবে শুধু তার প্রয়োজন হয় একটু, না হইলেও চলে, একটু মন কেমন করার মধ্যেই সে অভাবের পূরণ হয়।

মুখ তোলো মাধবী, উঠে বোসো। ভয় নেই, আমি সব ঠিক করে দেব।

মাধবী উঠিয়া বসিল। আঁচলে ভালো করিয়া চোখ মুছবার পর তার মুখ দেখিয়া কে বলবে এইমাত্র সে ক্ষেপিয়া গিয়াছিল!

আশ্রমে অনেক মেয়ে থাকে, চল, তোমাকে তাদের কাছে দিয়ে আসি।

মাধবীলতা সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চলুন। সদানন্দ একটু হাসিয়া বলিল, আগে মুখ ধুয়ে কাপড়টা বদলে এস, গালে তোমার সন্দেশ লেগে আছে, কাপড়ে চা ভর্তি।

মুখ ধুইয়া কাপড় বদলাইয়া মাধবী প্রস্তুত হইলে, সদানন্দ তাকে সঙ্গে করিয়া খিড়কিপথেই বাহির হইল। বিপিন বোধহয় সদরের দিকে কোথাও আছে, তার সামনে পড়িবার ইচ্ছা ছিল না। গোলমাল বিপিন করিবেই, তবে সেটা এখন মাধবীলতার সামনে না ঘটাই ভালো। আশ্রমের দুটি অংশের মধ্যে পায়ে পায়ে দু-তিনটি আঁকাবাকা সরু পথ আপনা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। আর কোনো পথ নাই। মাধবীলতা যেন বেশ উৎসাহের সঙ্গে জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিতে থাকে, তপোবনের শোভা দেখিয়া সে যেন খুশি হইয়াছে, ভিজা মাটিতে পা ফেলিয়া যেন আরাম পাইতেছে। বলমাত্র সে যে তার সঙ্গে নূতন একটা আশ্রমে যাইতে রাজি হইয়া যাইবে, এটা সদানন্দের কাছে আশ্চর্য ঠেকে নাই। এখন তার ভাবনা, ঝোঁকের মাথায় রাজি হইয়া গেলেও, শেষ। পর্যন্ত আশ্রমে সে থাকিতে চাহিবে কিনা। হয়তো নারায়ণ আসিয়া ডাকিলে তার মনে হইবে, আশ্রমে থাকিয়া জীবনটা নষ্ট করার বদলে তার সঙ্গে চলিয়া যাওয়াই ভালো।

তখনো আশ্রমের সকলের ধ্যানধারণা, সাধন-ভজন শেষ হয় নাই। গুরুদেবের পদার্পণে অনেকেরই কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হইয়া গেল বটে, কয়েকজন আরো বেশি আসন কামড়াইয়া চোখ বুজিয়া রহিল। গুরুদেব খোঁজ করিয়া জানিবেন, সকলে ইতিমধ্যেই আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছে কিন্তু তারা ধ্যানধারণায় এখনো মশগুল, গুরুদেবের আবির্ভাব পর্যন্ত টের পায় না, এমন আত্মহারা। জানিয়া গুরুদেব নিশ্চয় খুশি হইবেন,

এরাই তার খ্রীটি শিষ্য। আশ্রমে এ রকম অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ জন সাতেক অন্ধভক্ত বাস করে, অন্য সকলের তুলনায় এদের ভক্তির বাড়াবাড়িতে সদানন্দকে মাঝে মাঝে রীতিমতো বিরত হইতে হয়। দুজন বিধবা মহিলা আছে। এইরকম, কি যেন একটা সম্পর্কও আছে দুজনের মধ্যে, পিসি-ভাইঝির সম্পর্কের মতো। একজনের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, শুষ্ক শীর্ণ চেহারা, অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজ। বৌরা সকলে ধীরে ধীরে খোলস ছাড়িয়া একে একে অবাধ্য হইতে আরম্ভ করায় এবং ছেলেরা সকলে একজোট হইয়া বৌদের পক্ষ নেওয়ায়, ছেলে, বৌ, নাতি, নাতনিতে ভরা প্রকাণ্ড সংসার ছাড়িয়া আশ্রমে আসিয়া ডেরা বাঁধিয়াছে।

অপরজনের বয়স কম, বছর ত্রিশেক হইবে। গোলগাল, ফর্সা, রসালো চেহারা, হঠাৎ অপদস্থ। হইলে মানুষের মুখের ভাব যেমন হয়, সব সময় মুখে সেইরকম একটা সকাতর লজ্জার ভাব ফুটিয়া থাকে। সংসারত্যাগী বয়স্কা মহিলাটির সঙ্গে সে থাকে এবং সকল বিষয়ে তাকে অনুকরণ করিয়া চলে। ঘুম হইতে ওঠে একই সময়ে, স্নান ও জপতপ সারে একই সময় ধরিয়া, আহাৰ করে একই খাদ্য-পরিমাণটা পর্যন্ত সমান রাখিতে চেষ্টা করে। বয়স্কা মহিলাটি অন্য সব অনুকরণে সায় দেয়, গোলমাল করে কেবল খাদ্যের পরিমাণটা লইয়া। বলে, মরণ তোমার! আমি অম্বুলে রুগী, যা দাঁতে কাটি তাতেই বুক জ্বলে, আমার সাথে পাল্লা দিয়ে খেলে তুই বাঁচবি কেন শুনি? নে, দুধটুকু গিলে ফ্যাল ঢক করে।

অপরজন মিনতি করিয়া বলে, বমি হয়ে যাবে পিসিমা-অত দুধ খেলে নিশ্চয় বমি করে ফেলব।

দুধ তাকে খাইতে হয়, সমস্তটাই। খানিক পরে একটা খোঁচাও খাইতে হয়, কৈ লো রত্নী, বমি হয়ে যাবে? বাঁচতে সাধ না থাকে, বিষ খেয়ে মরবি যা, নয়তো গলায় দড়ি দে-না খেয়ে শুকিয়ে মরা চলবে না বাবু আমার কাছে।

এর নাম রত্নাবলী। পিসিমা কখনো ডাকে রনী, কখনো বলে রতন। পিসিমার নাম উমা। সদানন্দ ছাড়া এ জগতে তার নাম ধরিয়া ডাকিবার আর কেউ নাই-একজন ছিল, মাঝে

মাঝে নাম ধরিয়া ডাকিত, মস্ত সংসারটা গড়িয়া দিয়া অনেকদিন আগে বিদায় লইয়াছে, সে সংসার ছাড়িয়া উমা এখানে আসিয়াছে, ছেলে, বৌ, নাতি, নাতনিতে ভরা বিরাট সংসার।

মাধবীলতাকে সদানন্দ এদের কাছে জমা করিয়া দিল। বলিল, মেয়েটি আজ আশ্রমে ভর্তি হল, মেয়েটির কেউ নেই উমা।

রত্নাবলী খুশি হইয়া উঠিল, উমা সন্দিক্তদৃষ্টিতে মাধবীলতার দিকে চাহিতে লাগিল। বোঝা গেল, আশ্রমে হঠাৎ এই বয়সী একটি মেয়ের আবির্ভাবে তার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হইতেছে, সদানন্দের কাছে সেগুলি মুখে উচ্চারণ করিবার সাহস তার নাই।

ঘরের সম্মুখে কার্পেটের আসন পাতিয়া সদানন্দকে বসিতে দেওয়া হইয়াছিল। কোলের উপর ডান হাতের তালুতে বা হাতের তালু রাখিয়া মেরুদণ্ড সিধা করিয়া দেবতার মতো সদানন্দ বসিয়াছে, আনন্দ বেদনার অতীত ধীর, স্থির, বিকারহীন একস্তূপ মূর্তিমান শক্তির মতো-সংহত ও সচেতন। সোজা উমার মুখের দিকে চাহিয়া বজ্রগস্তীর ধমকের আওয়াজে সদানন্দ বলিল, তুমি কি ভাবছ উমা? আর কি ভাবছ উমা, ধুলায় গড়া ভঙ্গুর পুতুলের মতো উমা চুরমার হইয়া গিয়াছে। পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া উমা অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিতে থাকে, মুমূর্ষ জন্তুর মতো জীর্ণশীর্ণ দেহটা থথর করিয়া কঁপে। গুরুদেবের সম্বন্ধে অন্যায় কথা মনে আসিয়াছে, গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে তাহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, একি আকস্মিক সর্বনাশের সূচনা।

রত্নাবলীর মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছে, আশ্রমবাসী আরো যে কয়জন নরনারী ইতিমধ্যে আসিয়া সমবেত হইয়াছিল, তাহাদের মুখও বিবর্ণ। মাধবীলতা সভয় বিস্ময়ে একবার ভুলুষ্ঠিতা উমার দিকে, একবার সদানন্দের মুখের দিকে চাহিতে থাকে। মানুষের উপর যে মানুষের এতখানি প্রভাব থাকে, একটিমাত্র ধমকে যে কেহ উমার বয়সী নারীকে পায়ের নিচে লুটাইয়া দিতে পারে, মাধবীলতার তা জানা ছিল না। নিজের বুকের মধ্যেও টিপটিপ করিতেছে দেখিয়া সে আরো অবাক হইয়া গেল।

সদানন্দ মৃদুস্বরে বলিল, উঠে বোস উমা।

উমা উঠিয়া বসিলে তেমনি মৃদু ও শান্তকণ্ঠে বলিল, মনকে সংযত রেখো। মন হল ঘরের মতো, ধুলোবালি এসে জমা হয়, বাঁট দিয়ে সে সব সর্বদা সাফ করে নিতে হয়, নইলে ঘর যেমন আবর্জনায় ভরে ওঠে মনও তেমনি কুচিত্তায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

উমা মাথা নিচু করিয়া শুনিয়া যায়। সদানন্দের সাংঘাতিক নির্মমতার এই প্রকাশ্য অভিব্যক্তি মাধবীলতাকে ভীত ও সকাতির করিয়া তোলে। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হইয়া সদানন্দের কথা শুনিতোছিল, দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া মাধবীলতা মেঝেতেই বসিয়া পড়িল।

তখন সদানন্দ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া বলিল, মেয়েটি তোমাদের কাছে থাকবে উমা, তোমরা ওকে দেখাশোনা করো। বোসা তোমরা-আর সকলে কোথায়?

একজন শিষ্য তাড়াতাড়ি আশ্রমের সকলকে ডাকিয়া আনিতে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আশ্রমের সকলে উমা ও রত্নাবলীর কুটিরের সম্মুখে আসিয়া জমা হইল, আসনে বসিয়া যে ঈশ্বরকে ডাকিতেছিল, সেও। ঈশ্বরকে ডাকার চেয়ে গুরুদেবের ডাক বড়।

## ৩. মাধবীলতাকে নিয়ে বাইরে কিছু হৈচৈ হইল না

মাধবীলতাকে নিয়ে বাইরে কিছু হৈচৈ হইল না। রাজপুত্র নারায়ণের আশঙ্কাটা দেখা গেল, নিছক তার নিজেরই কল্পনা-অন্যায় অনভিজ্ঞ মনের স্বাভাবিক ভীৰুতার ফল। যাদের কাছ হইতে চুরি করিয়া আনা হইয়াছে মাধবীলতাকে, চোর বা বর্মাল সম্বন্ধে তাদের কিছুমাত্র মাথাব্যথার লক্ষণ টের পাওয়া গেল না। দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, জীবনের আকস্মিক গতি পরিবর্তনের ধাক্কায় আহত ও বিব্রত মাধবীলতার রক্তমাংসের ক্ষয় বন্ধ হইয়া বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে ফিরিয়া আসিতে লাগিল স্বাভাবিক ইক্ষুদণ্ডের রং-তাদের কোনো সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না, যাদের কথা ভাবিয়া মাধবীলতাকে প্রকাশ্যে আশ্রমে আনার জন্যে বিপিন নারায়ণকে অনুযোগ জানাইয়াছিল, অত পরামর্শ দরকার হইয়াছিল দুজনের।

নারায়ণ গোলমাল করিল না। হয়তো সাহস পাইল না, হয়তো ভাবিয়া দেখিল গোলমাল করা মিছে, অথবা হয়তো ঘাড়ের বোঝা নামিয়া যাওয়ায় নিশ্বাস ফেলিল স্বস্তির। আশ্রমে ভর্তি করার জন্যই মেয়েটিকে সে আনিয়াছে, প্রথমে এই কথা বলা হইয়াছিল সদানন্দকে, তার কাছে এই ঠাঁই বজায় রাখিয়া চলিতে হইল আগাগোড়া। দেখা গেল, ঠাট বজায় রাখতে সদানন্দও কম ওস্তাদ নয়। এস বাবা বোসো, বলিয়া রাজপুত্রকে সে বসাইল কাছে। রাজপুত্রের বেলা নির্বিকার ভাবটা কমাইয়া একটু স্নেহ জানাইবার জন্য বিপিনের যে অনুরোধ ও উপদেশ এতকাল কিছুতেই স্মরণ রাখিতে পারি না, আজ যেন সেই অনুরোধ ও উপদেশের মর্যাদা সুদে-আসলে দিবার জন্যই নির্বিকার ভাবটা বিসর্জন দিয়া জানাইল গভীর স্নেহ। বলিল া যাও, বেড়িয়ে এস গে একটু নদীর ধার থেকে দুজনে। কবে আবার দেখা হয় তোমাদের ঠিক তো নেই। কেন যাবে না মাধু, যাও। শিগগির ফিরো-সন্ধ্যার আগে।

মাধবীলতাকে চোখের দেখা দেখিতে না দিয়াই সদানন্দ রাজপুত্র নারায়ণকে ফিরাইয়া দিতে পারিত, কারো ক্ষমতা ছিল না বাধা দেয়। বিপিন তো রাগ করিয়াছেই, না হয় আরো খানিকটা বেশি রাগ করিত। কিন্তু দুজনকে নির্জনে একটু আলাপ করিতে দেওয়াই সদানন্দ ভালো মনে করিল। দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার বলিয়া নয়- বোঝাপড়া হইবে না, এরকম অবস্থায় বোঝাপড়া হয় না, বোঝাপড়ার কিছু নাই। একটু আবোল তাবোলে বকিবার সুযোগ পাক দুজনে। সদানন্দের জোর-জবরদস্তির অভিযোগ যেন ঘূণাক্ষরেও মনে না জাগে কারো; মাধবীলতা আশ্রমে থাকিতেছে স্বেচ্ছায়, নারায়ণ তাকে আশ্রমে রাখিয়া যাইতেছে স্বেচ্ছায়, এর মধ্যে আর কারো কর্তৃত্ব নাই। বিপিনও হয়তো একটু ঠাণ্ডা হইবে ব্যাপার বুঝিয়া, জোর দিয়া বলা চলিবে বিপিনকে যে, মাধবী থাকতে চাইলে, আমি কি করব বিপিন?

এত সব ভাবিয়া সদানন্দ দুজনকে নদীর ধারে বেড়াইতে পাঠাইয়া দিল। তবু একান্ত যুক্তিহীনভাবেই মনটা একটু উতলা হইয়া রহিল বৈকি! বর্ষার গোড়ায় এ কি অপরাহ্ন আসিয়াছে। আজ। দীপ্তি সংবরণ করিয়া বর্ণচ্ছটা বিতরণের আর কি দিন জুটিত না অকালে ক্লান্ত সূর্যের। মন্ডর গতিতে নদীতীরের কোনখানে ওরা দুজনে পৌঁছিয়াছে, কি বলাবলি করিতেছে নিজেদের মধ্যে। কত অভিমান আর অনুনয় না জানি রাজপুত্র প্রকাশ করিতেছে কথায়, মুখের ভাবে, চোখের বিষাদে। অনুযোগ হইয়া উঠিতেছে মিনতি। মন যদি না মানে মাধবীর? মোড় যদি ঘুরিয়া যায় তার মনের? যদি সে তুলনা করে, এই বিরাট-দেহ শ্রীহীন দরিদ্র প্রৌঢ়ের সঙ্গে রূপবান ধনবান সঙ্গী যুবকটির, আর তুলনা করিয়া যদি তার মনে খটকা বাধে যে কি হইবে ধর্মিকের মুখোশপরা নরপিশাচটার আশ্রমে বাস করিয়া; তার চেয়ে রাজপুত্রের হাত ধরিয়া উধাও হইয়া যাওয়া ঢের ভালো, যাহোক তাহোক ফলাফল? সকাতির ক্লিষ্ট ঔৎসুক্যের সঙ্গে সদানন্দ দুজনের ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষা করে, নিজেকে নিজেই মনে মনে বলে, আমি কি আঁ!-অত্যন্ত আত্মদর যেন দীনভাবের আধিক্যে কোথায় তলাইয়া যায় কিছুক্ষণের জন্য এবং এতক্ষণে প্রকৃত পুণ্যবানের মতো অস্থায়ীভাবে বিনা প্রতিবাদে মাধবীলতা সম্পর্কে নিজেকে বিশ্বাস করিয়া ফেলে-পাপী।

তেজস্বী কম নয় সদানন্দ। গোয়ার নয় বলিয়া বিপিন জানে মানুষটা সে নরম-খুঁটিনাটিতে সে সর্বদা হার মানে, মোটামুটিতে কবে তার প্রচণ্ড তেজস্বিতা প্রকাশ পাইয়াছিল, সে কথা মনে করে রাখে। কে? তেজস্বীর কাছে দুঃখ বেদনা সহজে আমল পায় না। কিন্তু অন্যায়ের ক্ষণিক উৎসমুখে নিবিড় মমতার এক অপরূপ মাধুর্য উৎসারিত হইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে, তার আফসোস বড় দুরন্ত। আহা, কী মিষ্টিই ছিল মাধবীলতাকে উমার জিস্ম করিয়া দিয়া আসিবার পর হইতে প্রায় সমস্ত রাত্রির অযাচিত জাগরণের ছটফটানি রীতিমতো আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত, সেই বীভৎস করুণ পাশবিক। মায়ার স্বাদ! অনাস্থাদিতপূর্ব সেই মাধুর্যের লোভই হাল ছাড়িয়া দিয়া ধৈর্যহীন, ক্লেদাক্ত দুঃখে কী কাবুই হইয়া পড়ে মহাতেজস্বী সদানন্দ।

সন্ধ্যা পার হইয়া যায়, দুজনের ফিরিবার নাম নাই। নিজের সঙ্গে নিজের বিষাক্ত আত্মীয়তা স্থাপনের মজাটা সদানন্দ পরিষ্কার টের পাইতে থাকে। তারপর যখন খবর আসে নারায়ণ চলিয়া গিয়াছে, মাধবীলতা উমা ও রত্নাবলীর কুটিরে ফিরিয়া গিয়াছে, তখন খুশি হইবার ক্ষমতাও থাকে। না, এমনি নিস্তেজ আর ভেতা হইয়া পড়ে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, বিপিনও গোলমাল করিল না। অন্তত সদানন্দ যেরকম ভাবিয়াছিল, সেরকমভাবে করিল না। পরের উত্তেজনা নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়া উত্তেজিত হওয়ার মতো প্রথমটা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ফাট ফাট বোমার মতো অবস্থায় সদানন্দের কাছে আসিয়া দাবি করিল, এর মানে? সদানন্দ জবাব দেওয়ামাত্র বোমার মতো ফাটিয়া গেল। ব্যস্। আর কিছুই নয়। নিজের বিস্ফোরণে নিজেই যেন সে দারুণ আহত হইয়াছে, রাগ করিবারও আর ক্ষমতা নাই।

তারপর আশ্রমের কারো কাছে কিছু না বলিয়া সে যে কোথায় চলিয়া গেল, সেই জানে। মাধবীলতার সঙ্গে নদীর ধারে একটু পায়চারি করিয়া নারায়ণ সেদিন ফিরিয়া গেল, বিপিন আশ্রমে অনুপস্থিত। আরো দুদিন পরে সে ফিরিয়া আসিল। গম্ভীর চিন্তিতমুখে সদানন্দকেই জিজ্ঞাসা করিল, মাধবী নারায়ণবাবুকে কি বলেছে?

আমি তো জানি না বিপিন। মাধবী যেতে চায় না, আমিই বলেকয়ে দুজনকে নদীর ধারে পাঠিয়ে দিলাম। ওদের মধ্যে কি কথা হয়েছে, আমি কি করে বলব?

বিপিন হঠাৎ হাসিয়া বলিল, তোর পাতানো মেয়ে, তুই ছাড়া কে বলবে? বাবা বলে ডাকে। না তোকে?

বিপিন কিছু সন্দেহ করিয়াছে নিশ্চয় এবং এটা তার নিছক সন্দেহমূলক কদর্য পরিহাস নয়। কিন্তু সদানন্দ ধরা দিল না। উদাসভাবে হাই তুলিয়া বলিল, পাতানো মেয়ে আবার কিসের?

ভিতরটা রি রি করিতে লাগিল। একটা যেন খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গেল বিপিনের সঙ্গে, যাতে জয়পরাজয়ের পার্থক্য নাই, তবু জয়ী হইলেই বেশি ক্ষতি। বিপিন হাত কচলায় আর ঠিক যেন মুখের হাসিটাকেই চিবাইতে চিবাইতে অনিরোধের অভিনয় করিতে থাকে। কিছু ভাবিতেছে এমন কথা মনেও করা যায় না, জিহ্বা যেন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে চুপচাপ থাকিবার ভঙ্গিটা এমন খারাপ। হঠাৎ বলিয়া যেন ভাবিতে লাগিল তামাশা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবে কিনা।

সদানন্দ ধৈর্য হারাইয়া বলিল, কি ভাবছিস শুনি?

কিছুই ভাবছি না।

কথাটা কিন্তু সত্য নয়। বিপিন যা ভাবিতেছিল, বলিবে কিনা ঠিক করতে পারিতেছিল না। সঙ্কোচটা কিসের, তাও সে নিজেই ভালো বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কিসে যেন বাধিতেছে-একটা অর্থহীন অকারণ বাধা। খানিক পরে হঠাৎ মরিয়া হইয়া বলিয়া বসিল, মাধবীকে ফিরিয়ে রেখে আসি তবে কাল পরশু?

কোথায়?

যেখান থেকে এসেছে, ওর মামার বাড়ি।

সদানন্দ মাথা নাড়িয়া জোরের সঙ্গে বলিল, না। এইখানে থাকবে মাধবী, কোথাও যাবে না।

ছোট একটি নুড়ি পাথর বিপিন হাতে নাড়াচাড়া করিতেছিল, উপরের দিকে ছুড়িয়া দিয়া আবার সেটিকে লুফিয়া লইয়া সে হঠাৎ মুচকি হাসিয়া বলিল, কেন মিছে বালির ঘর বাঁধছ বাবা। রাজপুরকে ছেড়ে তোমার দিকে ঝুঁকবে, তেমন মেয়েই ও নয়। গুরু সেজে বড়জোর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে গালটা টিপে দিতে পার, তার বেশি কিছু—

তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে বিপিন?

বিপিন ধৈর্যহারা হইয়া বলিল, মাথা আমার খারাপ হয় নি, হয়েছে তোর। কচি একটা মুখ দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে গেছি। ঢং করে রত্নীর ওখানে রাখা হল কেন, নিজের কাছে রাখলেই হত, বুকে করে?

সদানন্দকে কথাটি বলিবার সুযোগ না দিয়া বিপিন পটগট করিয়া চলিয়া গেল। সেদিন আর কাছেই ঘেঁষিল না সদানন্দের। খবর আসিল মাধবীলতাকে সে অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে জেরা করিয়াছে। চালচলনে যেন কেমন একটু রহস্যের আমদানি হইয়াছে বিপিনের। কাজ ও কথা হইতেছে খাপছাড়া, প্রতিক্রিয়া হইতেছে অপ্রত্যাশিত। পরদিন দেখা হইলে সদানন্দ তাকে একটু বুঝাইয়া বলিতে গেল যে দোষটা যখন সদানন্দের, আশ্রমে থাকিবার জন্য মাধবীলতাকে পীড়ন করাটা কি সঙ্গত হইবে? এ কথায় বিপিন রাগ করিবে সদানন্দ তা জানি, কিন্তু রাগটা যে তার এমন অদ্ভুত রকমের হইবে, সে তা কল্পনাও করে নাই।

শেষ পর্যন্ত মাধবীকে পীড়ন করব, তাও ভাবতে পেরেছিস সদা? ভয় নেই, তোর প্রেমের পথে কাটা হয়ে থাকব না, আমি বিদায় হচ্ছি।

মুখচোখের কি ভঙ্গি বিপিনের, সর্বাঙ্গে কি থরথর কম্পন! দেখিলে মনে হয় ভিতর হইতে কি যেন তাকে জ্বালাও দিতেছে, ধরিয়া নাড়াও দিতেছে। সদানন্দ তার বাহুমূল চাপিয়া ধরিল। ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তোর অসুখ করেছে নাকি বিপিন?

বিপিন বলিল, হাত ছাড়। আমার হাতটা লোহা দিয়ে তৈরি নয়।

তারপর আর কিছুই বিপিন বলিল না, কোথায় যেন চলিয়া গেল। চলিয়া গেল? কোথায় চলিয়া গেল বিপিন তার এই আশ্রম ছাড়িয়া, তার প্রাণের বন্ধু সদানন্দকে ছাড়িয়া? কারোকে প্রশ্ন করিবার উপায় নাই, সদানন্দকে চুপ করিয়া থাকিতে হয়। বিপিন কোথায় গিয়াছে সদানন্দই যদি না জানে, সে তবে কেমন কথা হয়? গুরুদেবকে না জানাইয়া গিয়াছে নাকি বিপিন! সদানন্দের মনের মধ্যে নানা চিন্তা পাক খায়, নান দুর্ভাবনা ঘনাইয়া আসে, বাহিরে গম্ভীর হইয়া থাকে, যথারীতি নিজের কাজ করিয়া যায়। নিয়ম-কানুন বাধাই আছে আশ্রমে, কোনো ব্যবস্থারও অভাব নাই, তবু বিপিন না থাকিলে যেন চলে না, আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অবাধ গতি ঠেকিয়া ঠেকিয়া থামিয়া থামিয়া চলিতে থাকে-অসুবিধা সৃষ্টি হয়, গোলমাল বাঁধিয়া যায়, অনুষ্ঠান নিখুঁত হয় না, ঠিক যেন গৃহিণীবিহীন বৃহৎ সংসার। বিশেষভাবে সব ঠিকঠাক করিয়া দিয়া নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোথাও গেলেও বিপিনের অনুপস্থিতি সব সময়েই অনুভব না করিলে চলে না, এবার তো সে কিছু না বলিয়া কহিয়া হঠাৎ চলিয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ সদানন্দকে বিপিনের খবর জিজ্ঞাসা করে।

সদানন্দ সংক্ষেপে ভাসা-ভাসা জবাব দেয়, আসবে, দু-চার দিনের মধ্যে আসবে।

দু-তিনটা দিন কাটিয়া যাওয়ার পর বিপিনের জন্য সদানন্দের মন কেমন করিতে থাকে। অনেকরকম মনোভাবের মিশ্রণে প্রথমে মনের মধ্যে যে খিচুড়িটা তৈরি হইয়াছিল, সেটা হজম হইয়া যাওয়ার পর ক্ষুধার মতোই অভাববোধটা ক্রমেই যেন হইয়া উঠিতে থাকে জোরালো। এটা একটু আশ্চর্য। কতবার তো ছাড়াছাড়ি হইয়াছে বিপিনের সঙ্গে, মাস কাটিয়াছে, বছর কাটিয়াছে, বিপিনের জন্য এরকম মন খারাপ হইয়াছে কবে? তবে

এভাবে ছাড়াছাড়ি হয় নাই কোনো বার। একসঙ্গে চলিতে চলিতে দুজনের পথ চলিয়া গিয়াছে দুদিকে, দুজনে তাই চলিয়াও গিয়াছে দূরে। এবার বিপিন রাগ করিয়াছে, মনে আঘাত পাইয়াছে, ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাকে। কে ভাবিতে পারিয়াছিল এমন হইবে? রাগিয়া কলহ করিবে না, বোঝাপড়ার চেষ্টা করিবে না, নূতন নূতন মতলব আঁটিয়া প্রকারান্তরে নিজের জিদ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবে না, কেবল বলিবে চললাম, আর বলিয়া গটগট করিয়া চলিয়া যাইবে! এমন কি ঘটিয়াছে যার জন্য এমন ভয়ানক আঘাত পাইল বিপিন, এমন কাণ্ড করিয়া বসিল?

সদানন্দের সবচেয়ে দুর্বোধ্য মনে হয়, সমস্ত ফেলিয়া গেল বিপিন, কিন্তু এই চরম চালটা কোনো দিক দিয়া কাজে লাগানোর চেষ্টা করি না। চলিয়া যাওয়ার ভয় দেখাইয়া কারু করিয়া চলিয়া যাওয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাধবীলতা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিতে রাজি হওয়ার সুযোগ দিয়া সদানন্দকে বশ করিবার চেষ্টা করিলে এবং চলিয়া যাওয়ার পরেও সদানন্দকে মত পরিবর্তন করিয়া তাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া আনিবার উপায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গেলে, তবেই যেন কাজটা বিপিনের প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইত। এভাবে চলিয়া যাওয়া তো সম্ভব বলিয়াই মনে হয় না বিপিনের পক্ষে।

বিপিনের কি চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল? ভালো লাগিতেছিল না আশ্রমের শিষ্য, ম্যানেজার, মন্ত্রী, সংগঠক ও বন্ধুর জীবন? এ ধরনের সন্দেহ মনে আসিলে সদানন্দ সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়িয়া ফেলে। আশ্রম সম্বন্ধে বিপিনের মমতার কথা তার চেয়ে কে ভালো করিয়া জানে। যেখানেই গিয়া থাক বিপিন, আশ্রমের জন্য মন যে তার ছটফট করিতেছে, তাতে সন্দেহ নাই।

বিপিন ফিরিয়া আসিবে। রাগের মাথায় দুদিনের জন্য কোথাও গিয়াছে, আবার ফিরিয়া আসিবে। একদিকে মন কেমন করা যেমন চাপা যায় না, অন্যদিকে বিপিনের ফিরিয়া আসিবার আশাটাও অসংখ্য যুক্তি ও অন্ধবিশ্বাসের আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হয়। সমগ্রভাবে বিচার করিয়া নিজের অবস্থাটা সদানন্দ মোটামুটি বুঝিতে পারে। বিপিন যেমন হোক, বিপিনকে ছাড়া চলিবে না।

বুঝিতে পারিয়া রাগ হয়। এই আশ্রমের এতগুলি মানুষের মধ্যে যাকে ইচ্ছা একটি মুখের কথায় সে মাটিতে লুটাইয়া দিতে পারে, শতধিক মানুষ বাহির হইতে সপ্তাহে তিন দিন তার উপদেশ হাঁ করিয়া শুনিয়া যায়, দেশের চারিদিকে নিকটে ও দূরে জানা-অজানা কত ভক্ত তার ছড়াইয়া রহিয়াছে, বিপিনকে ছাড়া তাঁর চলিবে না? এ তো ভালো কথা নয়।

আশ্রম পরিদর্শন ও পরিচালনার ভারটা সদানন্দ নিজের হাতে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। বিপিন গিয়াছে যাক। সকালে ঘুম ভাঙিয়া বিপিন আশ্রমে নাই ভাবিয়া বুকটা ছাৎ করিয়া ওঠে-করুক। আশ্রমবাসী ও আশ্রমবাসিনীদের উপদেশ ও নির্দেশ দিতে, দর্শনার্থীকে দর্শন দিতে, আশ্রমের কাজ ও জিনিসপত্রের হিসাব রাখিতে, নদীর ধারে কাঠের গুঁড়িটাতে বসিয়া আশ্রমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিকল্পনা গড়িয়া তুলিতে, এমন কি রাত্রে বিশ্রামের জন্য শয়ন করিতে পর্যন্ত বিপিনকে মনে পড়িয়া মন খারাপ হইয়া যায়-যাক। বিপিন যেমন চলিয়া গিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে তাকে ছাড়া তার চলিবে না, সেও তেমনি আশ্রমকে নিখুঁতভাবে চালাইয়া, আশ্রমের উন্নতি করিয়া দেখাইয়া দিবে বিপিনকে ছাড়া ও তার চলে।

কয়েকদিনের মধ্যেই সে টের পাইল, উন্নতি দূরে থাক, বিপিন এতকাল যেভাবে চালাইয়া আসিয়াছে, ঠিক সেইভাবে আশ্রম চালনার কাজটাও যেমন কঠিন, তেমনি জটিল। বিপিন যে বলিয়াছিল, সে কিছু বোঝে না, কেবল তার আদর্শ নিয়া থাকে, মনের মধ্যে আদর্শ পোষণ করা এক কথা আর সেটা কার্যে পরিণত করা আলাদা কথা-এবার বিপিনের সে কথার আসল মানেটা হাড়ে হাড়ে টের পাইতে লাগিল। কিন্তু সদানন্দ ক্ষুব্ধও হইল না, নিরুৎসাহও হইল না। এমন তো হইবেই। কাজ করার অভ্যাস চাই, জানা চাই কি হইলে কি হয়, কি করিতে কি করা দরকার। এক হিসাবে ভালোই হইয়াছে বিপিনের চলিয়া যাওয়াতে। বিপিনের উপর বড় বেশি নির্ভরশীল। হইয়া পড়িয়াছিল, বড় বেশি দূরে সরিয়া যাইতেছিল আশ্রমের পরিচালনা ও সংগঠনের খুঁটিনাটি হইতে। এবার সব বুঝিয়া মনের মতো করিয়া আশ্রম চালাইতে পারিবে, আশ্রমকে গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

বিপিনের অনুপস্থিতির জন্য যতটা না হোক, সদানন্দের অপটু ম্যানেজারির ফলে আশ্রমে আরো বেশি বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগিল। বিপিন ফিরিয়া আসিল দশ-বার দিন পরে, এই সময়ের মধ্যেই কত নিয়ম যে ভাঙিয়া পড়িল, কত ব্যবস্থা যে উল্টাইয়া গেল, সৃষ্টি হইল নূতন নিয়ম। ফলটা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াইত বলা যায় না। পরিবর্তনের সময় বিশৃঙ্খলা আসিবেই। আশ্রমে সে একটা গোলমাল সৃষ্টি করিয়াছে, আশ্রমবাসী নরনারী একটু ভ্যাবাঁচাকা খাইয়া গিয়াছে, টের পাইয়াও সদানন্দ বিশেষ ব্যস্ত হয় নাই। সাজিয়া ঢালিতে গেলে এসব যে অবশ্যস্বাভাবী, সে তা জানে। সদানন্দের ব্যবস্থায় আশ্রমের জীবন হয়তো এতদিনের কতগুলি কৃত্রিমতার খোলস ছাড়িয়া আরো উঁচু স্তরেই উঠিয়া যাইত শেষ পর্যন্ত, কে বলিতে পারে। অন্তত কড়া বিধিনিষেধগুলি যে শিথিল হইয়া আসিত, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভালো করিয়া গড়িবার উদ্দেশ্যে সদানন্দের ভাঙন ভালোরকম আরম্ভ হইবার আগেই বিপিন ফিরিয়া আসিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আশ্রমও যেমন ছিল হইয়া গেল তেমনি।

সদানন্দ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাঁচলাম, ভাই। বলা নেই কওয়া নেই, কোথা গিয়েছিলি তুই? আশ্রম চালানো কি আমার কাজ!

বাহাদুরি করতে তোকে কে বলেছিল? যা আরম্ভ করেছিলি তুই-চমৎকার!

কথাটার খোঁচা লাগিল সদানন্দের। একবার ইচ্ছা হইল সত্য সত্যই বাহাদুরি করিয়া বলে, কয়েকটা মাস পরে ফিরিয়া আসিলে আশ্রমের উন্নতি দেখিয়া বিপিনের তাক লাগিয়া যাইত। বিপিন। রাগিয়া যাইবে ভাবিয়া ইচ্ছাটা দমনও করিল, নিরীহভাবে একটু শান্ত হাসিও হাসিল।

কোথায় গিয়েছিল বিপিন? আমবাগানটা বাগাইতে-একেবারে দানপত্র পাকা করিয়া আসিয়াছে। একটা খবর দেয় নাই কেন বিপিন? কেন দিবে, সদানন্দ যখন চায় যে বিপিন আর তার এত সাধের আশ্রম সমস্ত চুলোয় যাক! কি গরজ বিপিনের খবর দিবার! না না, ঠিক তা নয়, খুব ব্যস্তও ছিল বটে বিপিন, একটু মজাও দেখিতেছিল বটে! হঠাৎ সে

জন্মের মতো বিদায় হইয়া গেলে সদানন্দ কি করে দেখিবার সাধটা বিপিনের অনেক দিনের।

## ৪. বর্ষাকালে সদানন্দ অবসর পায় বেশি

বর্ষাকালে সদানন্দ অবসর পায় বেশি। বড় চালাটার নিচে সর্বসাধারণের জন্য সভা বসে মাঝেমধ্যে, লোকজন আসেও খুব কম। সামান্য জলকাদা ভক্তদের উৎসাহ কমাইয়া দেয় দেখিয়া সদানন্দ ক্ষুণ্ণ হয়। নানারকম খটকা জাগে মনে। লোকে কি তার কথা শুনিতে আসে হুজুগে পড়িয়া, সময় কাটানোর জন্য? একটু কষ্ট স্বীকার করিবার দরকার হইলেই অনায়াসে আসাটা বাতিল করিয়া দেয়? কিন্তু আশ্রমের ভাণ্ডারে দান হিসাবে প্রণামী তো তাকে প্রায় সকলেই দেয়-কেউ দেয় যতবার আসে ততবারই, কেউ দেয় মাঝে মাঝে। ঘরের কড়ি পরকে দেওয়া ত্যাগ বৈকি। বিনিময়ে পুণ্য অবশ্য তারা পায়। কিন্তু বর্ষাকালে পুণ্যের দরকারটা এত কমিয়া যায় কেন ওদের? পুণ্যও কি বাজারের ভালো মাছ তরকারির শামিল ওদের কাছে, জলকাদা ভাঙিয়া যোগাড় করার চেয়ে ঘরে যা আছে তাই দিয়া কাজ চালাইয়া দেয়? সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ হয় সদানন্দের, বর্ষার জল ভক্তদের কাছে তার আকর্ষণকে জলে করিয়া দিতে পারে বলিয়া। অহংকার বড় আহত হয়। এদিকে আশ্রমের কাজেও বর্ষাকালে শৈথিল্য আসে। নিজের নিজের কুটিরে বসিয়া উপাসনা জপতপ পূজার্চনা যার যত খুশি করে, যার যত খুশি করে না, সকলকে একত্র করিয়া সদানন্দ উপদেশ বিতরণ করিতে আসে কম। কোনোদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, কোনোদিন থাকে মুষলধারে বর্ষণ। সদানন্দ হয়তো মেঘে ঢাকা আকাশকে উপেক্ষা করিয়া নদীর ধারে খানিকটা ঘুরিয়া আসে, হয়তো বাহির হইয়া যায় কেবল বৃষ্টিতে ভিজিতে। অথবা হয়তো নিজের ঘরে শুইয়া পড়ে বই। আশ্রমের নরনারীদের উপদেশ দিতে যায় খুব কম।

মাধবীলতা মাঝে মাঝে আসে। উপদেশ শুনিয়া যায়।

হিলতোলা জুতা খটখট করিয়া হাজির হয় সে একেবারে সদানন্দের অন্তঃপুরে। এটা আশ্রমের নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু সদানন্দ নিজেই যখন অনুমতি দিয়াছে, নিয়ম অনিয়মের প্রশ্ন কে তুলিবে। বিপিন তুলিতে পারে, সদানন্দকে পাগল করিয়া দিতে পারে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া, কিন্তু সে চুপ করিয়া থাকে। একদিন দুপুরবেলা মাধবীলতা আসিবার পর সদানন্দকে জানাইয়া হঠাৎ সে চলিয়া গিয়াছিল বাহিরে, বলিয়া গিয়াছিল ফিরিতে সন্ধ্যা হইবে। আধঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়াছিল হঠাৎ।

না, বুকে সদানন্দ মাধবীলতাকে টানিয়া নেয় নাই। খাটের একপ্রান্তে পা ঝুলাইয়া মাধবীলতা যে ভাবে বসিয়াছিল, এখনো বসিয়া আছে তেমনি ভাবেই, তেমনি মনোযোগের সঙ্গে শুনিতেছে সদানন্দের কথা। কেবল সদানন্দের দৃষ্টি বড় কোমল, বাস্তব মমতার স্পষ্ট অভিব্যক্তি যেন কোনো কিছুই রূপ ধরিয়া দুচোখে ফোয়ারার মতো উৎসারিত হইয়া উঠিবে, মুখের কথা শেষ হওয়ার শুধু অপেক্ষা।

মাধবীলতার মুখখানা টসটস করিতেছে জীবনীশক্তির রসে। আর হ্যাঁ, চোখ দিয়াও টসটস করিয়া জল পড়িতেছে মেয়েটার।

মাধবী বলছিল, এখানে থাকতে ওর ভালো লাগছে না বিপিন। কদিন থেকে ওর মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে—রাত্রে ঘুমোতে পারে না।

তাই নাকি। বলিয়া বিপিন এমন একটা আফসোসের শব্দ করিল যে, ঘরের করুণ আবহাওয়াটা বীভৎস প্রতিবাদে ওই সামান্য শব্দটুকুরও মধ্যে বজ্রের মতো গর্জিয়া উঠিল। কি বললি? বলিয়া সদানন্দ যে গর্জন করিয়া উঠিল, সে শব্দটা তুলনায় শোনাইল যেন ক্ষীণকণ্ঠের ফিসফিসানি কথা।

তারপর কিছুক্ষণ তিনজনেই চুপ। একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছে, ঘর হইতে চলিয়া গিয়া আরেকটা ভুল বিপিন করিল না। ঠিক সময়মতোই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, অন্য কথা ভাবছিলাম।

সদানন্দ বলিল, ও!

এখানে থাকতে তোমার ভালো লাগছে না মাধবী?

লাগছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়।

কেন? মাঝে মাঝে মন খারাপ হইয়া যায় কেন মাধবীর? বাড়ির জন্য? না, বাড়িতে এমন কে আছে মাধবীর, যার জন্য মন কাদিবে! তবে? মাধবী শুধু মাথা নাড়ে, মুখ ফুটিয়া শুধু বলে জানি। না। বাহিরে আকাশ ছাইয়া মেঘ করিয়াছে, ঘরের ভিতরটাও যেন ঐরকম ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে। চুরি করিয়া আনা একটি যুবতী মেয়ের মন খারাপ হয় কেন, প্রশ্ন করিয়া আবিষ্কার করা কি সহজ ব্যাপার! অন্য কোথা যাইতে চায় মাধবী! না, এইখানেই মাধবী থাকিবে, চিরকাল থাকিবে, যতদিন তার দেহে প্রাণ থাকে ততদিন।

সদানন্দ ও বিপিন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। গুমোট সদানন্দ ঘামিয়া গিয়াছে, এবার বিপিন ঘামিতে আরম্ভ করে ভিতরের উত্তেজনায়। ভুল বিপিন সহজে করে না, মাধবীলতার সম্বন্ধে কেবলি ভুল হইয়া যাইতেছে। ছোট একটা টুলে বসিয়াছিল বিপিন, জানালা দিয়া বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সে মৃদুস্বরে বলে, আশ্রমে আটকা পড়ে গেছ কিনা, সেইজন্য খারাপ লাগছে। কদিন বাইরে থেকে ঘুরে এলে বোধহয় ভালো লাগত। নারায়ণবাবু আমায় নেমন্তন্ন করেছেন পরশু, যাবে আমার সঙ্গে মহীগড়ে? বেশ জায়গাটা।

মাধবীলতা মাথাও নাড়ে, মুখেও বলে, না।

বিপিনকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে শুনিয়া সদানন্দ একটু অবাক হইয়া যায়, রাজপুত্র নারায়ণের জন্য মাধবীলতার মন কেমন করিতেছে না, এজন্য বিপিনের খুশি হওয়ার কারণটা তার বোধগম্য হয় না।

চল, একটু বেড়িয়ে আসি আমরা নদীর ধার থেকে। বলিয়া বিপিন উঠিয়া দাঁড়ায়, সদানন্দের দিকে চাহিয়া বলে, আমরা যাই প্রভু?

সদানন্দ গম্ভীরভাবে বলে, যাও।

সেইদিন হইতে বিপিনের সঙ্গে কি ভাব মাধবীলতার! সদানন্দ স্পষ্ট বুঝিতে পারে, দুজনের মধ্যে কি যেন একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে, গড়িয়া উঠিয়াছে কেমন এক নূতন ধরনের। আত্মীয়তা। বিপিন শীত মানে না, গ্রীষ্ম মানে না, বর্ষা মানে না, বছরের সকল ঋতুতেই সে সমান ব্যস্ত, কাজে তার কখনো টিল পড়ে না। আমবাগানের গাছ কাটিয়া কুটির তুলিবার স্থানগুলি বর্ষা শেষ হইবার আগেই সাফ করিয়া ফেলিবে ঠিক করায়, তার কাজ বাড়িয়াছে। পূজার মধ্যে সমস্তগুলি কুটির তুলিয়া আশ্রমের নূতন অংশটিকে সে সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এত কাজের মধ্যেও বিপিন মাধবীলতার সঙ্গে গল্প করিবার সময় পায়, তাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে যাইবার সময় পায়, সে যাতে আশ্রমের ছোটখাটো কাজ করিয়া সময় কাটাইতে পারে, তার ব্যবস্থা করিয়া দিবার সুযোগ পায়।

সদানন্দের কাছে আসে মাধবীলতা, মাঝে মাঝে আসে। শান্ত শিশুর মতো চুপ করিয়া বসিয়া তার কথা শোনে, একটা অভিনব নম্রতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তার সঙ্গে আলাপ করে। আর সমস্তক্ষণ মুখখানা তার টস্ উস্ করিতে থাকে জীবনীশক্তির রসে। তবে চোখ দিয়া অন্য কিছু আজকাল আর টসটস করিয়া গড়াইয়া পড়ে না।

সন্তর্পণে একদিন সদানন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করে, বিপিনের সঙ্গে তোমার বেশ আলাপ হয়েছে, না?

বেশ লোক উনি। আমায় খুব স্নেহ করেন।

আশ্রমে থাকতে তোমার এখন ভালো লাগছে?

তা লাগছে। ভালো সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

কি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন?

এই-যাতে সময় কাটে, আশ্রমের কাজকর্ম করতে পাই, ঘুরে বেড়াতে পাই-

মাঝে মাঝে দুটি একটি প্রশ্ন করিয়া জবাবগুলি সদানন্দ গম্ভীরমুখে শুনিয়া যায়। একটা দিক ধীরে ধীরে তার কাছে পরিষ্কার হইয়া যায়। তার কাছ হইতে মাধবীলতাকে দেখাশোনা করার হুকুম পাইয়া এতদিন দেখাশোনার একেবারে চরম করিয়া ছাড়িয়াছিল উমা ও রত্নাবলী, সর্বদা চোখে চোখে রাখিয়া কি ভয়ানক আদর-যত্নটাই দুজনে যে করিয়াছিল তাকে! সে যেন শিশু, সে যেন ভঙ্গুর, সে যেন দুস্প্রাপ্য কিছু, সেবায়, স্নেহে, খাতিরে, শাসনে মাথায় করিয়া না রাখিলে চলিবে না। বিপিন তাকে মুক্তি দিয়াছে। একরকম কিছুই করে নাই বিপিন, উমা আর রত্নাবলীকে বলিয়া দিয়াছে মাধবীলতা যা করিতে চায় তাই যেন করিতে পায় আর মাধবীলতাকে দিয়াছে কয়েকটা দায়িত্ব। আশ্রমের একপ্রান্তে আছে গোয়ালঘর, সকালে বিকালে দুধ দোয়ার সময় সে হাজির থাকিবে, যে কুটিরে যতটা দুধ যাওয়ার কথা, বাটিয়া দিবে। আশ্রমের মেয়েরা দুজন দুজন করিয়া রান্না করে, মাধবী তাদের তরকারি কুটিয়া সাহায্য করবে, আর যদি কেউ অসুস্থ থাকে আশ্রমে, তার জন্য প্রস্তুত করিবে দরকারি পথ্য। এমনি সব ছোট ছোট কয়েকটা কাজ।

আপনি আমায় বলছিলেন না আশ্রমের উদ্দেশ্যের কথা, ভালো বুঝতে পারি নি। বিপিনবাবু ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

কি বলেছেন বিপিনবাবু?

কথা আর কথার ভঙ্গি মাধবীলতাকে একটু দমাইয়া দিল। সন্দিক্তভাবে বলিল, কিভাবে সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকা যায়, মানুষকে তাই বুঝিয়ে দেওয়া, ধর্মের মধ্যে যে বিকার এসেছে, সংশোধন করা, সমাজ-গঠনে-

হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি। জীবন, ধর্ম, সমাজ, দেশ, এই সবের জন্য বড় বড় কাজ করা আশ্রমের উদ্দেশ্য।

এভাবে বলছেন যে? তাই উদ্দেশ্য নয় আশ্রমের?

আহা, চোখ দুটি ছলছল করে মাধবীলতার। আঘাত পাইবে জানিয়া টসটস করিয়া জল ঝরানোর জন্য চোখ দুটিকে যেন প্রস্তুত করিয়া নিতেছে। হঠাৎ একটা তীব্র সন্দেহের স্পর্শে সদানন্দের মন হাত দিয়া আগুন হেঁয়ার মতো ছাৎ ছাৎ করিয়া ওঠে। মনে হয়, মাধবীলতা যেন ভান করিতেছে। বোকামির ভান, সরল বিশ্বাসের ভান, শব্দ সংজ্ঞাগুলির অর্থ না বুঝিয়াও তৎসংক্রান্ত চিরন্তন আদর্শবাদের যে অসংখ্য পূজারিণী আছে, সেও তাদেরই একজন-

অথবা তার নিজেরই ভুল? যেটা মাধবীর ভান মনে হইতেছে, মাধবী আসলে তাই, সে নিজেই মাধবীলতা সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে? মাধবী প্রশ্নভরা শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে বলিল, মোটামুটি তাই। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে আশ্রমের, এখানে কিছুদিন থাকলেই আস্তে আস্তে সেটা বুঝতে পারবে। আরেকদিন তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেব।

মাধবীর স্বস্তি ও কৃতজ্ঞতাবোধ অত্যন্ত স্পষ্ট। নিজের অস্বস্তি ও দুর্বোধ্য জ্বালাবোধ সদানন্দকে পীড়া দিতে থাকে। সে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ে। মাধবীলতা সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল সে, সে-ই করিয়া দিয়াছিল তার আশ্রমবাসের ব্যবস্থা। মাধবী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল মাধবীর, রাত্রে ঘুম হইতেছিল না। চোখের পলকে বিপিন তার জীবনকে সহজ ও সানন্দ করিয়া দিয়াছে। আশ্রমের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা কতবার সদানন্দ বলিয়াছে মাধবীকে, বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে

কাতর হইয়া পড়িয়াছে মাধবী। বিপিন দু কথায় সব তাকে বুঝাইয়া দিয়াছে, হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে মাধবী।

পা টিপে দেব?

সদানন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে মাধবীর ঔৎসুক্য মুছিয়া যায়, চোখ নামাইয়া জড়োসড়ো হইয়া সে। বসে। প্রথমে এখানে আসিয়া শেষরাত্রে সদানন্দের পিঠের সঙ্গে মিলিয়া যেভাবে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়াছিল, লজ্জায় সঙ্কোচে যেন তেমনি কুণ্ডলী পাকাইয়া যাইবে। কৈফিয়ত দেওয়ার মতো ভয়ে নিজে হইতে সে বলে, বিপিনবাবু বলছিলেন, আপনার একটু সেবা করতে। আপনি নাকি কারো সেবা যত্ন নেন না, বড় কষ্ট হয় আপনার।

না, পা টিপতে হবে না। বৃষ্টি আসছে, তুমি এবার যাও মাধবী।

আহত হইয়া মাধবী চলিয়া যায়। রাগে সদানন্দের গা জ্বালা করিতে থাকে। মাধবীকে এ কি করিয়া দিয়াছে বিপিন; নিজে আড়ালে থাকিয়া এ কি সম্পর্ক সে গড়িয়া তুলিতেছে তার আর মাধবীর মধ্যে? বিপিনের সঙ্গে কথা বলিবার সময় কত হাসে মাধবী, আশ্রমের জীবন নাকি তার হাল্কা হাসিখুশিতে ভরিয়া উঠিয়াছে, অজস্র কথা বলে, মনের আনন্দে চঞ্চলপদে ঘুরিয়া বেড়ায়, কাজের ফাঁকে ফাঁকে গুনগুন করিয়া গানও নাকি শোনা যায় তার সময় সময়। প্রথম প্রথম সদানন্দের কাছেও তো প্রায় এই রকমই ছিল মাধবী, আকস্মিক অবস্থা পরিবর্তনের ধাক্কায় একটু যা কেবল হইয়া পড়িয়াছিল কারু। এখন সামনে পড়িলে মনোভাবের সবগুলি উৎসমুখে সে তাড়াতাড়ি ছিপি আঁটিয়া দেয়, খোলা রাখে কেবল সভয় শ্রদ্ধাভক্তির উৎসটা, আর—

এইখানে একটু খটকা লাগে সদানন্দের। আর কি? আর কি উথলাইয়া পড়ে তার সান্নিধ্যগত মাধবীর সর্বাঙ্গীণ অস্তিত্ব হইতে? পরিণত নারীর সেবা ও স্নেহের সাধ? কিন্তু সেটা কেমন হয়। সেই সহজ ও সাধারণ সাধটা তাকে কেন্দ্র করিয়া মাধবীর মধ্যে যদি অস্বাভাবিকরকম জোরালো হইয়া উঠিয়াও থাকে, এইভাবে কি তা আত্মপ্রকাশ করে,

এমন দুর্বোধ্য ও রহস্যময় প্রণালীতে? সর্বদা যেন আত্মসচেতন মাধবী, সর্বদা সংযত গভীর দীনভাবে সর্বান্তে তার একটানা ছেদহীন রোমাঞ্চ।

বৃষ্টি নামি নামি করিয়া বহুক্ষণ আকাশে আটকাইয়াছিল। হয়তো শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি আজ নামিবেই না। একবার ডাকিয়া পাঠাইলে কেমন হয় মাধবীকে, একটু সেবা করিবার অনুমতি দিলে? কোমরে আঁচল জড়াইয়া হয়তো মাধবী কুটিরের মেঝে বাঁট দিতেছে-শাড়ি, সেমি এলোমেলো, চুল এলোমেলো, কথা এলোমেলো, হাসি এলোমেলো। ডাক পৌঁছিলে হাত ধুইয়া কোমরে বাধা আঁচল খুলিবে, চুলটা তাড়াতাড়ি ঠিক করিয়া লইবে, কথা ও হাসি দিবে বন্ধ করিয়া। তার সেই হিলতোলা জুতাটি পায়ে দিয়া এই উঠান পর্যন্ত আসিবে তাড়াতাড়ি-ঠকঠক শব্দ স্পষ্ট কানে আসিবে সদানন্দের। তারপর জুতা শাড়িটা এখানে ওখানে একটু টানিয়া, দুহাতে কপাল হইতে আলাগা চুল কয়েকটি শেষবারের মতো উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া বলিবে, ডাকছিলেন?

সদানন্দ উঠিয়া অন্তরে গেল। অন্তরে কেউ নাই। সদরে গিয়া দাঁড়াইতে চোখে পড়িল, কিছুদূরে ছোট ফুলের বাগানটিতে আশ্রমের কয়েকটি মেয়ে ফুল তুলিতেছে। তাদের একজন মাধবী। তাই তো বটে, বিশ-বাইশ বছর আগে একজনকে কোমরে আঁচল জড়াইয়া ঘর বাঁট দিতে দেখিয়াছিল বলিয়া মাধবীকেও যে ঘরই বাঁট দিতে হইবে তার কি মানে আছে!

সদানন্দকে চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মেয়েরা কাছে আসিল। অঞ্জলি ভরিয়া পায়ে ফুল ঢালিয়া প্রণাম করিল। নীরবে নির্বিকারভাবে প্রণাম গ্রহণ করিয়া সদানন্দ ভিতরে চলিয়া গেল। পায়ে ঢালিয়া দেওয়া ফুলগুলি কুড়াইয়া মেয়েরা আবার ফিরিয়া গেল ফুল তুলিতে।

পরদিন দুপুরবেলা সদানন্দ নিজেই ডাকিয়া পাঠাইল মাধবীলতাকে।

মাধবী ঘরে ঢুকিবামাত্র তার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল বুকে। মাধবী বিবর্ণমুখে কাঠ হইয়া রহিল, এটা বাধাও নয়, প্রতিবাদও নয়, সদানন্দও তা জানে। কিন্তু কল্পনা ও বাস্তবের

মধ্যে কি আকাশপাতাল পার্থক্য! হাতের বাঁধন আপনা হইতেই ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া গেল।

আমাকে তুমি ভয় কর মাধবী?

মাধবী অস্ফুটস্বরে বলিল, না।

মাথায় হাত বুলাইয়া সদানন্দ তাকে একটু আদর করিল, এ ছাড়া স্নেহ মমতা জানানোর শারীরিক প্রক্রিয়া আর কি আছে। একটু আদর করিয়াই বুক হইতে নামাইয়া দিল-মেয়েটার দম প্রায় আটকাইয়া আসিয়াছে।

কাল তোমায় বকেছিলাম বুঝি?

মাধবী পুনর্জীবিতার মতো অদ্ভুতভাবে হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ। কাল যে হঠাৎ কেন রেগে গেলেন-

রাগি নি-আমি কখনো রাগি না। তুমি আমার সেবা করতে চাও-কি সেবা করবে বল তো?

আপনি যা বলবেন।

পাকা চুল তুলে দেবে?

মাধবী হাসিল। পাকা চুল বাছিয়া দিবার সময় তার কোলে মাথা রাখিয়া সদানন্দ চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল সমস্তক্ষণ। মাধবী চলিয়া যাওয়ার পর মনে হইল, অসময়ে আজ যেন ঘুম আসিয়াছে। উঠিয়া জানালায় গিয়া দাঁড়াইল। রাধাই নদীর বুক আরো ভরিয়া উঠিয়াছে। কালের মতো আজো। নামি নামি করিয়া আকাশে আটকাইয়া রহিয়াছে বৃষ্টি। স্তিমিতদৃষ্টিতে বিকালের মতো সদানন্দ চাহিয়া থাকে। এত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সদানন্দের, এত তেজ ও সংযম, জীবনকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে কি তীক্ষ্ণ হইয়াছে তার বিচারবুদ্ধি, এখন যেন জানিবার বুঝিবার ক্ষমতাটুকুও আর নাই। অন্ধ আবেগের মতো, অমর

সংস্কারের মতো, কেবল একটা কথা মনে জাগিতেছে, তবে কি সত্যই দেবতা কেউ আছেন অন্তরালে, মানুষ যাকে সৃষ্টি করে নাই, পাপ পুণ্য যাচাইয়ের একটি করিয়া কষ্টিপাথর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দিয়া মানুষকে যিনি স্বাধীনতা দিয়াছেন কিন্তু বিচারের ক্ষমতাটা রাখিয়াছেন নিজের হাতে, অহরহ পাপ-পুণ্যের ওজন করিয়া মানুষকে যিনি শাস্তি আর পুরস্কার দিতেছেন? নয়তো মাধবীকে বাহুবন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া তার কেন মনে হইতেছে নিজে সে মুক্তি পাইয়াছে-একটা অদৃশ্য দানবের নিবিড় আলিঙ্গনের অকথ্য যন্ত্রণা হইতে?

সন্ধ্যার সময় আশ্রমের সকলকে আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের সম্পর্ক লইয়া উপদেশ দিবার কথা ছিল। সদানন্দ গেল না। পরদিন আশ্রমের সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল, সাতদিন গুরুদেব বিশেষ সাধনায় ব্যাপ্ত থাকিবেন, কেহ দর্শন পাইবে না।

বিপিন বলিল, মাঝে মাঝে তোর পাগলামি দেখে—

তুই আমার সর্বনাশ করবি বিপিন!

মাঝে মাঝে তোর পাগলামি দেখে—

## ৫. বাগবাদা গাঁয়ের মহেশ চৌধুরী

বাগবাদা গাঁয়ের সেই যে মহেশ চৌধুরী, যার ছেলে বিভূতি গিয়াছে আসল সরকারি জেলে, যার দুটি মেয়ে গিয়াছে শ্বশুরবাড়ি নামক নকল সামাজিক জেলে, যার উপর রাজা সায়েবের ভয়ানক রাগ, আশ্রমে যে একেবারেই আমল পায় না, সুযোগ পাইলেই সকলের সামনে যাকে অপদস্থ করিবার জন্য সদানন্দকে বিপিন বিশেষভাবে বলিয়া রাখিয়াছে, মানুষটা সে একটু খাপছাড়া কিন্তু তুচ্ছ নয়। তুচ্ছ নয় বলিয়াই অবশ্য তার উপর রাজা সায়েবের এত রাগ, আশ্রমে তাকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবার জন্য বিপিনের এত চেষ্টা। চারিদিকের অনেকগুলি গ্রামে মহেশ চৌধুরীর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি আছে, যেটা গড়িয়া তুলিবার জন্য কারো চেষ্টা করিতে হয় নাই, মহেশ চৌধুরীর জীবনযাপনের একনিষ্ঠ প্রক্রিয়া বহুকাল ধরিয়া তিলে তিলে যার জন্ম দিয়াছে। লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে, ভালবাসে। কিভাবে জানিয়াছে, কেন জানিয়াছে, জেরা করিলে কেহ বলিতে পারিবে না, কিন্তু সকলেই জানে, মনে মনে মহেশ চৌধুরী সকলের মঙ্গল কামনা করে, লোকটার ভক্তি ও নিষ্ঠা আন্তরিক, সকল সময় সকল বিষয়ে নির্ভয়ে নিশ্চিত মনে লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়। লোকটা বুদ্ধিমান কিন্তু চালাক নয়, ভিতরে বাহিরে মিল আছে লোকটার-দৈনন্দিন। জীবনের কারবারে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে অসংখ্য দেওয়া-নেওয়া চলে, তার মধ্যে মহেশ চৌধুরীর কাছে পাওনা গ্রহণ করিতে আশাভঙ্গের সম্ভাবনা নাই।

[লেখকের মন্তব্য : কোনো মানুষ সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা অসংখ্য ব্যক্তিগত ধারণার সমষ্টি, কিন্তু ধারণাগুলি নির্দিষ্ট পর্যায়ভুক্ত, সীমাবদ্ধ বৈচিত্র্যহীন। যার ব্যক্তিত্বের দুটি একটি বিশিষ্ট দিক মাত্র অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্থূলভাবে মানুষের কাছে আত্মপ্রকাশ করে, যার সম্বন্ধে মানুষ নিজের ধারণা কটির মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায়, নিজের মনে যতগুলি বিভিন্ন টাইপ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা মানুষের থাকে, তার মধ্যে কোনো একটি টাইপের সঙ্গে মানুষ যাকে মোটামুটি মিলাইয়া লইতে পারে, কেবল তারই ব্যক্তিত্বকে মানুষ স্বীকার করে। ব্যক্তিত্ব আসলে পরাশ্রয়ী, ব্যক্তিত্বের বিকাশে পরধর্মানুশীলনের প্রয়োজন,

এইজন্য জোরালো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের পক্ষে এটা ভয়াবহ বটে। যার ব্যক্তিত্বের প্রভাব যত বেশি, তাকে তত বেশি পরের ইচ্ছায় চলিতে হয়, নেতার চেয়েও সে পরাধীন। ব্যক্তিত্বকে প্রভাবশালী করিবার মূলমন্ত্র পরের মনে ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া সে ছোট, আমি বড়, তার যা কিছু আছে কম, আমার সে সব আছে অনেক বেশি। সুতরাং পরের ছোট-বড়, কম-বেশির সংস্কার ও ধারণা অনুসারে আমার ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত না হইলে সেটা নিছক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে পরিণত হয় মাত্র! এ পর্যন্ত মোট কথা, কোনো জটিলতা নাই। গোলমাল আরম্ভ হয় বিশ্লেষণ যখন সেই স্তরে পৌঁছায়, যেখানে ব্যক্তিত্বের সংগঠনে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন মামলাগুলি পৃথক করিতে হয়, সমগ্র প্রক্রিয়াটার পিছনে কতখানি ক্রিয়াশক্তি অচেতন ও কতখানি সচেতন তাও পৃথক করিতে হয়।

আমার এ সব কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই। সদানন্দ ও মহেশ চৌধুরীর ব্যক্তিত্বের একটি মৌলিক সামঞ্জস্যের কথা আমি সোজাসুজি আপনাদের বলিয়া দিতে চাই। সদানন্দ, বিপিন, মাধবীলতা, এদের ব্যক্তিত্বের যে সব দিক আমি ফুটাই তুলিতে চাহিয়াছি এবং চাই গল্পের মধ্যেই তা আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে। কিন্তু মহেশ চৌধুরী ও সদানন্দের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে সামঞ্জস্যটা আমি দেখাইতে চাই, গল্পের মধ্যে আপনা হইতে সেটা পরিস্ফুট করিয়া তোলা আমার সাধ্যাতীত। কারণ, দুজন মানুষকে কাছাকাছি টানিয়া আনিয়া অথবা দুজনের মধ্যে একটি মধ্যস্থ খাড়া করিয়া একজনের ব্যক্তিত্বরূপী সচেতন মননশক্তির সঙ্গে অপরজনের ব্যক্তিত্বরূপী অচেতন মননশক্তির পার্থক্য সহজেই স্পষ্ট করিয়া তোলা যায়, কিন্তু সামঞ্জস্য কোনো রকমেই দেখানো যায় না। যাই হোক, বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। কেবল বলিয়া দিই। মহেশ চৌধুরীর মধ্যে যে অচেতন মননশক্তি সকলের প্রীতি অর্জন করিয়াছে এবং সদানন্দের মধ্যে যে সচেতন মননশক্তি সকলের মধ্যে জাগাইয়াছে সভয় শ্রদ্ধা, মূলত তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই।

মহেশ চৌধুরী প্রত্যেকদিন আশ্রমে যাতায়াত করে, সাধারণত বিকালের দিকে। সকালেও মাঝে মাঝে আশ্রমে তার আবির্ভাব ঘটে, খুব ভোরে। রাত্রে সে ঘুমায় কিনা অনেকের সন্দেহ আছে, প্রাতঃভ্রমণে বাহির হয় একরকম শেষত্রে। ঠিহাতে চার মাইল পথ হাঁটিয়া

হাজির হয় আশ্রমে, আবছা আলো অন্ধকারে এদিকে খোজে, ওদিকে খোজে, রাত্রি শেষে কার সঙ্গে যেন খেলিতেছে লুকোচুরি খেলা, খেলার সাথীটি তার কুটিরের পিছনে, গাছের আড়ালে, ঝোপের মধ্যে কোথাও গা ঢাকা দিয়াছে। খুঁজিতে খুঁজিতে যায় নদীর ধারে। কোনোদিন হয়তো সদানন্দের সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। তৎক্ষণাৎ প্রণাম করিয়া মহেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সদানন্দ যদি প্রথমে কথা বলে তো বলে, নতুবা মহেশ চৌধুরী মুখ খোলে না।

কে, মহেশ?

আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু। বড় জ্বালা প্রভু মনে, বড় কষ্ট পেয়েছি সমস্ত রাত। তাই ভাবলাম ভোরবেলা প্রভুর চরণ দর্শন করে—

সদানন্দের ধারণা, জ্বালা তারও আছে। সে বলে, তোমায় না আশ্রমে অসিতে বারণ করে দিয়েছি?

না এসে পারি না প্রভু।

বটে? বেশ, বেশ। তোমার মতো আর দু-একটি ভক্ত জুটলেই আশ্রম ছেড়ে আমায় বনে-জঙ্গলে পালাতে হবে। তা তোমার আসল মতলবটা কি বল তো শুনি?

চরণে ঠাঁই চাই প্রভু-মনে শান্তি চাই।

পাগল? মাথা খারাপ মহেশ চৌধুরীর? এ রকম অন্ধ ভক্ত সদানন্দের আরো আছে, কিন্তু এমন নাছোড়বান্দা কেউই নাই। বাড়াবাড়ির জন্য ধমক দিলে, ভাবপ্রবণ ভক্ত সমিয়া যায়, মুখ হইয়া আসে কালো, ভক্তিও যেন উবিয়া যায় খানিকটা। কিন্তু মহেশ চৌধুরী কিছুতেই দমে না, কিছুতেই হাল ছাড়ে না। সদানন্দের অবজ্ঞা, অবহেলা, কড়া কথা, এ সবও যেন তার কাছে পরম উপভোগ্য। বড় রাগ হয় সদানন্দের—বড় আনন্দ হয়। মনে হয়, আসলে মহাপুরুষ সে কেবল এই একজন মানুষের কাছে, প্রায় দেবতার সমান। আর

সকলে তাকে ঠকায়, শুধু দাম দেয়, শুধু তার দাবি মেটায়। তারই বলিয়া দেওয়া মন্ত্রে পূজা করে তার। কিন্তু মহেশ চৌধুরী কিছু জানে না, কিছু মানে না, নিজের রচিত একটিমাত্র মন্ত্র বলিয়া সে পূজা করে-তুমি আমায় চাওবা না চাও দেবতা, আমি তোমায় চাই।

একটু ভয়ও করে সদানন্দের মহেশ চৌধুরীর কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে, তার সঙ্গে কথা বলিতে। বাস্তব অভিজ্ঞতার মালমসলায় জীবনের যে আদর্শ সে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে নিজের জন্য, সে আদর্শ অবাস্তব কল্পনা কিনা, অর্থহীন স্বপ্ন কিনা, আজো এ বিষয়ে সদানন্দের সন্দেহ মেটে নাই। যে আত্মপ্রত্যয়ের নিচে এ সন্দেহ চাপা থাকে, মহেশ চৌধুরীর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, চোখের দৃষ্টিতে, মুখের কথায় তা যেন উবিয়া যাইতে থাকে দেবতার সামনে পূজারীর মতো মহেশ চৌধুরী দাঁড়াইয়া থাকে, পোষা কুকুরের মতো তাকায়, স্তব করার মতত কথা বলে-তবু। মনে হয়, আর যত ভক্ত তার আছে, যাদের মধ্যে অনেকে মনে মনে তার সমালোচনাও করে কম। বেশি, তাদের ভুলাইতে কোনোদিন তার কষ্ট হইবে না, ভুলিবার জন্য শিশুর মতো তারা উদগ্রীব হইয়া আছে, কিন্তু এই অন্ধ ভক্তটিকে ভুলানোর ক্ষমতা তার নাই। মহেশ চৌধুরীর পূজা গ্রহণ করিলে বর দিবার সময় ফাঁকি চলিবে না, ভেজাল চলিবে না। অবাস্তব পাগলামির পুরস্কারকে করিয়া তুলিতে হইবে বাস্তব। কাব্যের জন্য কবিকে যেমন নারীকে দিতে হয় খাঁটি রক্তমাংসের দেহটি।

তোমার ছেলে ছাড়া পেয়েছে মহেশ?

আজ্ঞে না। ও কি আর ছাড়া পাবে!

এ্যাঁ? সে কি কথা-ছাড়া পাবে বৈকি, দুদিন পরেই ছাড়া পাবে। ভেবো না।

এই কি বাস্তব পুরস্কারের নমুনা? ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুটি মিষ্টি কথা বলা, একটু অনিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া, হিসাব করিলে যার দাম কানাকড়িও হয় না, কিন্তু মহেশ চৌধুরীর কাছে যা অমূল্য?

কোনোদিন সদানন্দ কথা না বলিয়া পাশ কাটিয়া চলিয়া যায়, মহেশ চৌধুরী ঠায় দাঁড়াইয়া যতক্ষণ দেখা যায় তাকে দেখে, তারপর আবার আপন মনে তপোবনে ঘুরিয়া বেড়ায় আর সদানন্দের সম্মুখে পড়ে না। এখানে সে অনাহৃত, অবাঞ্ছিত, আগন্তুক, বিপিনের শাসনে আশ্রমের কেউ তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না, মাঝে মাঝে রীতিমতো অপমানও জোটে, তবু মোহাচ্ছনের মতো সে আশ্রমের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, ধীরে ধীরে আশ্রমের জাগরণ লক্ষ্য করে।

সদানন্দের অজ্ঞাতবাসের খবরটা মহেশ চৌধুরী পাইল সাতুনার শ্রীধরের বাড়িতে। বাগবাদায় নিজের বাড়ি হইতে আশ্রমে যাওয়ার পথে শ্রীধরের বাড়ি পড়ে, মহেশ চৌধুরী এখানে কিছুক্ষণ বসিয়া যায়। বিশ্রামও হয়, জানাশোনা অনেকের সঙ্গে কথা বলাও হয়, অনেকের খবর পাওয়া যায়। আজ শ্রীধরের সদরের বড় ঘরটার দাওয়ায় তোক জুটিয়াছে অনেক। যারা অপরাহ্নে যাইবে ভাবিয়াছিল, সদানন্দ সাতদিন দর্শন দিবে না শুনিয়া তাদের মধ্যে অনেকেই শ্রীধরের এখানে আসিয়া জুটিয়াছে। শ্রীধর একটি নূতন বই সংগ্রহ করিয়াছে কোথা হইতে, কামরূপের এক রোমাঞ্চকর প্রামাণ্য উপন্যাস। কাল চারটি পরিচ্ছেদ পাঠ করা হইয়াছিল, আজ সকলে আসিয়া জুটিলেই বাকি অংশটুকু পড়া আরম্ভ হইতে পারিবে।

মহেশ চৌধুরী বলিল, কেউ দর্শন পাবে না?

শ্রীধর বলিল, বিপিনবাবু তাই বললেন চৌধুরী মশাই। প্রকৃত ভক্ত ছাড়া কেউ দর্শন পাবে না-প্রভুর জন্য যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে, জীবন বিসর্জন দিতে পারে, কেবল সেই দর্শন পাবে।

প্রভুর জন্য তোমরা সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পার না, জীবন বিসর্জন দিতে পার না শ্রীধর?

উৎসুক দৃষ্টিতে মহেশ চৌধুরী সকলের মুখের দিকে চাহিতে থাকে, সকলে স্বস্তিবোধ করে, চোখ নামাইয়া নেয়। বৃদ্ধ শ্রীধরের স্তিমিত চোখ দুটি বোধহয় তামাকের ধোঁয়াতেই বুজিয়া যায়।

আমি প্রভুর চরণদর্শন করতে যাব শ্রীধর।

সকলে স্তব্ধ হইয়া থাকে। অহংকারের কথা নয়, মহেশ চৌধুরীর অহংকার আছে কিনা সন্দেহ। সকলে তা জানে। কিন্তু একটা কথা প্রায় সকলের মনেই খচখচ করিয়া বিধিতে থাকে, কঠিন একটা সমস্যা। সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, জীবন বিসর্জন দিতে পারে, এত বড় ভক্তই যদি মহেশ চৌধুরী হয়, সদানন্দ তাকে আমল দেয় না কেন, কেন তাকে শিষ্য করে না? এই সমস্যা আজ বহুদিন সকলকে পীড়া দিতেছে, এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে তারা অনেক আলোচনা করিয়াছে, মনে মনে অনেক মাথা ঘামাইয়াছে। কারো মনে এ সন্দেহও জাগিয়াছে যে, মানুষটা মহেশ চৌধুরী কি আসলে তবে ভালো নয়, তার নীতি, ধর্ম, ভক্তি, নিষ্ঠা সব লোকদেখানো ভালোমানুষি?

মহেশ চৌধুরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে, যাই, একবার ঘুরে আসি আশ্রম থেকে।

কয়েকজন কৌতূহলভরে তার সঙ্গ নিলে সে তাদের ফিরাইয়া দেয়, বলে, না, আজ আর তোমাদের গিয়ে কাজ নেই ভাই। প্রভু যখন বারণ করে দিয়েছেন, মিছি মিছি গোলমাল না করাই ভালো।

আশ্রমে গিয়া মহেশ চৌধুরী যাকে সামনে পাইল তাকেই প্রভুর চরণদর্শনের জন্য ব্যাকুলভাবে আবেদন জানাইতে লাগিল। কেউ জবাব দিল, কেউ দিল না। তখন মহেশ চৌধুরী গিয়া ধরিল বিপিনকে।

বিপিন বলিল, সাতদিন পরে আসবেন।

মহেশ চৌধুরী মিনতি করিয়া বলিল, আপনি একবার প্রভুকে গিয়া বলুন, প্রভুর জন্য আমি সর্বস্ব ত্যাগ করব, জীবন বিসর্জন দেব। আপনি বললেই প্রভু আমায় ডেকে পাঠাবেন।

বিপিন রাগিয়া বলিল, কে আপনাকে সর্বস্ব ত্যাগ করতে, জীবন বিসর্জন দিতে সেধেছে। মশায়? কেন আসেন আপনি আশ্রমে? যান, যান, বেরিয়ে যান আমার আশ্রম থেকে।

কিছুক্ষণ পঁড়াইয়া থাকিয়া মহেশ চৌধুরী ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিয়া গেল। ফিরিয়া আসিল শেষ রাত্রে।

সদানন্দের সদরের কুটিরের সামনে কদমগাছটার তলায় বসিয়া পড়িল। কুটিরের আড়াল হইতে সূর্য উঠিলেন মাথার উপরে, তারপর আকাশ ঢাকিয়া মেঘ করিয়া আসিয়া ঘণ্টাখানেক বৃষ্টি হইয়া গেল, তারপর আবার কড়া রোদ ঢালিতে ঢালিতে সূর্য আড়াল হইলেন অন্য একটি কুটিরের আড়ালে, গাছতলা হইতে মহেশ নড়িল না। রোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া খাওয়া ছাড়িয়া কি তপস্যা করিতে বসিয়াছে গাছতলায়? এত জায়গা থাকিতে এখানে তপস্যা করিতে বসা কেন? আশ্রমের সকলে সমুখ দিয়া যাওয়ার সময়ে বিস্ময় ও কৌতূহলভরা দৃষ্টিতে তাকে দেখিতে থাকে তাকে দেখিবার জন্য কেউ আসে না বটে, কিন্তু এদিক দিয়া যাতায়াত করার প্রয়োজন আজ যেন সকলের বাড়িয়া যায়।

বেলা বাড়িতে তিন চার বার মহেশ চৌধুরীর বাড়ি হইতে লোক আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। বর্ষণের আগে আসিয়াছিল কেবল চাকর, গোমস্তা। বর্ষণের পরে আসিল মহেশের ভাগ্নে শশধর। গাছতলায় মাটিতে উপবিষ্ট মামার জলে-ভেজা মূর্তি দেখিয়া বেচারী কাঁদিয়া ফেলে আর কি! কিন্তু সেও মহেশের তপস্যা ভঙ্গ করিতে পারিল না। তবে দেখা গেল ছেলেটার বুদ্ধি আছে। নিজে হার মানিয়া সে ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু বিকালবেলা হাজির হইল একেবারে মামিকে সঙ্গে করিয়া।

ভাগ্নে কেবল কাঁদিয়া ফেলার উপক্রম করিয়াছিল, স্বামীর অবস্থা দেখিয়া স্ত্রী কাঁদিয়াই আকুল। কেন তার মরণ হয় না? যার স্বামী পাগল, ছেলে পাগল, সে কেন সংসারে বাঁচিয়া থাকে নিত্য নতুন যন্ত্রণা সহ্য করিতে? কাঁদিতে কাঁদতে হাতের বালা দিয়া বিভূতির মা

কপালে আঘাত করিল। রক্ত বাহির হইল একটু ডান চোখের জলের ধারাটা লাল হইয়া গেল।

মহেশ চৌধুরী কাতরভাবে বলিল, শোন, শোন, আহা এমন করছ কেন? বাড়ি ফিরে যাও, আমি ঠিক সময়ে যাব।

খোলা জায়গায় ফাঁকা গাছতলায় এমন নাটকের অভিনয় চলিতে থাকিলে দর্শকের সমাগম হইতে দেরি হয় না। একে একে আশ্রমের প্রায় সকলেই আসিয়া হাজির হয়, এলোমেলোভাবে চারিদিকে দাঁড়াইয়া দুজনকে দেখিতে থাকে, পুরুষেরা ব্যাপারটা অনেকটা হাল্কাভাবেই গ্রহণ করে, মেয়েদের মধ্যে দেখা দেয় চাপা উত্তেজনার চাঞ্চল্য, অনেকে ছোট্ট হাঁ করিয়া চোখ বড় বড় করিয়া চাহিয়া থাকে, শেষবেলার আলোয় দাঁত করে ঝকঝক, চোখ করে চকচক। আশ্রমে দাঁত মাজার নিয়ম বড় কড়া, দাঁতে ময়লা থাকিলে সদানন্দ রাগ করে, মেয়েদের দাঁত তাই সত্যি ঝকঝক করে কারো বেশি। রত্নাবলীর দাঁতগুলি বোধহয় সকলের চেয়ে বেশি সুন্দর, আর বেশি। ঝকঝকে, চোখও তার বড় আর টানা। তবু গাছতলার ব্যাপার দেখিতে দেখিতে গায়ের আঁচল টানিয়া টানিয়া সে দুহাতে পুঁটলি করিতে থাকে, তারপর রক্তপাত ঘটামাত্র আঁচলসমেত হাত দিয়া চাপা দেয় নিজের মুখ। কাদে কিনা বলা যায় না, কিন্তু সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাপে। কী কুৎসিত যে দেখায় তার পরিপুষ্ট অঙ্গের অনাবৃত অংশের ঢেউতোলা কাঁপুনি! শশধর অভিভূত হইয়া থাকে। মাধবীলতা তাড়াতাড়ি মহেশ চৌধুরীর স্ত্রীর কাছে গিয়া আঁচল দিয়া তার কপালের রক্ত মুছিয়া দেয়।

তারপর আবির্ভাব ঘটে বিপিনের। রাগ করিয়া লাভ নাই, সে তাই রাগ করে না, আশ্চর্য হইবার ভান করিয়া বলে, আপনি যান নি এখনো?

মহেশ চৌধুরী বলে, আজ্ঞে না। আপনাকে তো বলেছি, একবার প্রভুর চরণ দর্শন করতে না দিলে আমি উঠব না।

তা হলে সাতদিন আপনাকে এখানে থাকতে হবে।

তাই থাকব।

বিপিন একটু হাসিল, আপনার ভক্তিটা কিন্তু বড় খাপছাড়া চৌধুরী মশায়। প্রভুর আদেশ অমান্য করতে আপনার বাঁধবে না, প্রভুর চরণদর্শনের জন্য আপনি ব্যাকুল।

মহেশ চৌধুরী নিশ্চিতভাবে বলিলেন, ও আদেশ আমার জন্য নয়।

মাধবীলতা বলিল, না, সত্যি, উনি জানিয়েছেন, সাতদিন কেউ দর্শন পাবে না। সাতদিন উনি একমনে সাধনা করবেন কিনা।

আমি আড়াল থেকে একবার দর্শন করেই চলে আসব।

তা কি হয়?

সন্ধ্যা হইল, রাত্রি বাড়িতে লাগিল, মহেশ চৌধুরী গাছতলার মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিল। নিরীহ, শান্ত, ভীৰু মানুষটা যে আসলে এমন একগুঁয়ে, সদানন্দ ছাড়া এতকাল আর কে তা জানিত। তাকে কিছু খাওয়ানোর চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া গেল। মাধবীলতা আর রত্নাবলী কোনোরকমে তার স্ত্রীকে একটু দুধ খাওয়াইয়া শশধরকে ডাকিয়া নিয়া গেল আশ্রমের রাত্রির আহাৰ্যের ব্যবস্থায় ভাগ বসাইতে। রাত্রে আশ্রমে রান্না হয় না, কিন্তু পেট ভরাইতে শশধরের অসুবিধা হইল না-দুধ, ছানা, মিষ্টি, ফলমূল এ সবার অভাব নাই। খাওয়ার পর সে আসিয়া আবার মামা-মামির কাছে বসিয়া রহিল গাছতলায়। রাত্রি দশটা পর্যন্ত আশ্রমের দু-এক জনকে সেখানে দেখা গেল, তারপর একজনও রহিল না। রাত্রি দশটার পর কারো কুটিরের বাহিরে থাকা বারণ বিপিন ও সদানন্দ ছাড়া।

রাত প্রায় এগারটার কাছাকাছি গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিও নামিল, ছাতি-মাথায় বিপিনও হাজির হইল গাছতলায়। দাতে ব্যর্থ হওয়ায় বিপিন গলা, মুখ, চোয়াল, কান, সমস্ত ঢাকিয়া সযত্নে কম্বলটার জড়াইয়াছে। ঠাণ্ডা লাগিলে তার দাঁতের ব্যথা বাড়ে। মুখের ঢাকা একটু সরাইয়া সে বলিল, আপনারা দাওয়ায় উঠে বসবেন, যান। মাদুর আর বালিশ দিচ্ছি।

মহেশ চৌধুরী স্ত্রীকে বলিলেন, যাও না দাওয়ায়, যাও না তোমরা? বৃষ্টিতে ভিজে যে মারা পড়বে তুমি! যাও, দাওয়ায় যাও।

বিভূতির মা বলিল, আর তুমি?

এক কথা এক শ বার কেন বলছ? বললাম না প্রভুকে দর্শন করতে না দিলে আমি উঠব না এখান থেকে? তুমি এখানে বসে থেকে কি করবে, তাতে লাভটা কি হবে শুনি?

তুমি এখান থেকে না উঠলে আমিও উঠব না।

সন্ধ্যা হইতে এ বিষয়ে দুজনের মধ্যে অনেক তর্ক, রাগারাগি হইয়া গিয়াছে, মহেশ চৌধুরী আর কিছু বলিল না, কেবল শশধরকে হুকুম দিল দাওয়ায় গিয়া বসিতে। শশধর দাওয়াতে গেল, বিপিন মাদুর আর বালিশ আনিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ মাদুর বিছাইয়া শুইয়াও পড়িল। আফসোস করিয়া বলিল, বর্ষাকালে এ কি ঠাণ্ডা মশায়, এ্যাঁ? এ কি শালার শীতকাল নাকি?

বিপিনের সহানুভূতি জাগিবার লক্ষণ নাই দেখিয়া গলা নামাইয়া আবার বলিল, বৌটা এসেছে কাল ছমাস বাপের বাড়ি ছিল। কি গরমটা কাল রাতে, তা বৌ বলে কিনা বাবু, বাদলার দিন ঠাণ্ডা লাগবে।-বলে-

আপনি বাড়ি ফিরে যান না?

শশধর উঠিয়া বলিল-আমিঃ মামি কাল বাড়ি ফিরেই কি করবে জানেন? কানটি ধরে বলবে, বেরো বাড়ি থেকে। কেবল আমাকে নয় মশায়, নিজের জন্য কি আমি ভাবি-বৌটাকে সুদ্ধ। গায়ে দেবার দিতে পারেন কিছু কাপড়চোপড় যা হোক?

বিপিন একটা চাদর আনিয়া দিল। কিন্তু বাদল রাতে সদানন্দের সদর দাওয়ায় চাদর মুড়ি দিয়া আরাম করিবার অদৃষ্ট বেচারির ছিল না। বিভূতির মা ডাকিয়া বলিল, ও শশী, ভদ্রলোকের

কাছ থেকে ছাতিটা চেয়ে রাখ, আর জিজ্ঞেস কর আরো যদি ছাতি থাকে একটা

একটা কেন, আরো তিনটা ছাতি ছিল, সবগুলি আনিয়া দাওয়ায় শশধরের কাছে ফেলিয়া বিপিন ভিতরে চলিয়া গেল। দাঁতের অসহ্য যন্ত্রণায় তার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করিতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল মাটিতে গুইয়া হাত-পা ছুড়িতে থাকে, আর চিৎকার করিয়া কদে।

ছাতি নিয়া শশধর গাছতলায় গেল, একটি ছাতি খুলিয়া দিল মামির হাতে, আরেকটি ছাতি খুলিয়া মহেশ চৌধুরীকে দিতে গেলে সে বলিল না, আমার ছাতি চাই না।

স্ত্রী বলিল, কেন? এখানে ধনে দিয়েছ, না খেয়ে বসে থাকবে, তা না হয় বুঝলাম বিষ্টি যখন পড়ছে, ছাতিটা মাথায় দিতে দোষ কি?

মহেশ চৌধুরী বলিল-নিজে থেকে আমি করব না।

তখন মহেশ চৌধুরীর স্ত্রী আবার এমনভাবে নিজের মরণের জন্য আফসোস আরম্ভ করিল যে, মনে হইল, আবার বুঝি আজ অপরাত্নের মতো বালার আঘাতে নিজের কপাল কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া ছাড়িবে। কিন্তু খানিক আফসোস করিয়া নিজের ছাতিটা বন্ধ করিয়া শশধরকে ফেরত দিল, বলিল, যা তুই, দাওয়ায় শো গে যা শশী।

শশধর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, থাক, আমি বসে বসে ভিজি এখানে, আমিই বা বাদ যাব কেন।

তারপর মিনিট দুই সব চুপচাপ। এ অবস্থায় গাছের পাতায় বাতাসের মৃদু শো শো শব্দ আর গাছের পাতা হইতে জল ঝরিবার ক্ষীণ জলো জলো আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ কানে শোনাও পাপ। মনে অবশ্য অনেক কথা টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে এবং সেগুলি স্মৃতিও নয়।

সারাটা জীবন আমায় তুমি জ্বালিয়ে খেলে, আমার শনিগ্রহ তুমি। আমার সব ব্যাপারে তোমার বাহাদুরি করা চাই, হাঙ্গামা বাধানো চাই। যদি শান্তি পাবার জন্যে গাছতলায় ধন্বা দিয়ে পড়ে থাকি, তোমার কি তাতে, কেন তুমি এসে আমার মন বিগড়ে দেবে, কে ডেকেছিল তোমায়? স্বামীভক্তি দেখানো হচ্ছে স্বামীর একটা কথা শুনবে না, স্বামীভক্তি দেখাতে গাছতলায় এসে ভেজা চাই। কি অদ্ভুত সতী রে আমার! স্বামীর শান্তি নষ্ট করে সতীত্ব ফলানো।

বৃষ্টি আর বাতাস দুয়েরই বেগ বাড়িতে থাকে। মহেশ চৌধুরীর রাগ আর জ্বালাবোধ কিন্তু না বাড়িয়া এই সামান্য ভসনার মধ্যেই একেবারে ক্ষয় হইয়া যায়। আরো অনেকক্ষণ জের টানিতে পারিত, বলিতে পারিত আরো অনেক কথা, কিন্তু কিছুই না বলিয়া একেবারে চুপ হইয়া গেল। অন্ধকারে এত কাছাকাছি বসিয়াও কেহ কারো মুখ দেখিতে পাইতেছে না। গাঢ় অন্ধকারে শুধু একটি আলোর বিন্দু চোখে পড়ে। কিছুদূরের একটি কুটিরে কে যেন একটি আলো জ্বালিয়া জানালা খুলিয়া রাখিয়াছে। জাগিয়া আছে না ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মানুষটা কে জানে! এত রাত্রে চোখে ঘুম নাই, এমন শান্তিহীন অভাগা কে আছে সাধু সদানন্দের আশ্রমে? সদানন্দের যে শিষ্য, সদানন্দের আশ্রমের কুটিরে যে বাস করিবার অধিকার পায়, জীবনের সব জ্বালাপোড়ার ছোঁয়াচ তো সঙ্গে সঙ্গে তার মন হইতে মুছিয়া যাইবে, সন্ধ্যার সঙ্গে শিশুর মতো দুচোখ ভারি হইয়া আসিবে শিশুর চোখের ঘুমে? আলোর বিন্দুটি নিভিয়া গেলে মহেশ চৌধুরী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। তাই বটে। কোনো দরকারে কেউ আলো জ্বালিয়া রাখিয়াছিল-ঘুম আসিতেছিল না বলিয়া নয়। দুই হাত। জড় করিয়া মহেশ চৌধুরী মনে মনে সদানন্দের চরণে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করে। হে মহেশ চৌধুরীর জীবন্ত দেবতা, মহেশ চৌধুরীর কল্যাণের জন্যই তুমি তাকে অবহেলা করিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখ, দুঃখের আগুনে পুড়িয়া মহেশ চৌধুরীর মন যেদিন নির্মল হইবে, সেইদিন পায়ে ঠাঁই দিয়া। মহেশ চৌধুরীর সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া তাকে তুমি শান্তি দিবে, এ কথা জানিতে কি বাকি আছে মহেশ চৌধুরীর? এই ধৈর্যের পরীক্ষায় শিষ্য না করিয়া শিষ্যের মতোই তাকে যে প্রকারান্তরে আত্মশুদ্ধির কঠোর সাধনায় নিযুক্ত করিয়াছ, সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য মহেশ চৌধুরী জীবন দিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু আজ এই

বিপদে তুমি তাকে রক্ষা কর। তুমি কি দেখিতে পাইছে না। প্রভু মহেশ চৌধুরীকে বাড়িতে ফিরাইয়া নেওয়ার জন্য, মহেশ চৌধুরীর সাধনা ব্যর্থ করার জন্য। একজন কি অন্যায় আবদার আরম্ভ করিয়াছে। রাতদুপুরে গাছতলায় সম্মুখে বসিয়া নীরবে বৃষ্টির জলে ভিজিতেছেঃ স্ত্রী বলিয়া নয়, ছেলের মা বলিয়া নয়, একজন স্ত্রীলোকের এত কষ্ট চোখে দেখিয়া স্থির থাকার মতো মনের জোর যে মহেশ চৌধুরীর নাই প্রভু।

সদানন্দ অবশ্য তখন ঘুমাইতেছিল। আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। কিন্তু জানা থাকিলেও মহেশ চৌধুরীর কিছু আসিয়া যাইত না। পাথরের দেবতার কাছেও মানুষ প্রার্থনা জানায় ঘুমন্ত মানুষ তো জীবন্ত। নয় কি?

পরদিন চারিদিকে খবর ছড়াইয়া গেল, মহেশ চৌধুরী সস্ত্রীক সাধুবাবার আশ্রমে ধনা দিয়াছে। চারিদিক হইতে নরনারী দেখিবার জন্য আসিয়া জড়ো হইতে লাগিল সদানন্দের আশ্রমে আসিয়া তারা আজ মহেশ চৌধুরীর দর্শনপ্রার্থী।

শেষরাত্রে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সকালবেলা ভিজা পৃথিবীতে সোনালি রোদ উঠিয়াছে। মহেশ চৌধুরী ও তার স্ত্রী দুজনের গায়ে রোদ পড়িয়া দেখাইতেছে যেন মূর্তি-ধরা বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতা, কিন্তু অপার্থিব জ্যোতি দিয়া আবৃত। দুজনের গায়ে আবরণের মতো পড়িবে বলিয়া রোদের রংটা আজ বেশি গাঢ় হইয়াছে নাকি?

রত্নাবলী ও উমা আসিয়াছিল সকলের আগে, রোদ উঠিবারও আগে। রত্নাবলী চোখ বড় করিয়া বলিয়াছিল-সমস্ত রাত এখানে ছিলেন?

মহেশ চৌধুরী বলিয়াছিল, থাকবার জন্যেই তো এসেছি মা।

মহেশ চৌধুরীর কথা বলিবার ধরন পর্যন্ত এক রাত্রে বদলাইয়া গিয়াছে।

মারা পড়বেন যে আপনারা?

মহেশ চৌধুরী করুণ চোখে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। দেবতা কি প্রার্থনা শুনবেন, এই বিপদে তাকে পথ দেখাইয়া দিবেন না?

কাল শেষরাত্রির দিকে কতবার যে তার মনে হইয়াছে সব শেষ করিয়া দিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া কোনো একটি আশ্রমে চলিয়া যায়। মনে হইয়াছে, এমনভাবে একজনকে কষ্ট দিবার কোনো অধিকার তার নাই, সে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেই বা এ জগতে কার কি আসিয়া যাইবে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেই বা কার কি আসিয়া যাইবে, সব কি তার নিজেরই বিকৃত অহংকারের কথা নয়? সাধুজীর চরণদর্শন না করিয়া উঠিবে না বলিয়া গাছতলায় ধন্বা দিয়াছে, চরণদর্শন হইবার আগে উঠিয়া গেলে লোকের কাছে একটু নিন্দা হইবে, লোকে বলিবে মহেশ চৌধুরীর মনের জোর নাই। নিজের কাছে নিজের দামটাও একটু কমিয়া যাইবে বটে, মনে হইবে বটে যে, আমি কি অপদার্থ, ছি! কিন্তু নিজের কথা ভাবিয়া আরেকজনকে যন্ত্রণা দিলে, মারিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা ঘটাইলে, তাতে কি নিজের অপদার্থতা আরো বেশি প্রমাণ হইয়া যাইবে না, নিজের মধ্যে অশান্তি বাড়িয়া যাইবে না?

রোদ উঠিবার পর আসিল মাধবীলতা। কে জানে কেন, এ আশ্রমে কোনো ব্যাপারে সকলের চেয়ে মাধবীলতার সাহসটাই সবচেয়ে বেশি হইতে দেখা যায়। বোধহয় কোনো কোনো ব্যাপারে

সে সকলের চেয়ে ভীৰু বলিয়া।

আসিয়াই মহেশকে সে দিতে আরম্ভ করিল বকুনি। বলিল, মাথা খারাপ হয়ে থাকে, অন্য কোথাও গিয়ে পাগলামি করুন না? আমরা আপনার কাছে কি অপরাধ করেছি?

অপরাধ? অপরাধের কথা কি হল মা?

মহেশ চৌধুরী হাত জোড় করিল।

তফাতে শতাধিক নরনারী ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মাধবীলতার মুখের রং যেন রোদের সঙ্গে মিশ খাইয়া যাইবে।

তবে আমাদের এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন? এটা তো হাট নয়, আশ্রম তত এটা? দেখুন তো-চেয়ে কি লোক জমতে শুরু করেছে। এর মধ্যে আশ্রমের কাজ চলে কি করে, আমরাই বা থাকি কি করে? একটু শান্তি পাবে বলে যারা আশ্রমে আসে, সাহস মাধবীলতার একটুও কমে নাই, তবে আবেগটা বাড়িতে বাড়িতে একটু অতিরিক্ত হইয়া পড়ায় গলাটা রুদ্ধ হইয়া গেল।

মহেশ চৌধুরী বলিল, তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে মা? আচ্ছা আমি ওদের যেতে বলছি।

যেতে গরজ পড়েছে ওদের।

কিন্তু তারা গেল। মহেশ চৌধুরী ঘুরিয়া বসিয়া সকলকে চলিয়া যাইতে অনুরোধ জানাইল, বলিল যে, এই গাছতলায় তার মরণ হইবে, এটা যদি তারা না চায়, তবে যে যার বাড়ি ফিরিয়া যাক। ভঙ্গি দেখিয়া প্রথমে মাধবীলতার মনে হইয়াছিল, মহেশ চৌধুরী বুঝি লম্বা বক্তৃতা দিবে, কিন্তু একটু অনুযোগ দিয়া ও নিজের মরণের ভয় দেখাইয়া কয়েকটি কথায় সে বক্তব্য শেষ করিয়া দিল এবং এমনভাবে কথাগুলি বলিল, যেন শ্রোতারা সকলেই তার শুভাকাজক্ষী আত্মীয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সকলে আশ্রমের সীমানা পার হইয়া চলিয়া গেল। বাড়ি সকলে গেল না, আশ্রমের কাছেই খবরের লোভে ঘোরাফেরা করিতে লাগিল, কিন্তু গাছের জন্য আশ্রমের ভিতর হইতে তাদের আর দেখা গেল না, মাঝে মাঝে দু-একজন করিয়া আশ্রমের ভিতরে ঢুকিয়া মহেশকে দেখিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, আশ্রমের মধ্যে আর ভিড় হইল না।

বিপিন ভিতর হইতে ব্যাপারটা লক্ষ করিতেছিল। দাঁতের ব্যথা এখনো তার সম্পূর্ণ কমে নাই, কিন্তু হয় রোদ উঠিয়াছে বলিয়া অথবা ব্যাপারটা দেখিয়া উত্তেজনা হইয়াছে বলিয়া, মাথায় জড়ানো সমস্ত কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া সে চুপ করিয়া বিছানায় বসিয়া রহিল।

মাধবীলতা একটা পাক দিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনি কি চান?

প্রভুর চরণদর্শন করতে চাই।

শুনিয়া মাধবীলতা আবার পাক দিয়া আসিতে গেল।

বেলা বাড়িতে থাকে, ভিজা জামা ও কাদামাথা পরনের কাপড় ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া যায়, গুমোট হয় দারুণ। মহেশ একসময় স্ত্রীকে বলে, আচ্ছা এবার তো তুমি ফিরে যেতে পার?

বিভূতির মার চোখ জবাফুলের মতো লাল হইয়াছে, চোখের পাতা বুজিয়া বুজিয়া আসিতেছে। শুধু মাথা নাড়িল।

মহেশ চৌধুরী খানিকক্ষণ গুম খাইয়া থাকিয়া বলিল, চল, আমিও যাচ্ছি।

শুনিয়া বিভূতির মার লাল চোখে পলক পড়া বন্ধ হইয়া গেল-সাধুজীর চরণদর্শন না করেই যাবে?

কি করব? নারীহত্যার পাতক তো করতে পারি না।-জ্বর এসেছে না তোমার?

হয়তো আসিয়াছে জ্বর, হয়তো আসে নাই, সেটা আর এখন বড় কথা নয়, বিভূতির মা এখন আর বাড়ি ফিরিয়া যাইতে চায় না। এখানে বসিবার সময় বলিয়াছিল বটে যে স্বামী লইয়া ফিরিয়া যাইবে কিন্তু এখন আর সদানন্দের চরণদর্শনের আগে সেটা করিতে চায় না। স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে ভয়ে? ভয় সেটাই বটে কিন্তু মহেশ যা ভাবিতেছে তা নয়, স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে ভাবনায় তো বিভূতির মার ঘুম আসিতেছে না। এখন বড় ভয় এই যে, এত কাণ্ডের পর তার পাগল স্বামী সদানন্দের দর্শনলাভ না করিয়াই বাড়ি ফিরিয়া গেলে, তার সঙ্গে সে ঘর করিবে কি করিয়া? সেই তিলে তিলে দিনের পর দিন দন্ধানোর চেয়ে এইখানেই একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাক।

যুক্তিটা যে খুবই জোরালো, তাদের সম্পর্কের হিসাব ধরিলে প্রায় অকাট্য, মনে মনে মহেশ তা অস্বীকার করিতে পারিল না কিন্তু অনাহারে অনিদ্রায় রোদে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া গাছতলায় বসিয়া বসিয়া দিবারাত্রি কাটানোর পর যুক্তিতে বেশি কিছু আসিয়া যায় না। পরের কাছে বিনয়ে কাদা হইয়া হাত জোড় করা যায় কিন্তু নিজের লোকের অবাধ্যতায় গা জুলিয়া যায়। মহেশ চৌধুরীর দাতে দাঁত ঘষিবার প্রক্রিয়াটা কাছে দাঁড়াইয়া কেউ লক্ষ করিলে চমকাইয়া যাইত।

তুমি থাক তবে আমি ফিরে চললাম।

যাও।

আমি চলে গেলেও তুমি একা বসে থাকবে?

কি করব না বসে? এখন গেলেই চিরকাল তুমি আমায় দুষবে, বলবে আমার জন্য তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলে।

তোমায় দুষব?

দুষবে না?

খানিকক্ষণ হতভম্বর মতো স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মহেশ চৌধুরী বলিল, আমি নিজেই যখন চলে যাচ্ছি, তোমায় দুষব কেন?

এবার বিভূতির মা যেন একটু রাগ করিয়াই বলিল, দ্যাখ, তোমার সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক নয়, ওসব মারপ্যাচ আমাদের মধ্যে চলবে না রাস্তার লোককে ওসব বলে বুঝিও। নিজেই চলে যে যাচ্ছ তুমি, কার জন্য যাচ্ছ শুনি? বাড়ি গিয়ে যে ছটফট করবে, সেটা তলে তলে দন্ধাবে কাকে শুনি? তোমায় চিনতে তো আমার বাকি নেই। তুমি হলে ... তুমি হলে ... মাথা নত করিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

কেঁদ না বলিয়া মহেশ চৌধুরী বিহুলের মতো বসিয়া রহিল। এ জগতে কোনো প্রশ্নেরই কি শেষ নাই? মানুষ বিচার করিবে কি দিয়া? খুজিলেই সত্যের খুঁত বাহির হয় নিজে খোঁজ বন্ধ। করিয়া দিলেও রেহাই নাই, প্রতিনিধি যদি খোজে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির হিসাবে তাতেও খুঁত বাহির হওয়া আটকায় না। নিজে যা হোক কিছু ঠিক করিয়া নিতে পারিলেই অন্যে তা মানিবে কেন, অন্যেও যাহোক কিছু ঠিক করিয়া নিতে গিয়া নূতন কিছু আবিষ্কার করিবেই। সুতরাং এখন কর্তব্য কি? যা ভালো মনে হয় তাই করা?

কি করা ভালো?

হে মহেশ চৌধুরীর জীবন্ত দেবতা—

না, দেবতার কাছে আবদার চলিবে না। দেবতার কি জানে মহেশ চৌধুরী? দেবতা ও তার সম্পর্কের মধ্যে কোনটা মারপ্যাচ আর কোনটা মারপ্যাচ নয়, তা কি সে নিঃসন্দেহে জানিতে পারিয়াছে, যেমন জানিতে পারিয়াছে স্বামী নামক দেবতা সম্বন্ধে তারই সম্মুখে উপবিষ্টা তারই এই স্ত্রীটি? এরকম না জানিলেই বা কর্তব্যনির্ণয় চলিবে কেন? মহেশ চৌধুরীর ক্লেশ বোধ হয়। দেবতাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে কিন্তু দেবতার সঙ্গে নিজের সংযোগটা কেমন, সে সম্বন্ধে নিজের পরিষ্কার ধারণা নাই, এ কেমন আত্মসমর্পণ? চোখ-কান বুজিয়া বিচার-বিবেচনা না করিয়া নিজেকে দিলেই কি আত্মসমর্পণ হয়? কোনো প্রত্যাশা না থাকিলেই? তবে সদানন্দের জন্যও কেন নিঃসন্দেহ হইতে পারে না যে যা ঠিক করিয়াছে তাই ঠিক? তার সম্বন্ধে কর্তব্যনির্ণয় করিতে তার স্ত্রীর কেন একবারও দ্বিধা করিতে হয় না, ভুল করিবার ভয়ে ব্যাকুল হইতে হয় না? মহেশ চৌধুরী কি তবে স্ত্রীলোকেরও অধম? অথবা?

একটা প্রশ্ন যেন মনের তলায় কোনখানে উঁকি দিতে থাকে, মহেশ চৌধুরী ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কেমন একটা রহস্যময় দুর্বোধ্য অনুভূতি হইতে থাকে। আসল কথা, বিভূতির মার শেষ কথাগুলিতে সে একেবারে চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল, সকল বিষয়ের মূল্যনির্ণয়ের অভ্যস্ত মানসিক প্রক্রিয়াটা একেবারে গোড়া ধরিয়া নাড়া খাইয়াছিল। সমস্ত

চিন্তার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল মনে। হইতেছিল, এ কথাটা তো মিথ্যা নয়, ওর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, এ জগতে আর কারো সঙ্গে তো তা নেই, কোনোরকম মারপ্যাচ ওর সঙ্গে আমার তো চলতে পারে না! কি আশ্চর্য!

তারপর মাধবীলতা এক সময়ে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, চলুন আপনারা সাধুজীর চরণদর্শন করবেন।

মহেশ যেন বিশেষ অবাক হইল না, কৃতার্থও বোধ করিল না। সহজভাবে কেবল বলিল, অনুমতি দিয়াছেন?

এ কথার জবাবে মাধবী বলিল, প্রণাম করেই চলে আসবেন কিন্তু কথাবার্তা বলে জ্বালাতন করবেন না।

আমরা দুজনেই যাব তো?

হ্যাঁ, আসুন।

কিন্তু বিভূতির মা স্বামীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে, সদানন্দের চরণদর্শন করিতে আসে নাই, সে উঠিল না। বলিল, আমি এখান থেকেই মনে মনে প্রণাম জানাচ্ছি, তুমি যাও, প্রণাম করে এস।

একা যাইতে মহেশের ভালো মন সরিতেছিল না; একসঙ্গে এত দুর্ভোগ সহ্য করিবার পর সাফল্যটা ভোগ করিবে একা? একটু অনুরোধ করিল, বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিল যে, এমন। একটা অনুগ্রহ পাইয়া কি হেলায় হারাইতে আছে? কিন্তু বিভূতির মা কিছুই বুঝিল না। তখন মাধবীলতার সঙ্গে মহেশকে একাই ভিতরে যাইতে হইল। কাপড়ে কাদা লাগিয়াছিল, এখন শুকাইয়া পাপড়ের মতো শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহেশ একবার ভাবিল কাপড়টা বদলাইয়া সদানন্দের সামনে যায়, তারপর আবার ভাবিল, থাক, হাঙ্গামায় কাজ নাই। সদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা বিপিনের বদলে মাধবীলতার মধ্যস্থতায়

হইতেছে কেন এ কথাও মহেশের। মনে হইতেছিল। ভাবিল, তার কাছে নিজে নত হইতে বিপিনের হয়তো লজ্জা করিতেছিল, তাই মেয়েটাকে দূতী করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু সদানন্দের অভ্যর্থনা এ ধারণা তার মন হইতে বলপূর্বক দূর করিয়া দিল। রাগে আগুন হইয়া সদানন্দ বলিল, এর মানে? আমি না বারণ করে দিয়েছি, সাত দিন কেউ আমার দর্শন পাবে না?

সদানন্দ নদীর দিকে জানালার কাছে পাতা চৌকিতে বসিয়াছিল, সেইখান হইতে কুদ্র চোখে। চাহিয়া রহিল। মহেশ তখন ঘরের চৌকাঠ পার হইয়াছে, সেইখানে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মাধবীলতা তাড়াতাড়ি চৌকির কাছে আগাইয়া গেল। নিচু গলায় ফিসফিস করিয়া বলিল, আপনার পায়ে ধরছি, রাগ করবেন না। অনেক ব্যাপার হয়ে গেছে, আমি সমস্ত বলছি আপনাকে। আপনি শুধু এই ভদ্রলোককে একবার প্রণাম করে চলে যেতে দিন। বলিয়া মুখ আরো তুলিয়া

সদানন্দের চোখে চোখে চাহিয়া মিনতি করিয়া বলিল, দেবেন না?

সদানন্দ বলিল, আচ্ছা।

আসুন, প্রণাম করে যান।

মহেশ নড়ে না দেখিয়া সদানন্দও ডাকিয়া বলিল, এস মহেশ।

মহেশ অবাধ্য শিশুর মতো মাথা নাড়িয়া বলিল, না প্রভু, আপনি আমায় ডাকেন নি, এই মেয়েটি আমায় ফাঁকি দিয়ে এনেছে। না জেনে আপনার কাছে আমি এ কি অপরাধ করলাম প্রভু! আপনি ডাকেন নি জানলে তো আমি আসতাম না।

সদানন্দ শান্তভাবে বলিল, তাই নাকি? তা, এখন কি করবে?

আমি ফিরে যাচ্ছি প্রভু। আপনি নিজে ডাকলে এসে প্রণাম করে যাব।

মাধবীর মুখখানা পাংশু হইয়া গিয়াছিল, সে ভীতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আবার গাছতলায় গিয়ে ধন্বা দেবেন? মরে যাবেন যে আপনারা দুজনেই?

মুখের চেয়ে মাধবীর চোখের পরিবর্তন ঘটিতেছিল বিচিত্রতর, এবার চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিয়া পড়িল। কত ভাবিয়া কত হিসাব করিয়া নিজের দায়িত্বে এত বড় একটা কাজ করতে গিয়া বুকটা ভয়ে ও উত্তেজনায় টিপটিপ করিতেছিল, সদানন্দ দেবতা না দানব মাধবীর জানা নাই কিন্তু এমন ভয় সে করে সদানন্দকে যে, কাছে আসিলেই তার দেহ-মন কেমন একসঙ্গে আড়ষ্ট হইয়া যায়, সদানন্দ তাকে বুক তুলিয়া লইলেও যে জন্য সে নূতন কিছুই আর অনুভব করিতে পারে না, অনায়াসে সদানন্দের মুখের দিকে প্যাট প্যাট করিয়া চাহিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সে তো গা এলাইয়া দেওয়ার কথা, কোনো হাঙ্গামাই তাতে নাই। এতকাল নিজের ও সদানন্দের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যা কিছু ঘটিয়াছে, তাতে তার নিজের কিছুই করিবার বা বলিবার থাকে নাই, সদানন্দই সমস্ত করিয়াছে ও বলিয়াছে। আজ প্রথম নিজেকে মানুষটার নিষেধ অমান্য করিতে সক্রিয় করিয়া তুলিয়া ভিতরটা তার আবেগে ফাটিয়া পড়িতেছিল। তাই তার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করিয়া মহেশ আবার গাছতলায় ধন্বা দিতে যাইবে, এই আশাভঙ্গের সুযোগ অবলম্বন করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। তার উদ্দেশ্যটা যথারীতি সফল হইলে, সদানন্দকে প্রণাম করিয়া মহেশ বাড়ি ফিরিয়া গেলে, অন্য কোনো উপলক্ষে সে অবশ্য কাঁদিত। উপলক্ষ না পাইলে বিনা উপলক্ষেই

কাঁদিত।

সদানন্দ অপলক চোখে মাধবীলতার চোখে জল ভরিয়া উপচিয়া পড়ার প্রক্রিয়াটা দেখিতেছিল। এ দৃশ্য সে আগেও দেখিয়াছে, মাধবীর চোখ তখন তার চোখের আরো কাছে ছিল। তবু এমন স্পষ্টভাবে আর কোনোদিন কি মাধবীর চোখের কান্না দেখিয়াছে ইতিপূর্বে?

একটু ভাবিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে সদানন্দ বলিল, মহেশ, আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলাম?

পরীক্ষা প্রভু?

হ্যাঁ পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। আমি সব জানি মহেশ, তুমি আসবার এক মুহূর্ত আগে আমি আসন ছেড়ে উঠেছি। দরজা বন্ধ ছিল, তুমি আসবে বলে দরজা খুলে রেখেছি। তোমায় দেখে রাগের ভান করছিলাম, আমায় না জানিয়ে কেউ কি আমার কাছে আসতে পারে মহেশ? এখন বাড়ি যাও, কদিন বিশ্রাম করে আমার সঙ্গে এসে দেখা কোরো। দেখি, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারি কিনা।

শুনতে শুনতে টলিতে টলিতে মহেশ চৌধুরী কোনোরকমে খাড়া ছিল, সদানন্দের কথা শেষ হইলে প্রণাম করিবার জন্য আগাইতে গিয়া দড়াম করিয়া পড়িয়া গেল।

সুতরাং বিভূতির মাকেও শেষ পর্যন্ত ভিতরে আসিয়া সদানন্দের চরণদর্শন করিতে হইল, শশধরও আসিল। বিপিন আসিয়া চুপ করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল, একবার শুধু সে চোখ তুলিয়া চাহিল সদানন্দের দিকে, তারপর আর মনে হইল না যে আশপাশে কি ঘটিতেছে, এ বিষয়ে তার চেতনা আছে।

আধঘণ্টা পরে মহেশ চৌধুরীকে একটু সুস্থ করিয়া এবং একটু গরম দুধ খাওয়াইয়া শশধর। ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। বাইরে দেখা গেল বিরাট কাণ্ড হইয়া আছে-শদুই নরনারী সেই কদমগাছটার তলে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া। শ্রীধরকেও তাহাদের মধ্যে দেখা গেল।

মহেশকে দেখিয়া জনতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল-মহেশ চৌধুরীকি জয়।

জনতার মধ্যে একজনও অবাঙালি আছে কিনা সন্দেহ, মহেশ চৌধুরীও যে খুঁটি বাঙালি সন্তান। তাও কারো অজানা নাই, তবু জয়ধ্বনিতে মহেশ চৌধুরীর নামের সঙ্গে কোথা হইতে যে একটি কি যুক্ত হইয়া গেল।

তারপর কয়েকজন যুবক মহেশ চৌধুরীকে কাঁধে চাপাইয়া গ্রামের দিকে রওনা হইয়া গেল। কাঁধে চাপাইল একরকম জোর করিয়াই, মহেশ চৌধুরীর বারণও শুনিল না, বিভূতির মার ব্যাকুল মিনতিও কানে তুলিল না।

যতক্ষণ দেখা গেল, আশ্রমের সকলেই একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তারপর ছোট ছোট দলে আরম্ভ হইল আলোচনা। বিপিন সদানন্দের কুটিরের সামনে দাঁড়াইয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ করিয়াছিল, শোভাযাত্রা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেলে কাহারো সঙ্গে একটি কথা না বলিয়া সে সটান গিয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল। সে যেন হার মানিয়াছে, হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, অথবা দাঁতের ব্যথায় আবার কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

মাধবীলতা সদানন্দের ঘরে ফিরিয়া গেল। তাহার ব্যাখ্যা ও কৈফিয়ত বাকি আছে। সদানন্দ সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিল, এস মাধবী।

কোথায় আসিবে মাধবী? কাছে? পাঁচ-সাত হাত তফাত হইতে এমনভাবে ডাকিলে তাই অর্থ হয়। মহেশ চৌধুরী খানিক আগে টলিতে টলিতে সদানন্দের দিকে আগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, মাধবীলতা কাঁপিতে কাঁপিতে পায়ে পায়ে আগাইতে লাগিল, মহেশ চৌধুরীর মতো দড়াম করিয়া পড়িয়াও গেল না। কিন্তু কাছে যাওয়ারও তো একটা সীমা আছে? তাই হাতখানেক ব্যবধান থাকিতে মাধবীলতা থামিয়া পড়িল।

সদানন্দ হাত ধরিয়া তাকে পাশে বসাইয়া দিল। চিবুক ধরিয়া মুখখানা উঁচু করিয়া বলিল, মাধবী, তুমি তো কম দুই মেয়ে নও!

ওঁর স্ত্রী যে মরে যাচ্ছিলেন।

তাহলে অবশ্য তুমি লক্ষ্মী মেয়ে। সদানন্দ একমুখ হাসিল।

মাধবীলতা থামিয়া থামিয়া সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা সদানন্দকে জানাইয়া দিল, নিজের কাজের কৈফিয়তে বলিল যে, সদানন্দ পাছে রাজি না হয় এই ভয়ে একেবারে মহেশ চৌধুরীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিল।

বলিয়া মাধবী হঠাৎ দাবি করিয়া বসিল সদানন্দের কৈফিয়ত, কাদ কাঁদ হইয়া বিনা ভূমিকায় সে প্রশ্ন করিয়া বসিল, কিন্তু আপনি ও কথা বললেন কেন মহেশবাবুকে?

আমি তো জানতাম না মাধবী এত কাণ্ড হয়ে গেছে। তুমি ডেকে এনেছ জানলে কি আর আমি রেগে উঠতাম?

না, তা নয়। আপনি মিছে কথা বললেন কেন? কেন বললেন আপনি সব জানতেন, ওকে পরীক্ষা করছেন?

সদানন্দ বিব্রত হইয়া বলিলেন, ওটা কি জান মাধবী-

কিন্তু মাধবী ওসব কথা কানে তোলে? আকুল হইয়া সে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল আর বলিতে লাগিল, কেন আপনি মিছে কথা বললেন। কেন বললেন!

## ৬. আকাশের মেঘ কাটিয়া গিয়া রোদ উঠিল

আকাশের মেঘ কাটিয়া গিয়া রোদ উঠিল, বিপিনের দাঁতের ব্যথা কমিয়া গেল, কিন্তু তার মুখের ব্যথিত ভাবটা যেন ক্ষুদ্র বিষাদের মেকী ইম্পাতে গড়া মুখোশের মতো হইয়া রহিল কায়েমি। রাগ হইলে বীররসের মধ্যে সেটা প্রকাশ করা বিপিনের অভ্যাস নয়। সদানন্দের মতো যারা তার খুব বেশি অন্তরঙ্গ, তাদের কাছে কদাচিৎ তাকে রাগ করিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু সেও যেন কেমন এক খাপছাড়া ধরনের রাগ। রাগ বলিয়াই মনে হয় না। মনে হয়, ঠোঁট বাকাইয়া, মুখের চামড়া এখানে ওখানে কুঞ্চিত করিয়া, বাঁকা চোখে চাহিবার একটা আশ্চর্য কৌশল সে কোনো এক সময় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, আয়ত্ত রাখার জন্য রাগ করার সুযোগে প্র্যাকটিস করিতেছে। এবার বিপিনের মুখ দেখিয়া সদানন্দও বুঝিতে পারিল সে রাগ করিয়াছে, কিন্তু আগেকার রাগ করার ভঙ্গির সঙ্গে একেবারে মিল না থাকায় ভাবনায় পড়িয়া গেল।

তোর কি হয়েছে রে বিপিন?

কিস্সু না! হবে আবার কি?

বিপিনের কি হইয়াছে বোঝা গেল না, কিন্তু জবাবটা বোঝা গেল। বিপিন নিজেই জানে না তার কি হইয়াছে। এ রকম ব্যাপার সকলের জীবনে সর্বদাই ঘটিতেছে, নিজের কিছু একটা হয়। কিন্তু নিজের কাছে সেটা দুর্বোধ্য থাকে, এমন কিছু গুরুতর ঘটনা এটা নয়, সদানন্দ তা জানে। তবে নিজের কি হইয়াছে বুঝিবার চেষ্টাটা প্রচণ্ড অধ্যবসায়ে দাঁড়াইয়া গেলে তখন বিপদ, অধ্যবসায়টাই সাংঘাতিক গুরুত্ব পাইয়া বসে। এবং মাঝে মাঝে কম বেশি সময়ের জন্য এ রকম অধ্যবসায় মানুষের আসে বৈকি। বিপিনের কি তাই হইয়াছে?

কি ভাবছিস ভাই?

ভাই? সদানন্দের সম্বোধনে বিপিনের তো রীতিমতো চমক লাগেই, মনে হয় যে সে বুঝি তাকে গাল দিয়া বসিয়াছে। এমন সম্পর্ক তো তাদের নয় যে এমন গভীর স্নেহাট সুরে ভাই বলিতে হইবে, এতখানি আবেগময় আন্তরিকতার সঙ্গে পরস্পরকে জানিয়া বুঝিয়া তাদের বন্ধুত্ব, পরস্পরের কাছে উলঙ্গ হইয়া দাঁড়াইতে যেমন তাদের লজ্জা করে না, মনের দুর্বলতা আর বিকৃতি মেলিয়া ধরিতেও তেমনি ভয় বা সঙ্কোচ হয় না, অন্তত কিছুকাল আগে তাই ছিল। এভাবে দরদ দেখানো তাদের মধ্যে চলিবে কেন? কি হইয়াছে সদানন্দের আজ, সাতদিন ঘরের কোণে কাটাইবার পর? বিপিন সন্দিক্ধ দৃষ্টিতে তাকায়, সে দৃষ্টির বিশ্লেষণপটুতা অসাধারণ। বিপিন উসখুস করে, সেটা তার শারীরিক অস্বস্তিবোধের চরম প্রমাণ।

তখন দুপুরবেলা, ঘণ্টা দুই আগে দুজনেরই মধ্যাহ্নভোজন হইয়াছে। অনেক ভাবিয়া, অনেক দ্বিধা করিয়া, মনকে শান্ত করিবার জন্য সাতদিন ঘরের কোণে নিজেকে বন্দি করিয়া রাখিয়া মনকে আরো বেশি অশান্ত করিয়া, অতিরিক্ত জ্বালাবোধের জন্যই মাধবীলতা সম্পর্কে অত্যাশ্চর্য আত্মসংযমের মধ্যে নিজেকে সত্য সত্যই মহাপুরুষ করিয়া ফেলিবার চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। আজ সকালে হঠাৎ মাধবীলতাকে আজই রাত্রে ঘরে আনিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া বসিয়াছে। কে জানিত মাধবীলতাকে এমনভাবে সে নিমন্ত্রণ করিয়া বসিবে? সকালে নদীর ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে চোখে পড়িল স্নানরতা রত্নাবলী আর উমাকে, তাই মাধবীলতাকে খুঁজিতে সে জোরে জোরে হটিতে আরম্ভ করিল আশ্রমের দিকে। মাধবীলতাকে দেখা গেল এক আমগাছের তলে। আশ্রমে যে গোয়ালা দুধ যোগায়, তার বৌয়ের সঙ্গে গল্প করিতেছে। গোয়ালা বৌয়ের কঁথের শিশুটি প্রাণপণে স্তন চুষিতেছিল, দুধের কারবার করে বটে, গোয়ালা-বৌ নিজের বুকে যে তার সন্তানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দুধ জন্মে না, দেখিলেই সেটা বোঝা যায়।

সদানন্দকে দেখিয়া গোয়ালা-বৌ সরিয়া গিয়াছিল।

রাত্রে একবার আমার ঘরে আসবে, মাধু?

আদেশ নয়, অনুরোধ। মাধবীলতা নয়, মাধবী নয়, মাধু। পরে দুপুরবেলা বিপিনকে ভাই বলার ভূমিকার মতো।

রাত্রে? কখন?

যখন তোমার সুবিধা হয়।

সন্ধ্যাবেলা?

না, একটু রাত করে এস। এই এগারটা সাড়ে এগারটার সময়। অনুরোধ নয়, আদেশ। এতক্ষণে মাধবীলতা বুঝিতে পারিয়াছিল, আহ্নানটা খাঁটি অভিসারের, ধর্ষণের ফলে প্রেমের জন্ম হওয়ায় এতদিন যে পূর্বরাগের পালা চলিতেছিল, আজ তার সমাধি।

আজ নয়, পরশু যাব। একটা হাত বাড়াইয়া মাধবী আমগাছের গুঁড়িতে স্থাপন করিয়াছিল, যেখানে ছিল পিপড়াদের সারি বাঁধিয়া যাতায়াতের পথ।

না, আজ।

আদেশ নয়, প্রায় ধমক।

আজ নয়, পরশু।

মিনতি নয়, মৃদু কোমল নিরুপায় বিদ্রোহ।

সদানন্দ তখন অন্ধ আর বোকা হইয়া গিয়াছে কিনা, তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া পাঁচ বছরের প্রিয়াকে লজেঞ্জসের লোভ দেখানোর মতো কোমলকণ্ঠে বলিয়াছিল, তুমি কিছু বোঝ না মাধু। আজ ত্রয়োদশী, মেঘটেঘ না করলে চমৎকার জ্যোৎস্না উঠবে, জ্যোৎস্নায় বসে তোমার সঙ্গে গল্প করব। এস কিন্তু।

পরশু কি জ্যোৎস্না উঠবে না? পরশু কি জ্যোৎস্নায় বসিয়া গল্প করা চলিবে না? কিন্তু প্রতিবাদের যতটুকু শক্তি মাধবীর ছিল, এতক্ষণে প্রায় সবটুকুই শেষ হইয়া গিয়াছে। এবার যদি সদানন্দ রাগিয়া যায়? দুঃশাসন জানিয়াও যা বোঝে নাই, সদানন্দ কি না জানিয়া তা বুঝিবে! ত; মাধবী অন্যভাবে চেষ্টা করিয়াছিল।

উমা, শশী, কুন্দ, ওরা টের পাবে যে? একটা কেলেক্কারি হবে।

আমি সে ব্যবস্থা করব।

সদানন্দ নিজেই যখন ব্যবস্থা করিবে তখন আর কার কি বলিবার থাকিতে পারে? একটিবার। পশ্চিমে উঠিবার সাধ যদি সূর্যের থাকে, একমাত্র সদানন্দের হুকুমের সুযোগেই সাধটা মিটাইবার সম্ভাবনা কি তার সবচেয়ে বেশি নয়?

এইজন্য সদানন্দ আজ পেট ভরিয়া খাইতে পারে নাই। আহারে রুচি ছিল না। এখন। সদানন্দের তাই ক্ষুধা পাইয়াছে। এদিকে দাঁতের ব্যথা না থাকায় কদিন প্রায় উপবাস করিয়া থাকিবার শোধ তুলিবার জন্যই বোধহয় বিপিন এত বেশি খাইয়াছিল যে, এখন অম্বলে বুক। জ্বলিতেছে। নিজেকে বিপিনের বড়ই ভেতা মনে হইতেছিল। সদানন্দের আদরের জবাবে সে তাই বলিল ভাবছি তোর মাথা।

তারপর ঘরে আসিল মাধবী। ঘরে ঢুকিয়াই বিপিনকে সদানন্দের সঙ্গে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

সদানন্দ বলিল, কি মাধবী?

কিছু না, এমনি এসেছিলাম। বলিয়া বোকার মতো একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া মাধবী প্রায় চলিয়া যায়, সদানন্দ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তার কাছে গেল।

-শোন মাধু, শোন।

কাছে গিয়া গলা নামাইয়া বলিল, কিছু বলবে? চল, বাইরে যাই।

দুজনে ঘরের বাইরে চলিয়া গেল, বিপিন ঘাড় বাকাইয়া বঁকা চোখে চাহিয়া রহিল খোলা দরজার দিকে।

মাধবীলতা বাহিরে আসিয়া মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কথা বলে না।

সদানন্দ চিবুক ধরিয়া তার মুখখানা উঁচু করিয়া ধরে। এটা সদানন্দের যেন অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

কি বলবে বল?

কি আর বলিবে মাধবী, সেই পুরাতন কথা আবার খানিকটা সাহস সঞ্চয় করিয়া আজ রাত্রির অভিসার পিছাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছে।

সদানন্দ জোর করিয়া মাধবীর মুখ উঁচু করিয়া রাখিয়াছিল, হঠাৎ হাত সরাইয়া দেওয়ায় মাধবীর চিবুক প্রায় কণ্ঠার সঙ্গে যুকিয়া গেল। কিন্তু সদানন্দের মন সত্যিই একটা চিন্তার সঙ্গে ঠোঁকর খাইয়াছে। কেন যে হঠাৎ সদানন্দের মনে হইল বড় পাকা মেয়ে মাধবীলতা, বড় ঝানু, প্রায় বাজারের বেশ্যার মতো। দেহটা যে বেশি-পাকা আমের মতো কোমল আর রঙিন মাধবীর, আদর করিয়া তাহার দেহে হাত বুলানোর সময় আঙুলগুলির যে পাখির পালকের মতো কোমল হইয়া যাওয়া উচিত, সদানন্দ তা জানে। কিন্তু মাধবীর ভিতরটা শুধু শক্ত নয়, পাথর। বোটা-ছেড়া ফলের মতো বছরের পর বছর ধরিয়া শুকাইয়া কুঁকড়াইয়া যাইতে পারিলে যেমন হইতে পারে, সেইরকম শক্ত, এই ধরনের একটা চিন্তা মনে আসায় সদানন্দের কাছে মাধবীর দেহটা পর্যন্ত রংচটা কাঠের খেলনার মতো কুৎসিত হইয়া গেল।

কিন্তু—

কথাটা মনে হইল মাধবীকে বিদায় দিয়া ঘরের মধ্যে বিপিনের কাছে চৌকিতে গিয়া বসিবার পর। আশ্রমে যে আসিয়াছিল কুমারী মাধবী? তাই তো?

ঠিক এই সময় সদানন্দ আর বিপিনের মধ্যে একটু কলহ হইয়া গেল। কত কলহ-বিবাদই আজ পর্যন্ত দুজনের মধ্যে হইয়াছে, কি তীব্র ঝঝ সে সব ঝগড়ার, মনে হইয়াছে জীবনে বুঝি আর দুজনের মধ্যে মিল হইবে না, কেহ কাহারো মুখ পর্যন্ত দর্শন করিবে না। কিন্তু কখন আবার বিনা ভূমিকায় দুজনে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে নিজেদেরই তাদের খেয়াল থাকে নাই। আজিকার কলহটা একেবারেই সে রকম হইল না। দুজন পুরুষের মধ্যে, বিশেষত বিপিন আর সদানন্দের মতো দুজন পুরুষ বন্ধুর মধ্যে এত মৃদু, এতখানি ভদ্রতাসম্মত কলহ হইতে পারে, এতদিন কে তা ভাবিতে পারিত।

বিপিন বলিল, ওটাকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করছিস সদা।

সদানন্দ বলিল, তুই তো সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি দেখি।

বিপিন বলিল, ওকে আশ্রমে এনেছি আমি।

সদানন্দ বলিল, তাই বলে ওর ওপরে তোর অধিকার জন্মেছে নাকি?

বিপিন বলিল, অধিকারের কথা নয়। ওর ভালোমন্দের একটা দায়িত্ব তো আমার আছে।

সদানন্দ বলিল, অঃ ভালোমন্দের দায়িত্ব।

তারপর বিপিন চলিয়া গেল নিজের ঘরে, সদানন্দ বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল নদী। এ কি কলহ? এ তো নিছক কথোপকথন, অলস মধ্যাহ্নের স্বাভাবিক আলাপ। কিন্তু নিজের ঘরে বসিয়া বিপিনের উপর সদানন্দের আর সদানন্দের উপর বিপিনের রাগে গা যেন জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। একজন আরেকজনের কত অন্যায়, কত অবিচার, কত স্বার্থপরতা আজ পর্যন্ত সহিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আর সত্যিই সহ্য হয় না, একেবারে যেন পাইয়া বসিয়াছে।

সে দিন রাতে সত্যই জ্যোৎস্না উঠিল। আকাশে একেবারে যে মেঘ রহিল না তা নয়, বর্ষাকালের আকাশ তো। কিন্তু ছাড়া ছাড়া মেঘ আকাশে ভাসিয়া বেড়াইলেই তো জ্যোত্স্নার শোভা বাড়ে, অনেক দিনের বিশ্বাস এটা। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর বিপিন বাহির হইয়া পড়িল, ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল আশ্রমের এক কুটির হইতে অন্য কুটিরে। যে কোনো সময় আশ্রম পরিদর্শনের অধিকার বিপিনের আছে। রাত্রির অসংখ্য বিচিত্র শব্দ আছে, কত তুচ্ছ অদৃশ্য প্রাণী শুধু শব্দের মধ্যে প্রাণের পরিচয় ঘোষণা করিয়া চলে, তবু দিনের চেয়ে রাত্রিতে স্তব্ধতা গভীরতর। দিবারাত্রি আশ্রমকে ঘিরিয়া যে নিবিড় শান্তি বিরাজ করে, বাহিরের তপ্ত মানুষকে যা কুড়াইয়া দেয় চোখের নিমেষে, রাতে যেন সেই শান্তির ভাব আরো বেশি অপার্থিব হইয়া ওঠে। চোখ জুড়াইয়া যায় বিপিনের চারিদিকে চোখ বুলাইয়া, মন ভরিয়া যায় মন-জুড়ানো আনন্দে, কোনো কোনো রাতে নিজেকে ভুলিয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য স্বপ্ন পর্যন্ত যেন সে দেখিতে আরম্ভ করিয়া দেয়-অবাস্তব, অর্থহীন, কোমল, মধুর স্বপ্ন আদর্শের যে অবাধ্য, অপরিত্যাজ্য লেজুড়কে বিপিন ঘূণাই করে চিরদিন।

আজ স্বপ্ন দেখা দূরে থাক, একটু গর্ব পর্যন্ত অনুভব করি না। নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া আশ্রমের ছড়ানো কুটির আর রহস্যময় ছায়ালোকবাসী নির্বাক নিশ্চল দৈত্যের মতো ছোট-বড় গাছগুলি দেখিয়া গভীর ক্ষোভের সঙ্গে তার শুধু মনে হইল কি অকৃতজ্ঞ সদানন্দ, কি স্বার্থপর সদানন্দ, কি বিশ্বাসঘাতক সদানন্দ। নিজে রাজ্য সৃষ্টি করিয়া নিজেকে বিসর্জন দিয়া সদানন্দকে রাজা করিয়াছে যে, আজ সদানন্দ তাকেই হীন মতলববাজ মানুষ মনে করিয়া তুচ্ছ করে। অন্যমনে বিপিন এক কুটিরের অধিবাসীদের সঙ্গে দুটি-একটি কথা বলিয়া অন্য কুটিরে চলিয়া যায়। কেহ শয়ন করিয়াছে, কেহ শয়নের আয়োজন করিতেছে, কেহ আসনে বসিয়া চিন্তাসাধনায় মগ্ন হইয়াছে, কেহ বারান্দায় বসিয়া করিতেছে মেঘের গতিতে চাঁদের গতি সৃষ্টির ভ্রান্তিকে উপভোগ।

উমা আর রাবলীর কুটিরের সামনে আসিয়া বিপিনের অন্যমনস্কতা ঘুচিয়া গেল। বারান্দার নিচে দাঁড়াইয়া আছে শশধর, বারান্দায় থাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া তার সঙ্গে কথা বলিতেছে রত্নাবলী।

চিনিতে পারিয়াও বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে?

শশধর উৎসাহের সঙ্গে বলিল, আমায় চিনলেন না? সেই যে সেদিন—

রত্নাবলী সোজাসুজি বলিল, উনি মহেশবাবুর ভাগ্নে।

বিপিন বলিল, এত রাতে আপনি এখানে কি করছেন?

বিপিনের গলার সুরে শশধরের উৎসাহ নিভিয়া গিয়াছিল, সে আমতা আমতা করিয়া বলিল, মহেশবাবু বললেন কিনা

তার হইয়া রত্নাবলী কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিল, মহেশবাবুর খুব অসুখ, এক শ চারে জ্বর উঠেছে; মাধবীকে একবার দেখবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। শশধরবাবু তাই বলতে এসেছেন, মাধবী যদি একবার যায়—

এত রাতে! দিনের বেলা বলতে এলেই হত।

বিপিনের আবির্ভাবেই রত্নাবলী যেন বিরক্ত হইয়াছিল, জেরা আরম্ভ করায় সে যেন রাগিয়া গেল, আপনি বুঝছেন না দিনের বেলা অতটা ব্যাকুল হন নি! এখন এত বেশি ছটফট করছেন যে, শশধরবাবু ভাবলেন, মাধবীকে যেতে বলে গেছেন, এ খরবটা জানালে হয়তো একটু শান্ত হবেন। তাই এখন বলতে এসেছেন। নইলে এত রাতে ওঁর আশ্রমে আসবার দরকার!

এত কথা এক সঙ্গে রত্নাবলী কোনোদিন বলে না। চাঁদের আলোতেও বোঝা যায়, রত্নাবলীর দাঁতগুলি কি ধবধবে। ব্যাপারটা বিপিনের একটু জটিল মনে হইতে লাগিল।

মহেশ চৌধুরীর খুব অসুখ হইয়াছে, মাধবীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, শুধু এই ব্যাপারটুকুই কম জটিল নয়। জগতে এত লোক থাকিতে মাধবীলতাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা কেন? কতটুকুই বা তার পরিচয় মাধবীর সঙ্গে! মাধবীলতাকে কথাটা জানাইতে এত রাত্রে আশ্রমে আসিয়া রত্নাবলীর সঙ্গে শশধরের গল্প জুড়িয়া দেওয়াটাও জটিল ব্যাপার বৈকি। উমা আর মাধবীলতার অনুপস্থিতির ব্যাপারটা আরো বেশি জটিল।

জিজ্ঞাসা করায় রত্নাবলী বলিল, ওরা খাচ্ছে।

এখনো খাওয়া হয় নি কেন?

রত্নাবলী মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া ঝাঁঝালো গলায় বলিল, কারণ আছে, ওসব মেয়েদের ব্যাপার আপনি বুঝবেন না। পারি না বাপু আর আপনার কথার জবাব দিতে।

মনে মনেও কোনো রকমেই বিপিন রাগ করিতে পারিতেছিল না, আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ করা তার কাছে গুরুতর মনে হইতেছিল না। আশ্রমের নিয়মেই যেন এসব ঘটিতেছে, আগাগোড়া তার নিজেরও সমর্থন আছে। একটু ভাবিল বিপিন, তারপর কোনোরকমে গলা গম্ভীর করিয়া বলিল, আপনি ভেতরে যান, রাত্রে কেউ কোনো দরকারে আশ্রমে এলে এবার থেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আর আপনি বাড়ি ফিরে যান শশধরবাবু, মহেশবাবুকে বলুন গিয়ে মাধবীকে সঙ্গে করে নিয়ে আমি যাচ্ছি।

আজ রাত্রেই যাবেন?

অসুখবিসুখের সময় কি দিন-রাত্রির বিচার করলে চলে? সময় বুঝে মানুষের অসুখ হয় না। বুড়ো মানুষ, এমন অসুখে পড়েছেন, তাঁর সামান্য একটা ইচ্ছা যদি আমরা না পূর্ণ করিতে পারি, আমাদের আশ্রমে থাকা কেন? নিজেরা সুখে থাকার জন্য আমরা আশ্রম-বাস করি না শশধরবাবু।

শশধর অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বিপিন তাগিদ দিয়ে বলে, দাঁড়িয়ে থাকবেন না, আপনি যান। বলুন গিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা যাচ্ছি।

শশধর চলিয়া গেলে রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিল, এত দূর রাস্তা যাবেন কি করে? হেঁটে?

সে ভাবনা তো আপনাকে ভাবতে বলি নি? আপনাকে যা বললাম তাই করুন, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

রত্নাবলী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, আমি সঙ্গে যাব না?

বিপিন বলিল, না।

এত রাতে বিপিন মাধবীলতাকে সঙ্গে করিয়া মহেশ চৌধুরীর বাড়ি যাইবে। মহেশ চৌধুরীর। বাড়ি কাছে নয়, আশ্রম হইতে প্রায় চার মাইল পথ। বিপথে মাঠ-ঘাট বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়া গেলে পথ কিছু সংক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু এখন বর্ষাকালে দিনের বেলাও সে পথে যাতায়াত করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আশ্রম হইতে বাগবাদা যাইতে হইলে সাতুর গা ঘেঁরিয়া যাইতে হইবে, সাতুনা বেশি দূরে নয়। সাতুনা পর্যন্ত যাওয়ার আগেই পথের ধারে ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকজন গৃহস্থের খানকয়েক বাড়ি আর ক্ষেতখামার পাওয়া যায়, তাদের কারো কারো গরুর গাড়ি আছে। বিপিন কি লোক পাঠাইয়া গরুর গাড়ি আনাইয়া লইবে? অথবা মাধবীকে সঙ্গে করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া দিবে, পথে ওই ছোট পাহাড়টিতে হোক, সাতুনা হোক, কারো কাছে সগ্রহ করিয়া লইবে গরুর গাড়িঃ গরুর গাড়ি না পাওয়া গেলে হটিয়াই হাজির হইবে বাগবাদায় মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে? এই সব ভাবিতে ভাবিতে রত্নাবলীর সর্বাঙ্গে কাটা দেয়-আকাশ ও পৃথিবীব্যাপী ক্ষান্তবর্ষার রাত্রি রত্নাবলীকে ঘিরিয়া আছে, নির্জন পথ বাহিয়া দুজন হাঁটিয়া চলিয়াছে ঘুমন্ত গ্রামের গা ঘেঁষিয়া, পথের খানিক খানিক ভিজা চাঁদের আলোয় ঢাকা আর খানিক খানিক বড় বড় গাছের ছায়ায় প্রায় অন্ধকার, কোথাও ঝোপঝাড় পথের উপর ঝুকিয়া

পড়িয়াছে, কোথাও দুদিকেই জলভরা ক্ষেত হাঁটিয়া চলিতে চলিতে দুজন কখন উঠিয়া বসিয়াছে গরুর গাড়িতে ছাউনির মধ্যে, গাড়ির দোলনে এদিক-ওদিক চলিতে কখন তারা জড়াইয়া ধরিয়াছে পরস্পরকে, কখন শশধরের দুটি হাত অন্ধের দুটি হাতের মতো রত্নাবলীর সর্বাঙ্গে ব্যাকুল আগ্রহে খুঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে রত্নাবলীর সর্বাঙ্গের পরিচয় একা বিপিনের সঙ্গে একাকিনী মাধবীর এত রাত্রে মহেশ চৌধুরীর বাড়ি যাওয়ার নানারকম অসুবিধা ও অসঙ্গতির কথা ভাবিতে ভাবিতে রত্নাবলীর গায়ে সত্যই কাঁটা দিয়া ওঠে। বিপিনের কি মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে? কাল মাধবীকে নিয়া গেলে চলিবে না মহেশ চৌধুরীর বাড়ি?

কি ভাবছেন? খাওয়া হয়ে থাকলে মাধবীকে পাঠিয়ে দিন বাইরে।

আমিও যাই না আপনাদের সঙ্গে?

বিপিন মাথা নাড়িয়া জোর দিয়া বলিল, না না, আপনাকে যেতে হবে না।

আমি সঙ্গে না গেলে মাধু আপনার সঙ্গে যাবে না।

মাধু যাবে কি যাবে না, সেটা আপনার কাছে না শুনে মাধুর কাছেই না হয় শুনতাম?

রত্নাবলী অধীর হইয়া বলিল, বুঝেও কি বুঝতে পারেন না আপনি? এত রাত্রে আপনার সঙ্গে মাধুকে আমি যেতে দেব না। যদি চেষ্টা করেন নিয়ে যাবার, হৈচৈ গুণ্ণগোল বাধিয়ে দেব।

বিপিনের যে প্রতিভা কদিন হইতে মায়ানিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল, রত্নাবলীর মুখে এ কথা শুনিবামাত্র সোনার কাঠির স্পর্শে ঘুমভাঙার মতো চোখের পলকে জাগিয়া উঠিল। সত্যই, চোখের পলকে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পর্যন্ত পাওয়া গেল বিপিনের চোখেই। রত্নাবলী স্পষ্ট দেখিতে পাইল একবার কি দুবার পলক পড়ার মধ্যে বিপিনের চোখ যেন জ্বলজ্বল করিয়া

উঠিল অন্ধকারে হিংস্র পশুর চোখের মত, তারপর হইয়া গেল জ্ঞানের ছানিপড়া বৃদ্ধের চোখের মতো স্তিমিত।

আপনাকে নিলে আর গোলমাল করবেন না?

না। আমি সঙ্গে গেলে-

ডাকব নাকি সবাইকে?

রত্নাবলী ভয় পাইয়া বলিল, সবাইকে ডাকবেন? সবাইকে ডাকবেন মানে? কেন ডাকবেন। সবাইকে?

বিপিন গম্ভীরমুখে বলিল, পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে যাওয়া কি ভালো নয়? আপনি এত সঙ্কোচ বোধ করছেন কেন, আপনি প্রথম নন, আপনার মতো দু-একজন এভাবে আশ্রম ছেড়ে গিয়েছে।

আশ্রম ছেড়ে যাব? এতক্ষণ রত্নাবলী দাঁড়াইয়া ছিল, এবার দাওয়ায় উঠবার ধাপটিতে বসিয়া পড়িল। বলিল, একটু বসি, পা ধরে গেছে। কি বলছেন আপনি বুঝতে পারছি না।

কথাটা সত্য নয়। রত্নাবলী বেশ বুঝিতে পারিতেছিল সব। অনেকদিন আগে, দেড় বছর দু বছরের কম হইবে না, সে তখন অল্পদিন হয় আশ্রমে বাস করিতে আসিয়াছে, বিপিন একদিন এমনিভাবে অসময়ে হঠাৎ সকলকে ডাকিয়াছিল। সীতা নামে একটি শিষ্যার আশ্রমে মন টিকিতেছে না, সে চলিয়া যাইবে, সকলের কাছে বিদায় চাহিতেছে। সে দৃশ্য রত্নাবলীর মনে গাথা হইয়া আছে। কুটিরের সামনে মাটিতে বসানো দুটি লঠনের আলো সকলের মুখে পড়িয়াছে, কারো মুখে বেশি কারো কম। সকলে নির্বাক পাথরের মূর্তির মতো নির্বাক। এখনকার চেয়ে শিষ্য ও শিষ্যার সংখ্যা তখন কম ছিল আশ্রমে।

সীতা কাঁদতেছিল। দাওয়ায় বসিয়া মুখ নিচু করিয়া নিঃশব্দে কাদিতেছিল। কয়েকদিন আগে সীতার স্বামীকে বিপিন আশ্রমেরই কি একটা কাজে দূরদেশে পাঠাইয়াছে, তিন-

চার দিন পরে সে ফিরিয়া আসিবে। কল্যাণী নামে আশ্রমের একটি মেয়েকে বিপিন সেই কটা দিন সীতার সঙ্গে তার কুটিরে থাকিতে বলিয়া দিয়াছিল। বছর বার বয়স ছিল কল্যাণীর আর ছিল কাঠির মতো সরু চেহারা। একটু তফাতে দাওয়ার একটা খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া সে ভয়ার্ত চোখে চাহিয়া ছিল। সীতার মুখের চেয়ে কল্যাণীর সেই দৃষ্টিই রত্নাবলীর বেশি স্পষ্টভাবে মনে আছে।

সকলেই জানিত, একঘণ্টা আগে কল্যাণীর বাবাকে অবিলম্বে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার নোটিশ দেওয়া হইয়াছে এবং সে গরুর গাড়ি আনিতে গিয়াছে। কল্যাণীর বাবার মতো রূপবান পুরুষ রত্নাবলী কখনো দেখে নাই। শান্তির খোজে ভদ্রলোক সদানন্দের আশ্রমে আসিয়াছিল, কিন্তু একটু স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ হওয়ায় বিপিনের সঙ্গে ক্রমাগত খিটিমিটি বাঁধিয়া অশান্তির সৃষ্টি হইতেছিল। মানুষটাকে সকলেই পছন্দ করিত, মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আবার সংসারে ফিরিয়া যাইতেছে জানিয়া সকলের দুঃখও হইয়াছিল, কিন্তু ঘটনার সীতা সংক্রান্ত আকস্মিক পরিণতিতে সকলে খতমত খাইয়া গিয়াছিল।

তারপর বিপিন সীতাকে বলিয়াছিল, আপনি তবে তৈরি হয়ে নিন।

তখন সীতা বলিয়াছিল, আমি যাব না।-উনি না ফিরে এলে এক পা নড়ব না আমি এখান থেকে।

বিপিন যেন স্তম্ভিত হইয়া বলিয়াছিল, সে কি!

সীতা প্রায় আতর্নাদ করিয়া বলিয়াছিল, উনি নেই, এভাবে আপনারা আমায় তাড়িয়ে দিতে পারেন না।

বিপিন গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল, আপনাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে কে?

কল্যাণীর বাবা গরুর গাড়ি আনিয়া মেয়েকে সঙ্গে করিয়া বিদায় হইয়া গিয়াছিল, সীতা কয়েকটা দিন আশ্রমে ছিল। সীতার স্বামী কিন্তু আর আশ্রমে ফিরিয়া আসে নাই। বিপিন

কি তাকে আশ্রমের কাজে বাহিরে পাঠাইয়াছিল? বাহিরে থাকিতে আশ্রমের কোনো কথা কানে যাওয়ায় আর সে ফিরিয়া আসে নাই? অথবা নিজেই সে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল? এইসব ছিল তখন সকলের জিজ্ঞাস্য। এখনো এসব জিজ্ঞাস্যই রহিয়া গিয়াছে। কয়েকদিন স্বামীর প্রতীক্ষা করিয়া সীতাও যেন আশ্রম হইতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।

বিপিন রত্নাবলীকে লক্ষ্য করিতেছিল। আশ্রমের নিয়ম তো আছেই, তাছাড়া রত্নাবলী নিজেও অত্যন্ত সাবধান, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, রত্নাবলীর দেহটাই বড় বেহায়া। দেখিতে দেখিতে বিপিনের মনে হয় কি, এর কাছে কোথায় লাগে মাধবীলতা, গদির কাছে কাঁথার মতো? তবু মাধবীলতার আকর্ষণ কত বেশি। রত্নাবলীকে এতকাল সে কি দেখিয়াও কোনোদিন চাহিয়া দেখিয়াছে? কুটিরে হোক, নদীর ঘাটে হোক, রত্নাবলী দৃষ্টিপথে পড়িলে তাকে না দেখিয়া অবশ্য থাকা কঠিন, অন্তত তাড়াতাড়ি সরিয়া যাওয়ার আগে মেয়েদের দিকে তাকানো উচিত নয়, মনের এই ছুতাতেও অন্তত একটিবার রত্নাবলীকে দেখিতেই হয়, কিন্তু সে দেখা ওই দেখা পর্যন্তই। রত্নাবলী যেন আকর্ষণ করে না, কেবল মনটা বিচলিত করিয়া দেয় কিছুক্ষণের জন্য। মাধবীলতা ও রত্নাবলীর তুলনামূলক সমালোচনাটা বিপিন আগেও যে কোনোদিন করিতে পারি, কিন্তু এই মুহূর্তের আগে কথাটা যেন তার খেয়ালই হয় নাই। কথাটা মনে পড়িয়া সে একটু আশ্চর্য হইয়া যায়। সে জানে এখন তাকে এই দাওয়ায় বসাইয়া কুটিরের সামনে খোলা জায়গায় জ্যোৎস্নালোকে মাধবী আর রত্নাবলী যদি পরস্পরের কিছু তফাতে দাঁড়ায়, যাতে এক একটি চোখের কোণে সে এক একজনকে আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া জ্যোৎস্নার আবরণ অঙ্গে চাপানোর প্রক্রিয়ায় ব্যাপ্ততা দেখিতে পায়, দুটি চোখই তার অপলক হইয়া থাকিবে রত্নাবলীর দিকে কিন্তু মন তার পড়িয়া থাকিবে মাধবীলতার কাছে। অভদ্র কল্পনাটি বিপিনের রোমাঞ্চকর মনে হয়। বিপিনের নিজেরই একটা ধারণা ছিল যে, মোটামুটি হিসাবে বছর ত্রিশেক বয়স হইবার পর মানুষের আর এ ধরনের কল্পনা ভালো লাগে না, ছেলেমানুষি মনে হয়, হাসি পায়-রাজাসাহেবের বাড়িতে দেয়ালে টাঙানো কয়েকটি নগ্না নারীর প্রকাশ্য চিত্র দেখিয়া বিপিন ওই ধারণাটি সৃষ্টি করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল যে, এই

ছবিগুলির দিকে কেউ তাকাইয়াও দ্যাখে না, দেখিয়া দেখিয়া আর কারো কিছুমাত্র কৌতূহল নাই, রক্তমাংসের স্ত্রীলোকের বেলাও মানুষের তাই হয়, প্রথম বয়সটা কাটিয়া যাওয়ার পর নারীদেহ সম্বন্ধে মানুষের সমস্ত কৌতূহল মিটিয়া যায়। প্রথম বয়স বিপিনের বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় বয়সটাও প্রায় কাটিতে চলিল, তবু রত্নাবলী ও মাধবীলতা সম্বন্ধে ছেলেমানুষি কল্পনা করিতে তার ভালো লাগিতেছে কেন, এটা অবশ্য বিপিন ভাবিয়া দেখিল না। রত্নাবলীর পাশে বসিয়া সে হঠাৎ একটা খাপছাড়া কাজ করিয়া ফেলিল-এত জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, বলিবার নয়। রত্নাবলী আরো ভয় পাইয়া গেল। পাশে বসে কেন বিপিন? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেন বিপিন? অমন করিয়া তাকায় কেন বিপিন জ্ঞানী বৃদ্ধের মতো?

আমি বড় ছেলেমানুষ রতন দেবী।

গা ঘেঁষিয়া বিপিন বসিয়াছে। বিপিন যদি এবার গায়ে হাত দেয়? যদি জড়াইয়া ধরে? পুরুষ সব সময়ই সংযত থাকিতে পারে, কিন্তু পুরুষমানুষের সংযম শুধু অন্যমনস্কতা, হয়তো পাঁচ-সাত বছর কোনো মেয়ের কথা মনেও পড়িল না, কিন্তু তার পাশে গা ঘেঁষিয়া বসিবার পর পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে হয়তো এমন পাগলামি করিয়া বসিল যার তুলনা হয় না। বিপিনের কিছু হইবে না, বিপদে পড়িবে সে। সে যদি গোলমাল করে, সকলে যদি বুঝিতেও পারে যে দোষ আগাগোড়া বিপিনের, তবু বিপিনের এতটুকু আসিয়া যাইবে না, মারা পড়িবে সে-ই।

উমা-মাসি আসছে বোধহয়।

সহজভাবে স্বাভাবিককণ্ঠে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া কোনো লাভ হইল না, রত্নাবলীর নিজের কানেই কথাগুলি শুনাইল যেন সে চুপিচুপি ফিসফিস করিয়া প্রণয়ীকে সতর্ক করিয়া দিতেছে।

বিপিন একটু হাসিল। আসুন না, সকলেই তো আসবেন।

সকলে আসবেন কেন! ও-কথা বলছেন কেন আপনি!

কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিবে কিনা, মনে মনে রত্নাবলী তাই ভাবিতেছিল, গলাটা তাই কাঁদ কাঁদ শোনাইল। মেয়েদের প্রকৃতিই এই রকম একটা কিছু করিবে কি করিবে না ভাবিতে ভাবিতে কাজটা অর্ধেক করিয়া ফেলে। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ে নিজেকে দান করার আগে ঠিক করিয়া ফেলতে পারে নাই আত্মদান করিবে কিনা।

[লেখকের মন্তব্য : কি কথায় কি কথায় আসিয়া পড়িল। কিন্তু উপায় নাই, রত্নাবলীকে বুঝিতে হইলে, কথাটা মনে রাখা দরকার। কোনো বিষয়ে আগে হইতে মনস্থির করিয়া ফেলিবার ক্ষমতাটাই মনের জোরের চরম প্রমাণ হিসাবে প্রায় সকলেই গণ্য করিয়া থাকে, আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওটা গোয়াত্মিরই রকমফের। ধরাবাঁধা নিয়মগুলি জীবনে কাজে লাগে না, ধরাবাঁধা নিয়ম কি জীবনে বেশি আছে? যেগুলিকে অপরিবর্তনীয় নিয়ম বলিয়া মনে হয়, আসলে সেগুলি মানুষের আরোপ করা বিশেষণ মাত্র, উল্টাটাও অনায়াসে খাঁটিতে পারিত। মানুষ কি চায়, মানুষ কি করে এবং মানুষের কি চাওয়া উচিত আর মানুষের কি করা উচিত, এর কোনো নির্দিষ্ট ফরমুলা আছে? অন্যের প্রস্তুত করা ফরমুলা চোখ-কান বুজিয়া অনুকরণ করা হয় বোকামি নয় গোয়াত্মি। মেয়ে এবং পুরুষের মধ্যে যারা সুবিধাবাদী, তারা বোকাও নয় গোয়ারও নয়। এই জন্য তারা আগে হিসাব-নিকাশ শেষ করিয়া চরম সিদ্ধান্ত করিতে পারে না, দরকারমতো কাজ আরম্ভ করে কিন্তু মন সিদ্ধান্তের বাঁধনে বাধা পড়তে চায় না। শশধরের বাহুর বাঁধন রত্নাবলী মানিয়া লইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তখনো সে কি স্বীকার করিবে নারীজন্ম তার সফল হইল অথবা মস্ত একটা ভুল সে করিয়া বসিয়াছে ঝোঁকের মাথায়? দেহ অবশ্য তার অবশ হইয়া যাইবে, চোখ মেলিয়া চাহিবার ক্ষমতাও হয়তো থাকিবে না, মনে প্রায় এই ধরনের একটা চরম সিদ্ধান্ত সমস্ত চিন্তাকে দখল করিতে চাহিবে, যে জীবনের তার অতীতও ছিল না, ভবিষ্যৎও থাকিবে না, তবু সে তখনো ভাবিতে থাকিবে যে, শশধর যদি তাকে কামনা করে, নিজেকে সে কি তখন দান করিবে? নিজেকে দান করা কি উচিত হইবে তার?

আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রত্নাবলীর এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তিটা একটু অসাধারণ। সে যেন ইচ্ছা করিয়া নিজেকে ধাধায় ফেলিয়া দেয়। সে যেন সব সময় সচেতন হইয়া থাকে যে, কি করিবে না করিবে, ঠিক সে করিয়া উঠিতে পারিতেছে না এবং তাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না।।

বিপিন আবার মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, আপনি বড় ছেলেমানুষ। বলিয়া নিছক বাহাদুরি করার জন্যই গম্ভীরমুখে হাত বাড়াইয়া রত্নাবলীর গালটা টিপিয়া দিল। রত্নাবলী মাথায় আঁকি দিল, আধোত সরিয়া বসিল এবং দ্রুতদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল আর কিছুই করিল না। একটু অপেক্ষা করিয়া রত্নাবলীর নিশ্চেষ্ট শান্তভাবে খুশি হইয়া বিপিন বলিল, মাধুকে নিয়ে যাচ্ছি, মহেশবাবুর বাড়িতে রেখে আসব বলে। এখন কয়েকদিন ওইখানেই থাকবে, তারপর যেখানকার মানুষ সেখানেই ফিরে যাবে। ওর পক্ষে আশ্রমে থাকাও চলবে না, আমাদেরও ওকে রাখা চলবে না। আপনি বলছেন, আপনি সঙ্গে না গেলে ওকে আপনি যেতেই দেবেন না, আমি তাই ভাবলাম আপনিও বুঝি চিরদিনের মতে ওর সঙ্গে আশ্রম ত্যাগ করে চলে যেতে চাইছেন। তাই সকলকে ডাকার কথা বলছিলাম। আপনি তো মাধবীর মতো চুপি চুপি আশ্রমে আসেন নি, আপনি কেন চুপি চুপি আশ্রম ছেড়ে চলে যাবেন যেতে হলে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই যাবেন।

বলিয়া বিপিন হাসিতে লাগিল।

গাল টিপিয়া দেওয়ায় রত্নাবলী আধ হাত তফাতে সরিয়া গিয়াছিল, এবার প্রায় হাতখানেক কাছে আসিয়া চাপা গলায় বলিল, মাধু চলে যাচ্ছে আশ্রম থেকে?

সায় দিবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়িতে যাওয়ায় বিপিনের মুখ প্রায় রত্নাবলীর মুখে ঠেকিয়া গেল। তা হোক, তাতে দোষ নাই, গোপন কথার আদান-প্রদানের সময় মানুষের মুখ কাছাকাছিই আসে। ভিতরের কৌতূহল রত্নাবলীর চোখ দুটিকে যেন সত্য সত্যই খানিকটা বাহিরের দিকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে। তেমনি চাপা গলায় সে জিজ্ঞাসা করিল, কি করেছে মাধু? কার সঙ্গে করেছে?

কি করবে? কার সঙ্গে করবে? ও তো আশ্রমে চিরকাল থাকবার জন্য আসে নি কদিন বেড়িয়ে গেল, এই মাত্র।

আমার কাছে লুকোন কেন? বলুন না? পায়ে পড়ি, বলুন।

কি বলব?

রত্নাবলী হতাশ হইয়া গেল। অভিমানে সরিয়া বসিল। কি করিয়াছে মাধবী? আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে, এমন কি অপরাধ মেয়েটা করিয়াছে! এতকাল সঙ্গে থাকিয়াও জানিতে পারিল না! জিজ্ঞাসা করিতে হইবে তো মাধবীকে, মাধবী চলিয়া যাওয়ার আগে।

বসুন, ডেকে দিচ্ছি মাধবীকে।

আপনি বসুন, আমিই ডেকে আনছি।

ডাক শুনিয়া মাধবীর মুখ পাংশু হইয়া গেল। বিপিনকে দিয়া সদানন্দ তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে।

এখনি যেতে হবে আপনার সঙ্গে?

হ্যাঁ, এখনি যেতে হবে।

চলুন তবে, যাই।

যাওয়ার সময় দাওয়ায় বসিয়া রত্নাবলী ক্ষীণস্বরে একবার মাধবীলতাকে ডাকিল। মাধবী সাড়া দিল না। ছুটিয়া গিয়া উন্মাদিনীর মতো সদানন্দের গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাকে খুন করিয়া ফেলিবার জন্য তার ধৈর্য ধরিতেছিল না। বিপিনকে দিয়া সদানন্দ তাকে ডাকিয়া পাঠায়! সে এত সস্তা, মানুষের কাছে তার মর্যাদা এত কম যে, প্রকাশ্যভাবে বিপিনকে দিয়া সদানন্দ তাকে অভিসারে যাওয়ার হুকুম পাঠাইয়া দিতে পারে এমন অনায়াসে।

বিপিন আশ্চর্য হইয়া বলে, ওদিকে কোথায় চলেছ?

মাধবীলতা কুদ্ধকণ্ঠে বলে, ফপরদালালি করবেন না-আমি পথ চিনি।

শোন, শোন। দাঁড়াও

পিছনে পিছনে খানিকটা প্রায় ছুটিয়া গিয়া মাধবীলতার হাত ধরিয়া বিপিন তাকে দাঁড় করায়। মাধবী বলে, ও! আপনি বুঝি পাওনা মিটিয়ে নেবেন আগে? শিগগির নিন, একটু তে ঘুমাতে হবে রাত্রে?

বিপিন কোমলকণ্ঠে বলে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে মাধু? কি বকছ পাগলের মতো?

মাধবীলতাও কোমলকণ্ঠে বলে, মাথা খারাপ হবে না? যা আরম্ভ করে দিয়েছেন আপনারা, এতে মাথা ঠিক থাকে মানুষের? এর চেয়ে কুমারসায়ের মিসট্রেস্ হওয়াই আমার ভালো ছিল, কিছুদিন তো মজা করে নিতাম।

এখানটা ফাঁকা, কাছাকাছি দু-একটি মোটে গাছ আছে। এদিকে এলোমেলোভাবে ছড়ানো আশ্রমের কুটিরগুলির কয়েকটি মাত্র চোখে পড়ে, আর এদিকে চোখে পড়ে সদানন্দের কুটির। জ্যোঙ্গালোকে কুটির ও আবেষ্টনীর মধ্যে ফাকা মাঠে মাধবীলতার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে বিপিনের মনে হয়, আঙুলগুলি যদি তার পাখির পালকের মতো কোমল হইয়া না যায়, আর সে যদি মেয়েটার সর্বাস্থে সস্নেহে আঙুল বুলাইয়া না দেয়, পৃথিবীটাই রসাতলে চলিয়া যাইবে! অকারণে নিজেকে এই মেয়েটার জন্য মহাশূন্যে বিলীন করিয়া দিবার কোনো একটা কারণ কি আবিষ্কার করা যায় না? অসহ্য কোনো যন্ত্রণা সহ্য করা যায় না এই মেয়েটার জন্য? অসম্ভব কোনো কার্য সম্ভব করা চলে না? ভাবিতে ভাবিতে মাধবীলতার মাথাটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া বিপিন মৃদুস্বরে। বলে, মাধু, কে তোমার ওপর অত্যাচার করছে বল, কাল তাকে আশ্রম থেকে দূর করে

তাড়িয়ে দেব। এ আশ্রম আমার, দলিলপত্রে আমার নাম আছে, আমার কথার ওপর কারো কথা কইবার অধিকার নেই। কে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছে, একবার তার নামটি শুধু তুমি বল।

কি উগ্র উদারতা বিপিনের! এদিকে চাপিয়া ধরিয়েছে মাধবীর মাথাটা নিজের বুকে, মুখে তাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে কে অত্যাচার করিয়াছে তার উপর, কে কষ্ট দিয়াছে তার মনে? একটু কঁদে মাধবীলতা, একটু ফোঁসফোঁস করে। বিপিন ব্যাকুল হইয়া বলে, কেন কাঁদছ মাধু? কেঁদ না। বল না তুমি কি চাও? অন্য কোথাও চলে যাবে?

কোথায় যাব? কার কাছে যাব?

যেখানে যেতে চাও, পাঠিয়ে দেব। নিজে আমি তোমার নামে বাড়ি কিনে দেব, ব্যাংকে। তোমার নামে টাকা জমা রেখে দেব-

আপনার মিস্ট্রেস হয়ে থাকতে হবে তো?

বিপিন একটু ভাবিল। হাতের আঙুল পাখির পালক নয় বলিয়া আফসোস করার সময় সদানন্দ যেমন ভুলিতে পারিতেছিল না যে, মাধবীলতার ঠোঁটের নিচে দাঁত আছে, আর আঙুলের ডগায় নখ আছে আর রক্তমাংসের তলায় হাড় আছে, বিপিনও তেমনি এখন কেবলি ভুলিবার চেষ্টা করিতেছিল যে, মাধবীলতা যাকে হাতের কাছে পায়, তাকেই আঁকড়াইয়া ধরে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া বিপিন তারপর জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি বল?

মাধবীলতা চুপ। বিপিন সত্যিই মানুষ নয়।

যাকগে, ওসব কথা পরে হবে। এখন চল, তোমাকে মহেশবাবুর ওখানে রেখে আসি।

মহেশবাবুর ওখানে?

হ্যাঁ। এখানে তোমার থাকা চলবে না।

মাধবীলতা কাঁদিতে কাঁদিতে বিপিনের সঙ্গে নদীর ঘাটে গিয়া নৌকাটিতে উঠিয়া বসিল। ছোট ডিঙি নৌকা, ছাউনি নাই, হাল নাই, বসিবার ভালো ব্যবস্থাও নাই। তবু পায়ে হাঁটিয়া যাওয়ার চেয়ে নৌকায় মহেশ চৌধুরীর বাড়ি যাওয়া অনেক সুবিধা। বিপিন নৌকা বাহিতে জানে।

## ৭. কয়েকদিন জ্বরে ভুগিয়া মহেশ চৌধুরী সারিয়া উঠিলেন

কয়েকদিন জ্বরে ভুগিয়া মহেশ চৌধুরী সারিয়া উঠিলেন। এ কয়দিন কত লোক আসিয়া যে তার খবর জানিয়া গেল, হিসাব হয় না। কেবল খবর জানা নয়, পায়ের ধুলা চাই। সদানন্দের আশ্রম জয় করিয়া আসিয়া মহেশ চৌধুরীও পর্যায়ে উঠিয়া গিয়াছেন। লোকের ভিড়েই মহেশ চৌধুরীর প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, মাধবীলতাকে পৌঁছিয়া দিতে আসিয়া কথায় কথায় এই বিপদের কথাটা শুনিয়া বিপিন ভালো পরামর্শ দিয়া গেল। পরদিন হইতে শশধর সকলকে একটি করিয়া তুলসীপাতা বিতরণ করিয়া দিতে লাগিল-উঠানের মস্ত তুলসীগাছটি দেখিতে দেখিতে দু-একদিনের মধ্যে হইয়া গেল প্রায় ন্যাড়া। যারা আসে, তাদের প্রায় সকলেই চাষী-মজুরকামার-কুমার শ্রেণীর এবং বেশিরভাগই স্ত্রীলোক-তুলসীপাতা পাইয়াই তারা কৃতার্থ হইয়া যাইতে লাগিল।

বিপিন প্রত্যেক দিন খবর জানিতে আসে। কার খবর জানিতে আসে, মহেশের অথবা মাধবীলতার সেটা অবশ্য ঠিক বোঝা যায় না। যদিও মহেশের কাছেই সে বসিয়া থাকে অনেকক্ষণ, আলাপ করে নানা বিষয়ে। আশ্রমে বিপিনের কাছে মহেশ বহুদিন ধরিয়া যে অবহেলা অপমান পাইয়া আসিতেছে, সে কথা কেউ ভুলিতে পারিতেছিল না, এখন মহেশের খাতির দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গিয়াছে। আশ্রমের কদমগাছের নিচেই কি মহেশের সব লাঞ্ছনার সমাপ্তি ঘটিয়াছে? সদানন্দ কি সত্যই এতকাল মহেশকে পরীক্ষা করিতেছিলেন, বিপিন এবং আশ্রমের অন্যান্য সকলে তারই ইঙ্গিতে মহেশের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিতেছিল? পরীক্ষায় মহেশ সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ায় এবার বিপিন বাড়ি আসিয়া তার সঙ্গে ভাব করিয়া যাইতেছে, সেবার জন্য মাধবীলতাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছে?

বিপিন আসে, নানা বিষয়ে আলোচনা করে, আর মহেশ চৌধুরীর ভক্তদের বিশেষভাবে লক্ষ করিয়া দ্যাখে। কয়েকদিন পরে মহেশ চৌধুরীর আশীর্বাদপ্রার্থীদের সংখ্যাও কমিয়া যাইতে থাকে, বিপিনের উৎসাহেও যেন ভাটা পড়িয়া যায়। প্রতিদিন আর তাকে বাগবাদায় দেখা যায় না। আসিলেও মহেশের কাছে সে বেশিক্ষণ বসে না।

মহেশ ব্যাকুলভাবে মাধবীলতাকে জিজ্ঞাসা করে, বিপিনবাবু যে আর আসেন না মা?

মাধবীলতা বলে, কাজের মানুষ, নানা হাঙ্গামায় আছেন, সময় পান না।

বড় ভালো লোক। কি বুদ্ধি, কি কর্মশক্তি, কি তেজ, কি উৎসাহ-সবরকম গুণ আছে। ভদ্রলোকের। এমন একটা মানুষের মতো মানুষ, জান মা, আমি আর দেখি নি।

বিপিনের এরকম উচ্ছাসিত প্রশংসা শুনিয়া মাধবীলতা হাসিবে না দিবে, ভাবিয়া পায় না। বুদ্ধি হয়তো আছে, কিন্তু বুদ্ধি থাকিলেই কি তোক ভালো হয় নাকি? ওই স্তিমিত নিস্তেজ মানুষটার কর্মশক্তি, তেজ আর উৎসাহ!-যার মুখের চিরস্থায়ী বিষাদের ছাপ সংক্রামিত হইয়া মানুষের মনে বৈরাগ্য জাগে?

এখানে মাধবীলতার ভালো লাগে না। মহেশ যে কদিন দক্ষিণের ভিটার ঘরটিতে দেড় শ বছরের পুরোনো খাটে শুইয়া জ্বরের ঘোরে ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে থাকিয়া থাকিয়া বলিত, ওরা আমার কাছে আসছে কেন? প্রভুর কাছে পাঠিয়ে দাও ওদের, সে কদিন সেবার হাঙ্গামায় একরকম কাটিয়া গিয়াছিল, মহেশ সুস্থ হইয়া উঠিবার পর মাধবীলতার সব একঘেয়ে লাগে। গ্রামের মেয়েরা দু-চার জন করিয়া সকলেই প্রায় মাধবীলতাকে দেখিয়া গিয়াছে। পাড়ার কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু এদের মাধবীলতার ভালো লাগে না। তাই নিজেও সে এদের কাউকে কাছে। টানিবার চেষ্টা করে নাই, নিজে হইতে তার গা ঘঁষিয়া আসিয়া ভাব জানাইবার ভরসাও এদের হয় নাই। বেড়াইতে আসিয়া অভদ্র বিস্ময়ের সঙ্গে এরা মাধবীলতাকে শুধু দেখিয়াই যায়। আশ্রমবাসিনী কুমারী সন্ন্যাসিনী (বয়স কত হইয়াছে ভগবান জানেন) সাধারণ বেশে আশ্রম ছাড়িয়া আসিয়া মহেশ

চৌধুরীর বাড়িতে বাস করিতেছে, গায়ের মেয়েদের কাছে সে কতকটা স্বর্গচ্যুতা অঙ্গুরী  
কিন্নরীর মতো রহস্যময়ী জীব।

এখানে মানুষ নাই, বৈচিত্র্য নাই। স্নেহমমতা আদর্যত্ব আছে, বিভূতির মা মেয়ের মতোই  
মাধবীলতাকে আপন করিয়া ফেলিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কেবল মেয়ের মতো সব সময়  
একজনের আপন হইতে কি মানুষের ভালো লাগে? আশ্রমের জীবনের পর কেমন নীরস  
একঘেয়ে মনে হয়। আশ্রম নির্জন, কিন্তু সে অনেক নরনারীর নির্জনতা, আশ্রমের নিয়মে  
বাধা জীবন শান্ত, কিন্তু সে নিয়মও অসাধারণ, সে শান্তিও অসামান্য। কি যেন ঘটিবার  
অপেক্ষায় গাছপালায় ঘেরা আশ্রমের ছোট ছোট কুটিরগুলিতে প্রতি মুহূর্তে উন্মুখ হইয়া  
থাকা যায়-মনে হয়, এই বুঝি আশ্রমের গান্ধীর্ষপূর্ণ শান্ত্যাব চুরমার করিয়া প্রচণ্ড একটা  
অবরুদ্ধ শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিবে, এমন একটা কাণ্ড ঘটিবে যা দেখিয়া খিলখিল  
করিয়া হাসিয়া হাততালি দিয়া নাচা যায়। এখানে কোনোদিন কোনো কিছু ঘটিবার  
সম্ভাবনা নাই।

বিপিনকে মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করে, উনি কি বললেন?

কিছু বলেন নি।

কিছুই না? একেবারে কিছু না?

বিপিন মাথা নাড়িয়া বলে, কি বলবে? বলবার ক্ষমতা থাকলে তো বলবে। কি কুম্ভণে যে  
ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল মাধু!

মাধবী ভয় ও বিস্ময়ে চুপ করিয়া থাকে। তার জন্য বিপিন আর সদানন্দের মনান্তর হইয়া  
গেল? জানালা দিয়া গ্রামের পথ দেখা যায়, বর্ষায় একেবারে শেষ করিয়া দিয়া গিয়াছে,  
এখনো ভালোরকম মেরামত হয় নাই। পথের ধারে অবনী সমাদ্রারের বাড়ির সামনে  
একটি গরু বাধা আছে। রোজই বাঁধা থাকে, ঘাসপাতা খায় আর কয়েকদিনের বাছুরটির  
গা চাটে। আজ বাছুরটি যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য না? মাধবীলতা যেদিন

যেসময় কথা পাড়িল সে চলিয়া আসায় সদানন্দের কি অবস্থা হইয়াছে, সেইদিন সেই সময় বাছুরটি উধাও হইয়া গিয়া গাভীটিকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে।

আশ্রমের কিসে উন্নতি হবে, সে চিন্তা ওর নেই, দিনরাত নিজের কথাই ভাবছে। আমার এটা হল না, আমার ওটা হল না, আমার এটা চাই, আমার ওটা চাই। ওকে নিয়ে সত্যি মুশকিলে পড়েছি মাধু।

কেন, উনি বেশ লোক।

মাধবীলতার মুখে এ কথা শুনিয়া বিপিন প্রায় চমকাইয়া যায়। নৌকায় উঠিবার আগে রাগের মাথায় সদানন্দের কুটিরের দিকে পা বাড়াইয়া, স্টেজে সরলা কোমলা বনবালার অভিনয় করিয়া করিয়া হয়রান হইয়া গরম মেজাজে সাজঘরে ফিরিয়া আসা বেশ্যার মতো ফুঁসিতে ফুঁসিতে মাধবীলতা যেসব কথা বলিয়াছিল, বিপিন তার একটি শব্দও ভোলে নাই। জ্যোঙ্গালোকে দেখা মুখভঙ্গিও ভোলে নাই মাধবীলতার। সদানন্দের অত্যাচার মেয়েটার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তার চোখের আড়ালে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করিবার সুযোগ সদানন্দ পাইয়াছে ভাবিয়া, সে রাগের চেয়ে অনুতাপের জ্বালাতেই জ্বলিয়াছিল বেশি। সে বিপিন, আশ্রমের কোথায় মাটির নিচে কোন চারার বীজ হইতে অঙ্কুর মাথা তুলিতেছে, এ খবর পর্যন্ত যে রাখে, তাকে ফঁকি দিয়া সদানন্দ এত কষ্ট দিয়াছে মাধবীলতাকে! কি হইয়াছিল তার? আগেই কেন সে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করে নাই? কেন আশ্রমকে চুলায় যাইবার অনুমতি দিয়া নিজে গা এলাইয়া দিয়াছিল অসহায় শিশুর মতো?

সদানন্দের কুটিরের সামনে একটা কদমগাছের নিচে মহেশ চৌধুরীর মহাযুদ্ধ এবং মাধবীলতার মধ্যস্থতায় সে যুদ্ধের সমাপ্তির পর কয়েকটা দিন যেভাবে কাটিয়াছিল, ভাবিলে বিপিনের এখন লজ্জা করে। শরীরটা একটু দুর্বল ছিল কিন্তু দাঁতের ব্যথা ছিল না। স্নায়ু ভোতা হইয়া থাকা উচিত ছিল বিপিনের, শান্ত অবসন্ন দেহে দু-তিনদিন পড়িয়া পড়িয়া ঘুমানোই ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তার বদলে কি তীব্র মানসিক যন্ত্রণাই

সে ভোগ করিয়াছে। বার বার কেবলই তার মনে হইয়াছে, সে কি ভুল করিয়াছে? ছলে-বলে-কৌশলে দিগন্তের কোল হইতে তার আদর্শের সফলতাকে আশ্রমের এই মাটিতে টানিয়া আনিবার সাধনা কি তার ভ্রান্তিবিলাস মাত্র? এভাবে কি বড় কিছু মানুষ করিতে পারে না? নিজের জন্য সে কিছু চায় না, এইটুকুই কি তার নৈতিক শক্তিকে অব্যাহত রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়? ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের চেয়ে কার্যসিদ্ধিকে বড় ধরিয়া লইয়াছে বলিয়াই কি তার এত চেষ্টা আর আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইবে? মনে মনে নিজের দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের হিসাব করিয়া বিপিন বড় দমিয়া গিয়াছে। কতটুকু লাভ হইয়াছে, কতটুকু সার্থকতা আসিয়াছে? কোন্দিকে কতটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছে? আশ্রম বড় হইয়াছে, আশ্রমের সম্পত্তিও বাড়িয়াছে, লোকজনও বাড়িয়াছে, কিন্তু উন্নতি হয় নাই। ভালো উদ্দেশ্যে যে মিথ্যা আর প্রবঞ্চনা আর ফন্দিবাজিকে সে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, সে সব একান্তভাবে তার নিজস্ব গোপন পরিকল্পনার অঙ্গ, আশ্রমের জীবনে কেন সে সমস্তের প্রতিক্রিয়া ফুটিয়া ওঠে? আর এদিকে মহেশ চৌধুরী, সরল নিরীহ বুদ্ধিহীন ভালোমানুষ মহেশ চৌধুরী, না চাহিয়া সে সকলের হৃদয় জয় করিয়াছে, নিজের দুঃখময় ব্যর্থ জীবনকে পর্যন্ত সার্থকতায় ভরিয়া তুলিয়াছে। কি এমন মহাপুরুষ মহেশ চৌধুরী যে, তার পাগলামি পর্যন্ত মানুষকে মুগ্ধ করিয়া দেয়? আর কি এমন অপরাধ বিপিন করিয়াছে যে, সকলে তাকে কেবল ফাঁকিই দেয়, সদানন্দ হইতে মাধবীলতা পর্যন্ত? এইসব ভাবিতে ভাবিতে বিপিন মড়ার মতো বিছানায় পড়িয়া থাকিয়াছে অন্য মানুষ সে অবস্থায় ছটফট করে। সেই সময়েই বিপিন ভাবিয়া রাখিয়াছিল, মহেশ চৌধুরীর সঙ্গে ভাব করিয়া লোকটাকে একটু ভালোভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিবে। তবে বিশেষ উৎসাহ তার ছিল না। তারপর ধীরে ধীরে মহেশ চৌধুরীকে কাজে লাগাইবার পরিকল্পনা মনের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন আর আশ্রমের পরিসর বাড়ানো সম্ভব নয়, সম্প্রতি যে আমবাগানটা পাওয়া গিয়াছে, তাই লইয়াই আপাতত সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। সুতরাং রাজাসায়েবের ভয়ে মহেশ চৌধুরীকে এড়াইয়া চলিবার আর তো কোনো কারণ নাই। আশ্রমে অর্থসাহায্য করাও রাজাসায়েব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, কিছুদিন আর পাওয়া যাইবে

না। ভবিষ্যতে আবার যদি রাজাসায়েবের কাছে কিছু আদায় করা সম্ভব মনে হয় তখন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে।

এদিকে, যাদের চাষাভূষো মানুষ বলে, জনসাধারণ নামে যারা আশ্রমকে ঘিরিয়া আছে গ্রাম আর পল্লীতে, তাদের সঙ্গে আশ্রমের একটু যোগাযোগ ঘটানো দরকার। ওদের বাদ দিয়া কোনো প্রতিষ্ঠানই গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। ওদের সঙ্গে এখন যে সংযোগ আছে আশ্রমের, সে না থাকার মতো। কাছাকাছি কয়েকটি গ্রামের নরনারী আশ্রমে সদানন্দের উপদেশ শুনিতে এবং সদানন্দকে প্রণাম করিতে আসে, প্রণামান্তে কিছু প্রণামীও দিয়া যায় কিন্তু সে আর কজন মানুষ, সে প্রণামী আর কত! তিন দিনের পথ হাঁটাইয়া অনেক দূরের গ্রাম হইতে মানুষকে যদি আশ্রমে টানিয়া আনিতে হয়, আর একদিনের প্রণামীর পরিমাণ দেখিয়া নিশ্চিত মনে দেশের সর্বত্র আশ্রমের শাখা খুলিবার ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়া দেওয়া সম্ভব করিতে হয়, তাহা হইলে অন্য কিছু করা চাই, কেবল সদানন্দকে দিয়া কাজ চলিবে না।

মহেশ চৌধুরীকে এরা পছন্দ করে-এইসব সাধারণ মানুষগুলি। মানুষটাও ভালো মহেশ চৌধুরী। শিশুর মতো সরল।

কয়েকদিন আসা-যাওয়া মেলামেশা করিয়া বিপিন কিন্তু একটু ভডুকাইয়া গেল। মহেশ চৌধুরীর আসল রূপটা সে আর খুঁজিয়া পায় না। ভালোমানুষ, শিশুর মতো সরল, কিন্তু জোর কই? আশ্রমের কদমতলায় তার যে মনের জোরের পরিচয় বিপিনকে পর্যন্ত কাবু করিয়া কয়েক দিন আনমনা করিয়া রাখিয়াছিল? ছেলের কথা বলে, ঘরের কথা বলে, নিজের কথা বলে, আর এই সব কথার মধ্যে ফোড়ন দেয় ভগবানের কথার শান্তি চাই মহেশের, শান্তি! অনেক দুঃখ পাইয়াছে, মহেশ, সে জন্য কোনো দুঃখ নাই, এবার একটু শান্তি না পাইলে যে শেষ জীবনটাও মন দিয়া ভগবানকে ডাকা হয় না মহেশের!

ভগবানকে ডাকবার জন্য আমরা আশ্রম করি নি।

মহেশ চৌধুরী কৌতুকের হাসি হাসিয়া বলে, এখনো আমার সঙ্গে ছলনা করবেন বিপিনবাবু? ভগবানকে ডাকার জন্য ছাড়া আশ্রম হয়! তবে ভগবানকে ডাকার সুবিধের জন্যে অন্য কিছু যদি করেন-সে সবও ভগবানকে ডাকারই অঙ্গ!

আপনি তো প্রভুর বাণী শোনেন?

শুনি বৈকি।

উনি কি কোনোদিন বলেছেন, আশ্রমে যারা আছেন, তাদের কাজ হল ভগবানকে ডাকা? বলেন বৈকি-সব সময়েই বলেন। আমরা সবাই পাপী তো বিপিনবাবু? প্রশ্ন শুনিয়া বিপিন গুম খাইয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরী সায় না পাইয়াও বলে, মহাপাপী আমরা। আমাদের কি ক্ষমতা আছে নিজে থেকে ভগবানকে ডাকবার? তাই যদি পারতাম বিপিনবাবু, মনে আমার এমন অশান্তি কেন সকলের মনে অশান্তি কেন! প্রভু আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন কি করলে ভগবানকে ডাকবার ক্ষমতা হয়, কি করলে আমরা ভগবানকে ডাকতে পারি। কাণ্ডারী একমাত্র ভগবান, কিন্তু গুরুদেবের চরণতরীই ভরসা। তর্কের কথা নয়, তর্ক বিপিন করে না, কথায় কথা তুলিয়া মানুষটাকে বুঝিবার চেষ্টা করে। অন্য সবদিক দিয়া সে হতাশ হইয়া যায়, একটিমাত্র ভরসা থাকে মহেশের নিজের বিশ্বাস আঁকড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা। নিজে যা জানিয়াছে তার বেশি কিছু জানিতে বা বুঝিতে চায় না, সদানন্দের কথা হোক, শাস্ত্রের বাক্য হোক, তার নিজের ব্যাখ্যাই ব্যাখ্যা। এদিক দিয়া মহেশ ভাঙিবে কিন্তু মচকাইবে না।

এ রকম মানুষ দিয়া বিপিনের কাজ চলিবে কি?

আচ্ছা, প্রভু যদি আপনাকে কোনো অন্যায় আদেশ দেন, সে আদেশ আপনি পালন করবেন?

প্রভু অন্যায় আদেশ দিতে পারেন না।

মনে করুন দিলেন—

ওরকম ছেলেমানুষি অসম্ভব কথা মনে করে কি লাভ হবে বলুন?

বিপিনের ধৈর্য অসীম।

ওঁর আদেশ অন্যায়, আমি তা বলছি না। ধরুন, উনি ঠিকমতো আদেশ দিয়েছেন, আপনার মনে হল আদেশটা সঙ্গত নয়, তখন আপনি কি করবেন?

মহেশ নিশ্চিতভাবে বলে, আদেশ অন্যায় বলে এঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেব।

আদেশটা পালন করবেন তো?

উনি যদি আমার মনের ধাঁধা মিটিয়ে দিয়ে আদেশ পালন করতে বলেন, তবে নিশ্চয় করব।

আর যদি মনের ধাঁধা না মিটিয়ে শুধু আদেশ পালন করতে বলেন?

মহেশ হাসিয়া বলে, যান মশায়, আপনার আজ মাথার ঠিক নেই। ওরকম উনি কখনো বলতে পারেন?

যদি বলেন?

আপনি আবার সেই অসম্ভব কল্পনার মধ্যে যাচ্ছেন।

বিপিনের ধৈর্য সত্যিই অসীম।

বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে যদি বলেন? এতদিন আপনাকে যেরকম পরীক্ষা করছিলেন না, এই রকম কোনো পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি আপনাকে অন্যায় আদেশ পালন করতে বলেন?

পরীক্ষার জন্য? আরো পরীক্ষা করবেন? মহেশের মুখ চোখের পলকে শুকাইয়া যায়। ভীতসন্ত্রস্ত শিশুর মতো অসহায় চোখ মেলিয়া সে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। সদানন্দের পরীক্ষায় পাস করিয়াছে কি ফেল করিয়াছে, আজো মহেশ চৌধুরী ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই, শুধু জানিয়াছে যে, সদানন্দ তাকে অনুগ্রহ করিয়াছে, জানিয়া এই সৌভাগ্যেই সর্বদা ডগমগ হইয়া আছে। পরীক্ষার কথা মনে হইলেই তার মুখ শুকাইয়া যায়।

বিপিনের পিছনে বিভূতির মা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল। দুধের বাটি হাতে করিয়া আসিয়াছে। দুধটা বেশি গরম ছিল, এমনিভাবে ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকাতেও আন্তে আন্তে ঠাণ্ডা হইতে কোনো বাধা হইতেছে না, তাই এতক্ষণ দুজনের অপরূপ আলাপে বাধা দেয় নাই। এবার বলিল, বিপিনবাবু, ওঁর সঙ্গে আপনি কথায় পারবেন না। গুরুদেবের সমস্ত আদেশ উনি চোখ-কান বুজে মেনে চলবেন-ভাববেন না।

তবু বিপিনের ভাবনার শেষ হয় না। এমন সমস্যায় সে আর কখনো পড়ে নাই। একটা মানুষকে গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত ঠিক করিয়া ফেলিতে যে এত ভাবিতে হয়, বিপিনের সে ধারণা ছিল না। আশ্রমে যদি স্থান দেওয়া হয় মহেশকে, কাজে কি তার লাগিবে মহেশ?

মাধবীলতাকে পর্যন্ত অন্যমনে এক সময় সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, মহেশবাবু লোক কেমন

মাধু?

মাধবীলতা সংক্ষেপে বলে, ভালো নয়।

সদানন্দকে মাধবীলতা ভালো লোক বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিল। মনে পড়াতেও বিপিনের হাসি আসিল না। মাধবীলতা অন্য মানদণ্ড দিয়া বিচার করিতেছে-ভালো শব্দটারও অনেক রকম মানে আছে।

গম্ভীরমুখে সে জিজ্ঞাসা করে, আশ্রমে ফিরে যাবে মাধু?

যাব।

কি করবে আশ্রমে গিয়ে?

এ প্রশ্নের জবাব মাধবীলতা দিতে পারিল না।

## ৮. বিপিন ভাবিতেছিল

বিপিন ভাবিতেছিল, মাধবীলতাকে প্রথমে আশ্রমে ফিরাইয়া আনিবে, তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া মহেশকেও আশ্রমে আসিয়া বাস করিতে বলিবে কিনা ঠিক করিবে। ভাবিতে ভাবিতে দিন কাটিতে লাগিল। সদানন্দের নাগালের মধ্যে আবার মাধবীলতাকে আনিয়া ফেলিতে বিপিন আর সময়ই পায় না। নিজেই সে বুঝিতে পারে না মাধবীলতাকে ফিরাইয়া আনিবে ঠিক করিয়াও মহেশের ওখানে মেয়েটাকে কেন ফেলিয়া রাখিয়াছে। এবার অবশ্য সে মাধবীলতার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করিবে, নিজেও সতর্ক থাকিবে, তবু যেন ভয় হয়।

সদানন্দ বড় ভয়ানক মানুষ (বিপিনের মতে)। সদানন্দের মানুষ বশ করার যে ক্ষমতাকে। অসামান্য গুণ মনে করিয়া বিপিন এতদিন আশ্রমের কাজে লাগাইয়াছে, আজ সেই ক্ষমতাকে অনিষ্টকর ভয়ানক কিছু বলিয়া গণ্য করিতে বিপিনের দ্বিধা হয় না। বিজ্ঞানের সুবিধাভোগীরা যেভাবে বিজ্ঞানকে অভিশাপ দেয়, সদানন্দকেও বিপিন আজকাল তেমনি ভাবে কাজ ফুরানো পাজির দলে ফেলিয়াছে। কেবল মাধবীলতার জন্য এ বিরাগ নয়, সদানন্দের কাজ প্রকৃতপক্ষে ফুরায় নাই, মনে হইয়াছিল সদানন্দকে বাদ দিয়াও আশ্রম চালানো যাইবে, কিন্তু কল্পনাটা কার্যে পরিণত করিবার নামেই নানারকম আশঙ্কা মনে জাগায় আপনা হইতেই বিপিন টের পাইয়াছে যে, সদানন্দকে সে বিদায় দিতে চায় বটে কিন্তু এখনো সেটা সম্ভব নয়।

যে কোনো বুদ্ধিমান উৎসাহী লোক সদানন্দকে সামনে দাঁড় করাইয়া এরকম একটি আশ্রম গড়িয়া তুলিতে পারিবে সদানন্দকে বিদায় করার পক্ষে এই এখন সবচেয়ে বড় বাধা। সদানন্দ শুধু চলিয়া গেলে আরো বেশি কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া আশ্রমকে সে চলাইয়া নিতে পারিবে, কিন্তু প্রতিহিংসার উদ্দেশ্যে সদানন্দ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিলে পারিবে না। হয়তো পারিবে, কোনো বিষয়েই নিজেকে বিপিন অক্ষম ভাবিতে পারিবে না, কিন্তু সাধ করিয়া সে হাঙ্গামা টানিয়া আনিবার সাহস বিপিনের নাই।

বিপিনের সাহস কি কম? বিপিন কি ভীৰু?

মাধবীলতা তাই বলে। বলে, বিপিনবাবু? উনি অপদার্থ ভীৰু কাপুরুষ।

বলে মহেশকে। প্রাণ খুলিয়া বিপিনের নিন্দা করিতে পারে। মহেশ চৌধুরীর উপর বিরক্তিটা তার এত বেশি বাড়িয়া গিয়াছে, লোকটাকে দেখিলেই গায়ে যেন আজকাল তার জ্বর আসে। কিছুদিন আগে মাধবীলতা বিপিনকে বলিয়াছিল মহেশ চৌধুরী লোক ভালো নয়। তখন বিপিনের সাহচর্য সে সহ্য করতে পারি না। আজকাল মহেশ চৌধুরীর একসুরে বাধা মনোবীণার একঘেয়ে। ঝঙ্কারগুলি একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তোলায় বিপিনের মধ্যেও হঠাৎ সে কিছু কিছু বৈচিত্র্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। বিপিনের কাছে আর তাই মহেশ চৌধুরীর সম্বন্ধে কোনোরকম মন্তব্য করে না, মহেশ চৌধুরীর কাছে বিপিনকে বিশেষণের পর বিশেষণে অভিনন্দিত করিয়া চলে চালবাজ, মিথুক, লোভী, অসংযত প্রভৃতি কত সংজ্ঞাই যে বিপিনকে সে দেয়।

বিপিনের প্রশংসায় মহেশ কিন্তু পঞ্চমুখ। কারো সম্বন্ধে মহেশ কখনো কোনো কারণেই মত বদলায় না অন্তত স্বীকার করে না যে, নিন্দা প্রশংসায় কারো সম্বন্ধে তার ধারণার কিছুমাত্র পরিবর্তন হইয়াছে। নিন্দা সে জগতে কারো করে না, একবার যার যে গুণগান করিয়াছে, চিরকাল সমান উৎসাহের সঙ্গে তার সেই গুণকীর্তনই করিয়া যায়।

মাধবীলতার মুখে বিপিনের বিশেষণগুলি শুনিয়া সে একে একে বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করিতে বসে যে, মাধবীলতা ভুল করিয়াছে, ওসব বিশেষণ বিপিনের প্রতি প্রয়োগ করা চলে না। বিপিন মহান, উদার, আত্মত্যাগী মহাপুরুষ চাল বিপিনের নাই, মিথ্যা সে কখনো বলে না, লোভী সে নয়, সংযমের তার তুলনা নাই। বিপিনের ভীৰুতার অপবাদটিরও মহেশ প্রতিবাদ করে।

মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলে, বিপিনবাবু ভীৰু কাপুরুষ? কি যে তুমি বল মা! ওঁর মতো বুকের পাটা কটা মানুষের থাকে?

মাধবীলতা রাগিয়া বলে, কি যে দেখেছেন আপনি বিপিনবাবুর মধ্যে! উনি যদি ভীৰু কাপুরুষ নন, কে তবে ভীৰু কাপুরুষ? শুনুন বলি তবে। আশ্রমের ক্ষতি করবেন ভয়ে আপনাকে উনি আশ্রমে নিতে ভরসা পাচ্ছেন না।

রাগের মাথায় ভিতরের মস্ত বড় কথা যেন ফাঁস করিয়া দিয়াছে, এমনি গভরা অনুতাপের ভঙ্গিতে মাধবীলতা একদৃষ্টে মহেশ চৌধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। মহেশ চৌধুরী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া যায়। মনে হয়, ভিতরের আসল কথাটা জানিতে পারিয়া বুঝি চটিয়াই গিয়াছে! কিন্তু কথা শুনিয়া বোঝা যায়, এত সহজে খেইহারা হইবার মানুষ সে নয়।

ভয় তো বিপিনবাবুর মিথ্যে নয় মা! আমাকে আশ্রমে ঠাই দিলে আশ্রমের ক্ষতির আশঙ্কা আছে বৈকি! আমি হলাম মহাপাপী, আমার সংস্পর্শে-

বিপিনের ভীৰুতার প্রমাণটি ফাসিয়া যায়। চালের উপরেই বিপিন চলে, এ ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে কিন্তু উদাহরণ দাখিল করিতে গিয়া বিপিনের চালজির একটি দৃষ্টান্তের কথাও মাধবীলতা আগে এতদিন অনেক চেষ্টাতেও মনে করিতে পারে নাই। বিপিনের ভীৰুতার কয়েকটি জোরালো দৃষ্টান্ত আজ সে কোনোরকমেই স্মরণ করিতে পারে না। বিপিন ভীৰু সন্দেহ নাই, কিন্তু কবে কোথায় সে ভীৰুতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে?

ভাবিতে গেলে সত্যই বড় বিস্ময় বোধ হয়। বিপিনের কি তবে দোষ বলিয়া কিছুই নাই? অভাব কেবল তার গুণের? সদ্গুণ একেবারে নাই বলিয়াই লোকটার চালচলন এমন নিন্দনীয় মনে হয়? সংসারে মানুষ হয় ভালো-মন্দ মেশানেনা, কারো মধ্যে ভালো বেশি, কারো মধ্যে কম, কিন্তু বিপিনের মধ্যে ভালোর নামগন্ধও নাই। তাই কি বিপিনকে মনে হয় খারাপ লোক, যদিও তার মধ্যে মন্দের ভাগটাও খুঁজিয়া মেলে না? কথাটা যেন দাঁড়াইয়া যায় ধাধায় ভালোও নাই, মন্দও নাই, কি তবে আছে বিপিনের মধ্যে? কিসের মাপকাঠিতে মানুষ তাকে মানুষ হিসাবে বিচার করিবে? তাকে কি ধরিয়া নিতে হইবে নিন্দা প্রশংসার অতীত মহামানব বলিয়া?

বিপিন মহামানব। ভাবিলেও মাধবীলতার হাসি আসে। কিন্তু ধারণাগুলি দিয়া আপনা হইতে মনের মধ্যে যে সব ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই ধারণাগুলি দিয়া বিপিনের বিচার না করিলে, বিপিনের দোষ-গুণ নিরপেক্ষভাবে ওজন করিতে বলিলে, বিপিন সত্যই পরিণত হয়। মহামানব।

নিজের সমস্যাগুলি নিয়া অত্যন্ত বিব্রতভাবে বিপিনের দিন কাটিতেছে, মাধবীলতার খবর নেওয়ার সময়ও বিশেষ পাইতেছে না, এমন সময় বিভূতি একদিন বাড়ি ফিরিয়া আসিল। মহেশের অসুখ উপলক্ষে তাকে বাড়ি ফিরিতে দেওয়া হইয়াছে। না বলিয়া গ্রাম ত্যাগ করিতে পারিবে না, সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত বাড়িতে থাকিবে।

ছেলের চেহারা দেখিয়া বিভূতির মা কাঁদিয়াই আকুল। মহেশ বলিল, কঁদছ কেন? পাপ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?

বিভূতি বলিল, খিদে পেয়েছে মা, খেতে দাও। খালি খেতে দাও, দিন-রাত শুধু খেতে দাও, আর কিছু নয়।

পরদিন ভোরবেলা মহেশ ছেলেকে নিয়া সদানন্দের চরণ বন্দনা করিতে বাহির হইল। চরণ বন্দনার উদ্দেশ্যে আশ্রমে যাইতেছে, এ কথা অবশ্য বিভূতিকে জানাইল না, শুধু বলিল, আমাদের একবার আশ্রম থেকে ঘুরিয়ে আনবি, চল তো।

কি হবে আশ্রমে গিয়ে? এাদিন পরে এলাম, গাঁয়ের সকলের সঙ্গে দেখা-টেখা করি?

পরে দেখা করিস। আগে আশ্রম থেকে ঘুরে আসবি চল।

কিন্তু বিভূতির কাছে আশ্রমের কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। গ্রামের চেনা মানুষগুলির সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই মনটা তার ছটফট করিতেছিল। তার আসিবার খবরটা সে আসিয়া

পৌছিবার অনেক আগেই গ্রামে ছড়াইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই, তবু কাল কেউ তাকে দেখিতে আসে নাই বলিয়া বিভূতি একটু আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে। তার সংস্পর্শে আসিতে কয়েকজনের ভয় হওয়া সম্ভব, অন্তত ভয় ভাঙিতে কিছুদিন সময় লাগিবে, কিন্তু চোরা গাইয়ের সঙ্গে কপিলা গাইয়ের বাঁধা পড়িবার আতঙ্কটা কি সকলের মধ্যেই এত বেশি প্রচণ্ড যে, একজন তার খবর নিতেও আসিল না?

না আসুক, বিভূতি নিজেই সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া ভয় ভাঙাইয়া দিয়া আসিবে। আশ্রমে যাওয়ার প্রস্তাবে সে তাই ইতস্তত করিতে থাকে।

আশ্রমে যাওয়ার নামে মাধবীলতা আনন্দে ডগমগ হইয়া বলে, তাই চলুন, আশ্রম দেখে আসবেন।

বিভূতি হাসিয়া বলে, আশ্রম দেখা কি আর আমার বাকি আছে, ঢের দেখেছি।

সে আশ্রম আর নেই, কত পরিবর্তন হয়েছে দেখে অবাক হয়ে যাবেন।

বিভূতির জেলে যাওয়ার আগে সদানন্দের আশ্রম কেমন ছিল এবং তারপর আশ্রমের কি পরিবর্তন হইয়াছে, মাধবীলতার জানিবার কথা নয়, এটা তার শোনা কথা। মাধবীলতার উৎসাহ দেখিয়া বিভূতি আর আপত্তি করিল না, তিনজনে আশ্রমের দিকে রওনা হইয়া গেল-মহেশ, মাধবীলতা আর বিভূতি। বিভূতির মা গেল না, বলিল, আশ্রম মাথায় থাক, তোমরা ঘুরে এস।

বাড়ির সামনে কাঁচা পথ ধরিয়া তিনজনে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছে, শশধর আসিয়া জুটিল। আশ্রমে যাওয়ার একটা সুযোগও শশধর ত্যাগ করে না।

মহেশ মাধবীলতাকে জিজ্ঞাসা করিল, হাঁটতে পারবে তো মা?

মাধবীলতা হাসিয়া বলিল, আমাকে জিজ্ঞেস না করে বরং আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন।

মহেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দুর্গা, দুর্গা। সত্যি ওর চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে।

আশ্রমে পৌঁছিয়া প্রথমেই দেখা হইয়া গেল রত্নাবলীর সঙ্গে। মাধবীলতাকে দেখিয়া সে একগাল হাসিয়া বলিল, বেঁচে আছিস?

মহেশ তাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছ মা?

কাছেই একটা মোটা গাছের গুঁড়ি পড়িয়াছিল, কদিন আগে গাছটা কাটা হইয়াছে। বিভূতি গুড়িতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া পড়িল, কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া সে আর নড়িবে না।

মাধবীলতা বলিল, কাঠপিঁপড়ে হুল ফুটিয়ে দেবে কিন্তু।

বিভূতি বলিল, দিক, গোখরো সাপ কামড়ালেও এখন আমি নড়ছি না।

তখন সেইখানে কাঠের গুঁড়িতে বসিয়া সকলে গল্প আরম্ভ করিয়া দিল। শীতের সকালের প্রথম মিষ্টি রোদ আসিয়া পড়িতে লাগিল সকলের গায়ে। আরামে এমন জমিয়া উঠিল আলাপ যে মনে হইতে লাগিল, সদানন্দের চরণবন্দনার কথাটা মহেশও ভুলিয়া গিয়াছে! কিছুক্ষণ পরে কুটির হইতে বাহির হইয়া তাদের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার সময় স্বয়ং সদানন্দকেও কেউ দেখিতে পাইল না। খেয়াল হইল সদানন্দ যখন সামনে আসিয়া রোদ আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।

প্রথমে প্রণাম করিল মহেশ, তারপর মামার অনুকরণে শশধর। রত্নাবলী প্রণাম করায়। মাধবীলতাও টিপ করিয়া একটা প্রণাম ঠুকিয়া দিল।

সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছ মাধু?

মাধবী বলিল, ভালই আছি।

মহেশ বিভূতিকে বলিল, ঐকে প্রণাম কর।

আগের কথা সদানন্দের মনে ছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, থাক, থাক।

মহেশ জোর দিয়া আবার বলিল, প্রণাম কর বিভূতি, এঁর আশীর্বাদে তুমি ছাড়া পেয়েছ।

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিভূতি ওঠে নাই। বসিয়া থাকিয়াই সে দুহাত একত্র করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল, নমস্কার, ভালো আছেন? অনেক দিন পরে দেখা হল। আপনার আশীর্বাদ গবর্নমেন্টকেও টলিয়ে দিতে পারে, তা তো জানতাম না! .

সদানন্দ শান্তভাবে বলিল, আমার বলে নয়, আশীর্বাদ আন্তরিক হলে ভগবানকে পর্যন্ত টলিয়ে দিতে পারে বাবা।

বিভূতি আরো বেশি শান্তভাবে বলিল, ভগবানের কথা বাদ দিন, তিনি তো সব সময়েই টলছেন মাতালের মতো। টাল সামলাতে প্রাণ বেরোচ্ছে আমাদের।

মাধবীলতা চোখ বড় বড় করিয়া বিভূতির দিকে চাহিয়া থাকে। রত্নাবলীর সাদা দাঁতগুলি ঝকঝক করে। অস্থির হইয়া ওঠে মহেশ। কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়াই যেন প্রথম দিকে ব্যাকুলভাবে শুধু বলিয়া চলে, আহা, ওকি আর ছি ছি। তারপর হঠাৎ রাগ করিয়া, সোজা আর শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া, গম্ভীরকণ্ঠে ডাকে, বিভূতি!

বসা অবস্থাতেই বিভূতি বলে, কেন?

পায়ে হাত দিয়ে এঁকে প্রণাম কর, নিজের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও।

এঁকে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছা হয় না বাবা। ক্ষমা চাওয়ার মতো অন্যায় কথা কিছু বলি নি।

এঁকে আমি দেবতা মনে করে পূজা করি, আমার ছেলে তুই, একে তোর প্রণাম করতে ইচ্ছা হয় না? যা মনে এল বলে বসলি মুখের ওপর, তবু তোর অন্যায় কথা বলা হল না?

বিভূতি নীরবে মাথা নাড়িল।

করবি না প্রণাম?

না।

এবার প্রশান্তকণ্ঠে সদানন্দ বলিল, মহেশ, কি ছেলেমানুষি আরম্ভ করে দিলে তুমি?

ছেলেমানুষি প্রভু?

তুমি কি ভাব ওর প্রণাম পাওয়ার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে আছি?

তা ভাবি নি প্রভু। ও প্রণাম করুক না করুক আপনার তাতে কি আসবে যাবে সর্বনাশ হবে ওর নিজের। ও যে আমার সন্তান প্রভু?

সদানন্দ অভয় দিয়া বলিল, ভয় নেই, ওর কিছু হবে না। প্রণাম নিয়ে আমি আশীর্বাদ বিক্রি করি না মহেশ, আশীর্বাদ করাটা আমার ব্যবসা নয়, ভুলে যাও কেন? ছেলেমানুষের কথায় যদি আমি রাগ করি, আমি যে ওর চেয়েও ছেলেমানুষ হয়ে যাব।।

মহেশ ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বলিল, তা কি জানি না প্রভু? আপনি দেবতা, আপনার কি রাগ-দ্বेष আছে? কিন্তু আপনাকে প্রণাম না করলে ওর অকল্যাণ হবে।

অনিচ্ছায় প্রণাম করার চেয়ে না করাই ভালো, মহেশ।

না প্রভু। প্রণাম্যকে প্রণাম করতেই হয়। প্রণাম করতে করতে মনে ভক্তি আসে।-বিভূতি, প্রণাম কর একে।

বিভূতি নীরবে মাথা নাড়িল।

মহেশ আবার বলিল, বিভূতি, প্রণাম কর। এই দণ্ডে যদি প্রণাম না কর এঁকে, আমি যেমন আছি তেমনিভাবে যে দিকে দুচোখ যায় চলে যাব, কোনোদিন আর ফিরব না।

বিভূতি শুকনো মুখে কোনো রকমে বলিল, আমি পারব না বাবা।

মাধবীলতার সব কথাতেই ফোড়ন দেওয়া চাই। পিতার আদেশ আর মিনতি যেখানে ব্যর্থ হইয়া গেল, যদিকে দুচোখ যায় চলিয়া যাওয়ার ভয় প্রদর্শন পর্যন্ত কাজে লাগিল না, সেখানে কাতরকণ্ঠে বিভূতিকে অনুরোধ না জানাইয়া সে পারিল না, আহা এমন করে বলছেন সবাই, করুন না প্রণাম একবারটি?

এমন সময় আসিল বিপিন।

কারো দিকে বিপিন চাহিয়াও দেখিল না। সোজাসুজি মাধবীলতার কৈফিয়ত দাবি করিয়া বলিল, আমায় না জানিয়ে আশ্রমে এলে যে মাধু?

বিপিনের মুখ দেখিয়া আর গলার আওয়াজ শুনিয়া মাধবীলতার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। মহেশ বলিল, আমি ওকে এনেছি বিপিনবাবু।

বিপিন তীব্রস্বরে ধমক দিয়া বলিল, চুপ করুন, আপনাকে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করি নি।

প্রকাশ্যভাবে কেউ কোনোদিন বিপিনকে উঁচু গলায় কথা বলিতে শোনে নাই-বিশেষত সদানন্দের সামনে।

সকালবেলাই এমন একটা জটিল অবস্থা সৃষ্টি হইবে কেহ কল্পনা করতে পারে নাই। মনে মনে সকলেই একটা শঙ্কা-জড়িত অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। বিভূতি সদানন্দকে প্রণাম করিতে অস্বীকার করায় যে খাপছাড়া কাণ্ড ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল, বিপিনের আবির্ভাবে এখনকার মতো সেটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্য? মহেশ চৌধুরী ছাড়িবার পাত্র নয়। সে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছে, বিভূতি সদানন্দের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম না করিলে যদিকে দুচোখ যায় চলিয়া যাইবে। বিপিনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হইয়া গেলেই সে আবার ছেলেকে নিয়া পড়িবে।

কিন্তু কি বোঝাপড়া হইবে বিপিনের সঙ্গে? মহেশ চৌধুরী কি চুপ করিয়া থাকিবে বিপিনের ধমক সহ্য করিয়া? ধমকটা সদানন্দ দিলে সকলে অনেকটা নিশ্চিত্ত বোধ করিত, সদানন্দ এমন প্রচণ্ড শব্দে ধমক দিলে এতটা খারাপ শোনাইত না। মহেশ চৌধুরীর মতো ভক্তকে ধমক দিবার অধিকার সদানন্দের মতে মহাপুরুষের থাকে এবং আগেও অনেকবার অনেক ছুতায় মহেশ চৌধুরীকে সে অপমান করিয়াছে। সদানন্দের অপমান অনেকটা গা-সহ্য হইয়া আসিয়াছে মহেশ চৌধুরীর। কিন্তু বিপিনের অপমান সে সহ্য করিবে কেন? দুজনে যদি এখন কলহ বাঁধিয়া যায়।

মহেশ চৌধুরী কি বলে শুনিবার জন্য সকলে উৎকর্ণ হইয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরীর মুখ দেখিয়া বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। বিপিনের ধমকটা তার কানে গিয়াছে কিনা, এ বিষয়েও যেন কেমন সন্দেহ জাগে। চাহিয়া সে থাকে মাধবীলতার মুখের দিকে। কিছুক্ষণের জন্য তার দৃষ্টি এমন তীক্ষ্ণ ও অস্বাভাবিক মনে হয় যে, এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর তার একটা নূতন রূপ আবিষ্কারের সম্ভাবনায় শশধর ও সদানন্দের কেমন ধাঁধা লাগিয়া যায়।

মহেশ চৌধুরীর মুখ ধীরে ধীরে গম্ভীর হইয়া আসে। আকাশের দিকে একবার মুখ তুলিয়া উদাস কণ্ঠে সে বলে, মধু আশ্রমে আসতে পাবে না হুকুম দিয়েছিলেন, আমি জানতাম না বিপিনবাবু!

মহেশ চৌধুরীর ভঙ্গিটাই মারাত্মক। তার উপর হুকুম শব্দটা সকলের কানে যেন বিধিয়া যায়।

মাধবীলতার অপরাধক্লিষ্ট মুখের স্নানিমায় স্নায়বিক মূঢ়তার ভাবটাই এতক্ষণ স্পষ্ট হইয়াছিল, তবে মহেশ চৌধুরী ছাড়া সেটা কেউ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছিল কিনা সন্দেহ। নিজের প্রয়োজনে কে আর ওভাবে তরুণী মেয়ের মুখ দেখিতে শেখে? সোজাসুজি ভীষণতা আর কোমলতার অভিব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া নেওয়ায় কত ভালো লাগিতেছিল সকলের, কেমন দরদ সকলে বোধ করিতেছিল মেয়েটার জন্য। কিন্তু ওরকম বর্বরের মতো মায়া

করা মহেশ চৌধুরীর ধর্ম নয়, ওরকম সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা তার নাই। মানুষের এই স্বর্গত রসানরূপী পিপাসা-সৃষ্টির আগ্রহ ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় অসংখ্য ছোট ছোট মুক্তির মধ্যে মহেশ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। মাধবীলতার ভীরা কোমল কাদ কাদ মুখখানা দেখিয়া মহেশ চৌধুরী ছাড়া আর কে বুঝিতে পারিত তার ভয় বা দুঃখ নাই, আকস্মিক স্নায়বিক উত্তেজনায় সে একটু দিশেহারা হইয়া গিয়াছে? খোঁচা দিয়া তার আত্মমর্যাদার জ্ঞান জাগাইয়া তুলিবর এবং তার অপরূপ তেজকে মুক্তি দিবার বুদ্ধি বা সহস আর কার হইত? সোনালি রোদের মতোই মাধবীলতার মুখে লালিমার আবির্ভাব ঘটিতে দেখিয়া মহেশ আবার বলে, এবারকার মতো ওকে মাপ করুন বিপিনবাবু। আপনি ওকে বারণ করেছেন জানলে বিপিনের আদেশ অমান্য করায় মাধবীলতার যে অকথ্য অপরাধ হইয়াছে তার বিরাট অনুভব করিয়া মহেশ চৌধুরী নিজেই যেন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, কোনো রকমে এবারকার মতো মেয়েটাকে বিপিনের ক্ষমা পাওয়াইয়া দিবার ব্যাকুলতায় যেন দিশেহারা হইয়া যায়। মাধবীলতার হইয়া সে যেন বিপিনের পায়ে ধরিয়া বসিবে।

এবার মাধবীলতা ফোস করিয়া ওঠে, বারণ করেছেন মানে? উনি বারণ করবার কে? বেশ করেছি আমি আশ্রমে এসেছি।

বিপিন বলে, আশ্রমটা বেড়াবার জায়গা নয় মাধু।

মাধবীলতা ব্যঙ্গ করিয়া বলে, কি করবেন, মারবেন?

সদানন্দ বলে, আহা, কি আরম্ভ করে দিয়েছ তোমরা?

সে কথা কানে না তুলিয়া বিপিন রাগে কাপিতে কাপিতে বলে, ছেলেমানুষি কোরো না মাধু। আমার সঙ্গে এস।

মহেশ তাড়াতাড়ি সায় দিয়া বলে, যাও মা, যাও। বিপিনবাবুর সঙ্গে যাও।

মহেশ চৌধুরী ফোড়ন না দিলে হয়তো মাধবীলতার উদ্ধত ভাবটা ধীরে ধীরে নরম হইয়া আসিত। বিপিনের সংযমহারা রাগ দেখিতে ভিতরে ভিতরে তার যেন কেমন ভাল লাগিতেছিল। সেদিন রাত্রে কথ্য মাধবীলতার মনে পড়িয়া গিয়াছে, বিপিন যখন তাকে মহেশ চৌধুরীর বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছিল। সে রাত্রে স্মৃতি ভুলিবার নয়, মাধবীলতা ভুলিয়াও যায় নাই। হঠাৎ তার খেয়াল হইয়াছে, সে রাতে বিপিন তার সঙ্গে যে আশ্চর্য ব্যবহার করিয়াছিল, তার মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সে যেখানে যাইতে চায় পাঠাইয়া দিবে, তাকে বাড়ি কিনিয়া দিবে, তার নামে ব্যাংকে টাকা রাখিবে, মাঝখানে কয়েকদিনের ছেদ দিয়া আজ দিনের আলোয় বিপিন যেন সেই ব্যবহারেরই জের টানিয়া চলিয়াছে। তফাত কেবল এইটুকু যে, মাঝখানের সময়টাতে সে যেন সত্য সত্যই নিঃসন্দেহে বিপিনের হইয়া গিয়াছে। বিপিনের রাগ আর ধমক দিয়া জোর গলায় কথা বলার মধ্যে পর্যন্ত মাধবীলতা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে বিপিন। জোর খাটাইতেছে আত্মীয়তার, অন্য কিছু নয়। সে যেন বিপিনের মেয়ে বা বৌ বা ওইরকম একটা কিছু।

কিন্তু মহেশ চৌধুরী ফোড়ন কাটায় এতগুলি মানুষের সামনে বিপিনের ব্যবহারে মেজাজটা তার চড়িয়াই যাইতে থাকে। সকলের সামনে এভাবে শাসন করিতে গেলে মেয়ে বা বৌও চটিয়া যায় বৈকি!

মাধবীলতা বিভূতির সামনে গিয়া দাঁড়াইল, বিপিনের দিকে পিছন ফিরিয়া।

চলুন আমরা ফিরে যাই বিভূতিবাবু। যাবেন?

আমার ওখানে একবার আসবে না মাধু?—সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিল।

মহেশ সঙ্গে সঙ্গে বলিল, যাও মা যাও, প্রভুর মন্দিরে একবার যাও।

মাধবীলতা জবাব দিল না।

বিভূতি এতক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। মাধবীলতাকে সঙ্গে করিয়া সে বাড়ির দিকে রওনা হওয়ার উপক্রম করে, সকলে দাঁড়াইয়া থাকে কাঠের পুতুলের মতো। বিভূতি অস্বীকার করিয়াছে। প্রণাম করিতে, মাধবীলতা ফিরিয়া চলিল আদেশ অমান্য করিয়া। চারিদিকে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে নাকি সদানন্দের বিরুদ্ধে আশ্রমে দাঁড়াইয়া সদানন্দকে এভাবে অপমান আর অমান্য করা। দাঁতের বদলে রত্নাবলীর চোখ দুটি চকচক করে। শশধর বোকার মতো হাঁ করিয়া থাকে। কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া বিপিন অসহায় ক্রোধ দমন করার জন্য একটা বিড়ি ধরায়। সদানন্দের ভীতিকর গান্ধীর্ষ ঘনীভূত হইয়া আসে। বিপিন আর সদানন্দ দুজনের মনেই প্রায় এক ধরনের অদম্য ইচ্ছা জাগে ছুটিয়া গিয়া মাধবীলতাকে বগলদাবা করিয়া বিভূতিকে আখালিপাখালি প্রহার করা।

মহেশ ডাকে, বিভূতি।

বিভূতি দাঁড়ায় এবং মুখ ফিরাইয়া তাকায়। মাধবীলতা দাঁড়ায় কিন্তু মুখ ফিরায় না।

মহেশ বলে, এখানে এস।

বিভূতি কাছে আসে এবং হাই তোলে। মাধবীলতা সঙ্গে আসে কিন্তু মুখ নিচু করিয়া থাকে।

মহেশ বলে, প্রভুকে প্রণাম কর।

সদানন্দ বলে, তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ মহেশ।-সদানন্দের গলা কাঁপিয়া যায়।

মহেশ হাত জোড় করিয়া বলে, বাড়াবাড়ি প্রভু? ও যদি আপনাকে এখন প্রণাম না করে, আমার যেদিকে দুচোখ যায় চলে যেতে হবে প্রভু!

সদানন্দ বলে, তাই যাও তুমি, বজ্জাত কোথাকার।

মহেশ তখনো হাত জোড় করিয়া বলে, ওকে প্রণাম না করিয়ে কেমন করে যাব প্রভু?

সদানন্দ বাক্যহারা হইয়া থাকে। মহেশ বলে, বিভূতি, প্রণাম কর প্রভুকে।

বিভূতি নড়ে না। সদানন্দ আগাইয়া গিয়া সশব্দে মহেশের গালে বসাইয়া দেয় এক চড়।

কিছুদূরে চালার নিচে আশ্রমের অধিকাংশ নরনারী জমা হইয়াছিল; দু-চারজন করিয়া তখনো আসিয়া জুটিতেছিল। সদানন্দ আজ আত্মজ্ঞানলাভের প্রক্রিয়ায় ব্রহ্মচর্যের স্থান সম্বন্ধে উপদেশ দিবে। সকলে নিঃশব্দে সদানন্দের প্রতীক্ষা করিতে করিতে কাঠের গুড়িটার কাছে এদের লক্ষ্য করিতেছিল। ততদূর হইতে কথা বোঝা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু সকলের চলাফেরা আর অঙ্গভঙ্গির নির্বাক অভিনয় দেখিয়া বেশ অনুমান করিতে পারিতেছিল যে, রীতিমতো একটি ব্যাপারই ঘটতেছে। সদানন্দ আগাইয়া গিয়া মহেশ চৌধুরীর গালে যে চড় বসাইয়া দিয়াছে, এটা তারা স্পষ্টই দেখিতে পাইল। হঠাৎ একটা জোরালো গুঞ্জনধ্বনি উঠিয়া আবার তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল।

সদানন্দ সকলের আগে একবার চাহিয়া দেখিল চালার দিকে। অনেক সাক্ষীর সামনেই মহাপুরুষ সদানন্দ সাধু মহেশ চৌধুরীকে মারিয়া বসিয়াছে বটে। এখন কেবল ঘটনাটা সকলের চোখে পড়িল, পরে বিস্তারিত বিবরণ শুনিবে।

রত্নাবলীর চোখ আর পাঁত দুই-ই তখন চকচক করিতেছে। মাধবীলতা অস্ফুট শব্দ করিয়া মুখের মধ্যে পুঁজিয়া দিয়াছে ডান হাতের চারটি আঙুল ছেলেবেলায় মাধবীর এই অভ্যাসটা ছিল, বড় হইয়া কোনোদিন এভাবে সে মুখে আঙুল ঢুকাইয়া দেয় নাই।

থমত খাইয়া গিয়াছিল সকলেই, কিন্তু দেখা গেল অবাধ্য বিভূতি বাপের অপমানের প্রতিকার করিতে বড়ই চটপটে। মহেশ চৌধুরীর মোটা বাঁশের ছড়িটি কাঠের গুড়িতে ঠেস দিয়া রাখা ছিল। চোখের পলকে লাঠিটা তুলিয়া নিয়া সে সদানন্দের দিকে আগাইয়া আসিল। দেশের জন্য মানুষ খুন। করার কেবল পরামর্শ করার জন্য এতগুলি বছর সে আটক থাকিয়া আসিয়াছে, আজ বাপের জন্য হয়তো সত্য সত্যই মানুষ খুন করিয়া বসিত। বাধা দিল মহেশ।

ছি বিভূতি, ছি।

বিভূতির হাতের লাঠি ছিনাইয়া নিয়া সদানন্দের পদতলে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মহেশ চৌধুরী তার মাথা গুজিয়া দিল।

আপনাকে রাগিয়েছি, আমায় মাপ করুন প্রভু। ছেলে আমার আপনাকে লাঠি নিয়ে মারতে উঠেছিল, আমায় মাপ করুন প্রভু।

প্রায় আত্ননাদ করার মতো চিৎকার করিয়া বিভূতি বলিল, তোমার কি লজ্জাশরম নেই বাবা?

কি বকছিস্ তুই পাগলের মতো? প্রণাম কর বিভূতি, প্রভুকে প্রণাম কর। ও বিভূতি, শিগগির প্রণাম কর প্রভুকে। আমি না তোর বাপ বিভূতি? আমার দেবতাকে মারবার জন্য তুই লাঠি তুলেছিস, হাত যে তোর খসে যাবে রে, কুষ্ঠ হবে যে তোর হাতে! শিগগির প্রণাম কর বিভূতি, প্রভুকে শিগগির প্রণাম কর।

পাগল হইয়া গিয়াছে মহেশ চৌধুরী? বিভূতি সভয় বিস্ময়ে সদানন্দের পদতলে বাপের সর্বাঙ্গীণ আত্মোৎসর্গ চাহিয়া দেখে আর তার অভিনব মন্তোচ্চারণ শুনিয়া যায়।

মাধবীলতা কানের কাছে ফিসফিস করিয়া বলে, প্রণাম করে নিন। তারপর ওঁকে নিয়ে বাড়ি যাই চলুন।

বিভূতি একটু ইতস্তত করিয়া সদানন্দকে প্রণাম করিবার জন্য আগাইয়া যায়। মহেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সদানন্দের পা দুটিকে মুক্তি দেয়। হাত জোড় করিয়া নিবেদন জানায়, প্রভু, আশীর্বাদ করুন, ছেলের যেন আমার সুমতি হয়।

## ৯. বিকালে মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে

বিকালে মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে সকলে পিঠা খাইতে বসিয়াছে। খাওয়ার জন্য বিভূতির লুন্ধ ব্যাকুলতা দেখিয়া তার মার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। ছেলে বাড়ি ফেরার পর বিভূতির মা আজকাল কেবল নানা রকম খাবারই তৈরি করে। বিভূতি খাইতে পারে না, সামান্য কিছু খাইলেই তার পেট ভরিয়া যায়। দুর্ভিক্ষপীড়িতের মতো উগ্র খাওয়ার লোভের তার তৃপ্তি হয় না। তার চাহনি দেখিয়া কত কথাই যে মাধবীলতার মনে হয়। হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া মাথায় সে একটা বাঁকুনি দেয়।

ভিতরের চওড়া বারান্দায় অর্ধচন্দ্রাকারে সকলে বসিয়াছে, মুখোমুখি হওয়ার সুবিধার জন্য। বৈকালিক জলখাবার শেষ হইতে কোনো কোনোদিন দুঘণ্টা সময়ও লাগিয়া যায়। রাজ্যের কথা আলোচনা হয় এই সময়। আজ কথাবার্তা তেমন জমিতেছিল না। সকালের ঘটনায় একমাত্র মহেশ চৌধুরী ছাড়া সকলেই কম-বেশি অস্বস্তি বোধ করিতেছে।

হঠাৎ বিভূতি বলিল, আচ্ছা বাবা, তুমি পাগল হয়ে গেছ?

মহেশ চৌধুরী হাসিয়া বলিল, কে আগে কথা তোলে দেখছিলাম। পাগলামি মনে হয়েছে। তোদের, না? কেন বল তো? পাগলের কথা, কাজ, কোনো কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না, আমি

তো খাপছাড়া কিছু বলিও নি, কিছু করি নি।

বল নি? কর নি?

না। আমি আবোল-তাবোল কথা কোনোদিন বলি না, খাপছাড়া কাজ করি না। মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যেতে পারে, তা সেটা সবারই হয়।

এরকম অহঙ্কার তো কখনো দেখি নি তোমার! নিজেকে প্রায় মহাপুরুষে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছ।

মহেশ চৌধুরী মাথা নাড়িল, তা করি নি, একটা সোজা সত্য কথা বলেছি। তোর অহঙ্কার মনে হল কেন জানি? তোর সঙ্গে কথা বলবার সময় আমার মনে আছে তুই আমার ছেলে, কিন্তু আমার বিচার করার সময় তুই ভুলে যাচ্ছিস যে আমি তোর বাপ। কথাটা প্রভুকে বললে অন্যভাবে বলতাম শুনলে আমার বেশি বেশি বিনয় দেখে তুই চটে যেতিস, তখন তার খেয়াল থাকত যে আমি তোর বাপ, আর নিজের বাপের আত্মমর্যাদা, জ্ঞানের অভাব দেখে লজ্জায় দুঃখে অপমানে তোর মাথা হেঁট হয়ে যেত।

এভাবে মহেশ চৌধুরীকে বলিতে মাধবীলতা কখনো শোনে নাই। সে একটু বিস্ময়ের সঙ্গে মহেশ চৌধুরীর কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মহেশ চৌধুরী আবার বলিল, আত্মমর্যাদা বলতে তোরা কি বুঝিস জানিস? ফাঁকা গর্ব, গোয়াতুমি। মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষ ছাড়া তোদের আত্মমর্যাদা টেকে না, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের ঠোকাঠুকি লাগবে, দরকার হলে প্রকাশ্যেও হাতাহাতি হয়ে যাবে, লাঠি হাতে মারতে উঠবি, তবে তোদের আত্মমর্যাদা খাড়া থাকতে পারবে। কি বল মাধু তাই নয়?

মাধবীলতার মুখ ভর্তি ছিল, খাবারটা গিলিয়া কথা বলিতে হওয়ায় বড়ই সে লজ্জা পাইলকি জানি, ওসব বড় বড় দার্শনিক কথা ভালো বুঝি না।

মহেশ চৌধুরী হাসিয়া বলিল, বড় বড় দার্শনিক কথা আবার কখন বললাম? জানলে তো বলব! আচ্ছা, কথাটা বুঝিয়ে বলছি তোমাকে।

থাক না, আমার না বুঝলেও চলবে।

উঁহু, তা চলবে না। কথাটা তোমায় না বুঝিয়ে ছাড়ব না।

মহেশ চৌধুরীর একগুঁয়েমিতে মাধবীলতার হঠাৎ বড় হাসি পায়। মনে হয়, সে যদি কথাটা না বোঝে, সদানন্দের চরণদর্শনের জন্য একদিন যেমন ধন্য দিয়াছিল, আজ সকালে যেভাবে বিভূতিকে সদানন্দের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করাইয়াছে, তেমনি একটা কিছু কাণ্ড মহেশ চৌধুরী আরম্ভ করিয়া দিবে।

বুঝেও যদি না বুঝি?

মহেশ চৌধুরী শান্তভাবে বলিল, হেসো না, হাসতে নেই। বুঝবে বৈকি, বললেই বুঝবে। শোন বলি। সকালে বিপিনবাবুর সঙ্গে যে ঝগড়া করলে, মানুষটার মনে কষ্ট দিয়ে বাড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করলে, আত্মমর্যাদা বাঁচাবার জন্য তো? তুমি ভাবলে, বিপিনবাবুর সঙ্গে ভালোভাবে কথা বললে সবাই তোমাকে ভীষণ অপদার্থ মনে করবে, লোকের কাছে তোমার অপমান হবে। ব্যাপারটা কি বিশী দাঁড়িয়ে গেল বল তো? তুমিও উল্টেপাল্টে সারাদিন ওই কথাই ভাব, বিপিনবাবুও ভাবছেন। তোমাদের দুজনের মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি যদি হাসিমুখে দুটো মিষ্টি কথা বলতে, এক মুহূর্তে বিপিনবাবুর রাগ জল হয়ে যেত। তুমিও চাইছিলে ঝগড়া না হয়ে বিপিনবাবুর সঙ্গে ভাব হোক, বিপিনবাবুও তাই চাইছিলেন-আত্মমর্যাদা বাঁচাবার জন্য তোমাদের ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। তোমরা সকলকে হিংসা কর কিনা, তাই এমন হয়। নিজের যাতে কোনো ক্ষতি নেই, পরের জন্য সেটুকু ত্যাগও করতে পার না।

মাধবীলতা কথা বলিল না।

বিভূতি বলিল, গালে যে চড় মারে, তার পায়ে লুটিয়ে পড়ার চেয়ে ওরকম ঝগড়া ঢের ভালো।

মহেশ চৌধুরী বলিল, গালে চড় মেরেছেন, প্রভুর সঙ্গে আমার কি শুধু এইটুকু সম্পর্ক বিভূতি? আমি তো চিরদিন প্রভুর পায়ে লুটিয়ে আসছি? প্রভুকে যদি আগে থেকে দেবতার মতো ভক্তি না করতাম, আজ গালে চড় মারার পর মানুষকে আমার ক্ষমা আর সহিষ্ণুতা দেখাবার জন্য প্রভুর পায়ে ধরতাম, তা হলে অন্যায় হত। তার মানে কি দাঁড়াত জানিস?

আমি যেন প্রভুর চেয়ে বড়। কিন্তু প্রভুর সম্বন্ধে আমার অহঙ্কার নেই, দীনতা নেই, উদারতা নেই-আমি সোজাসুজি তাকে দেবতার মতো ভক্তি করি। গালে যখন উনি চড় মারলেন, আমি বুঝতে পারলাম উনি ভয়ানক রাগ করেছেন। আমার মনে বড় কষ্ট হল, তাই ওঁর পায়ে ধরলাম। উনি আমায় বড় ভালবাসেন বিভূতি-আমায় মারার জন্য না জানি মনে মনে কত কষ্ট পাচ্ছেন।

বিভূতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, মানুষের পক্ষে মানুষকে দেবতার মতো ভক্তি করা—

মহেশ চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে রায় দিয়া বলিল, উচিত নয়। মানুষ কখনো মানুষকে দেবতার মতো ভক্তি করে না। কিন্তু সংসারে কটা মানুষ আছে বল তো? যে মানুষ নয়, সে মানুষকে দেবতার মতো ভক্তি করবে না কেন বল তো? সবাই যদি মানুষ হত বিভূতি, পৃথিবীটা স্বর্গ হয়ে যেত।

এবারো বিভূতি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার কথা ঠিক নয় বাবা। একজন মানুষ আরেকজনকে দেবতার মতো ভয় ভক্তি করে বলেই সংসারে এত বেশি অমানুষ আছে-সবাই মানুষ হতে পারছে না। একজন মানুষের চাপে আরেকজন কুঁকড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে কথা থাক-আমাকে কেন তুমি জোর করে ওঁকে প্রণাম করালে? আমি তো এঁকে দেবতার মতো ভক্তি করি না। বরং—

মহেশ চৌধুরী তাড়াতাড়ি বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। তুই আমার ছেলে বলে তোকে প্রণাম করিয়েছি। তুই ভক্তি করিস বা না করিস সে কথা ভিন্ন, তোকে দিয়ে ওঁকে প্রণাম করাবার ক্ষমতা থাকতেও যদি প্রণাম না করাতাম, আমার পক্ষে অন্যায় হত। অন্য কাউকে তো আমি জোর করে। প্রণাম করাই না!

বিভূতি মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর হঠাৎ স্বয়ং সদানন্দ মহেশ চৌধুরীর বাড়ি আসিল।

সকলে ভাবিল, বুঝি সকালবেলা মহেশ চৌধুরীর গালে চড় মারার প্রতিবিধান করিতে আসিয়াছে। ভক্তকে সদানন্দ আজ অনেক আদর করিবে।

মহেশ চৌধুরী তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া বলিল, প্রভু?

সদানন্দ বলিল, মহেশ, বিপিন আমাকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই তোমার কাছে এলাম। তোমার বাড়িতে থাকব।

## ১০. এ কথা কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল

এ কথা কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল যে, সদানন্দ সাধুর আশ্রম হইতে সদানন্দ সাধুকেই তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। অন্য সকলের মুখের ভাব দেখিয়াই বোঝা গেল, কথাটা সত্যই কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই, কেবল মহেশের ভাব দেখিয়া মনে হইল না সে বিশেষ অবাক হইয়াছে। সে যেন এ রকম একটা কিছু প্রত্যাশাই করিতেছিল। বিস্ময় প্রকাশ করার বদলে সে দেখাইল রাগ!

বটে! বিপিনবাবুর স্পর্ধা তো কম নয়!

তারপর সদানন্দের সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাত জোড় করিয়া উর্ধ্বমুখে সদানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, আপনি আমার এখানে থাকবেন প্রভু? আমার এত বড় সৌভাগ্য হবে, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। আজ আমার জীবন সার্থক হল। এ বাড়ি আপনার, এ বাড়ির মেয়ে- পুরুষ আপনার দাসদাসী।

ব্যাপারটা কি হইয়াছে, কেন বিপিন হঠাৎ সদানন্দকে আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, এ ক্ষমতা বিপিন কোথায় পাইল, সকলের মনে এ ধরনের কত যে প্রশ্ন জাগিতেছিল হিসাব হয় না। কিন্তু সদানন্দকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সাহস কারো নাই। ভরসা না পাওয়ার জন্যই হোক অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, মহেশ চৌধুরীও এ বিষয়ে একেবারে মুখ বুজিয়া ছিল।

অন্য কেউ কথা তুলিবে ভাবিয়া মাধবীলতা একটু অপেক্ষা করে, তারপর খানিকক্ষণ ইতস্তত করিয়া বলিয়া বসে, আপনাকে তাড়িয়ে দিলেন কেন বিপিনবাবু?

সদানন্দ কিছু বলিবার আগেই মহেশ চৌধুরী বলে, কি যে তুমি বল মাধু? তাড়িয়ে আবার কে দেবে প্রভুকে? উনি রাগ করে চলে এসেছেন, তাও বুঝতে পার না?

সদানন্দ বলে, না মহেশ, বিপিন আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে।

মহেশ বলে, তাই কি হয় প্রভু! আপনাকে তাড়িবার ক্ষমতা কারো নেই।

সদানন্দ বলে, তা আছে বৈকি। আশ্রমটা বিপিনের সম্পত্তি। আমি আশ্রমের শিক্ষক হিসাবে ছিলাম, কবছরের মাইনে ছাড়া আর কিছু দাবি করতে পারব না। বিষয়বুদ্ধি তো নেই—

আপনার বুদ্ধির কাছে বিপিনবাবুর বিষয়বুদ্ধি! মহেশ চৌধুরী একগাল হাসে, কবিঘা মেঠো জমি বিপিনবাবুর নিজের নামে লিখে নিয়েছেন, আপনি জয় করেছেন মানুষগুলিকে। আশ্রম কখনো বিপিনবাবুর সম্পত্তি হতে পারে প্রভু? আপনাকে নিয়ে তবে তো আশ্রম। আপনি যেখানে থাকবেন। সেখানটাই হবে আশ্রম। আপনি যখন চলে এসেছেন, আপনার সঙ্গে আশ্রমও চলে এসেছে।

সজোরে নিশ্বাস ফেলিয়া গভীর আফসোসের সঙ্গে মহেশ আবার বলে, প্রথমটা রাগ হয়েছিল, এখন আবার বিপিনবাবুর জন্য মায়া হচ্ছে। বুদ্ধির দোষে মানুষ কি সর্বনাশটাই নিজের করে।

মহেশ চৌধুরী সদানন্দের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিল। মহেশ চৌধুরীর ঘরবাড়ি সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, ঘষামাজা, ধোঁয়া-মোছা নিয়া বিভূতির মা সব সময়েই ব্যস্ত হইয়া আছে। সবচেয়ে ভালো ঘরখানায় তাড়াতাড়ি সদানন্দের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। পিতামহের আমলের প্রকাণ্ড খাটে আনকোরা নূতন তোশক পাতা হইল— একটু ছোট হইল তোশকটা। তা হোক, লোকের ব্যবহার করা তোশক তো আর সদানন্দকে দেওয়া যায় না। তোশক ঢাকা পড়িল গায়ে দেওয়ার মুগার চাদরে। বালিশের বদলে দেওয়া হইল ঝালর দেওয়া তাকিয়া, কেবল বিশেষ উপলক্ষে আসর পাতা হইলে যেগুলি কাজে লাগে। ঘরের এক কোণে পড়িল ঘরে বোনা কার্পেটের আসন, দুপাশে

জ্বলিতে লাগিল ধূপধুনা আর কোণ ঘেষিয়া একটি মস্ত ঘি়ের প্রদীপ। অভ্যর্থনার আরো কত ছোট-বড় আয়োজনই যে মহেশ চৌধুরী করিল! কিছুকাল আগেও মহেশ চৌধুরীর বাড়ি ছিল নিস্তরু, মহেশ আর তার ভাগ্নে শশধর এবং তাদের দুজনের দুটি স্ত্রী চুপচাপ এ বাড়িতে দিনরাত্রি কাটাইয়া দিত, কারো মধ্যে যেন প্রাণ ছিল না। তারপর মাধবীলতা আসিয়াছে, বিভূতি আসিয়াছে, আজ আসিল সদানন্দ-মাধবীলতার পদার্পণের পর সেই যে একটু জীবনের সাড়া জাগিয়াছিল বাড়িতে, আজ যেন তা চরমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে বিশেষ একটি উৎসবে।

সকলের মধ্যে চাঞ্চল্য আসিয়াছে, মুখে ফুটিয়াছে কথা। একজন কেবল আগেও যেমন চুপচাপ ছিল, এখনো তেমনি চুপচাপ থাকিয়া গিয়াছে। সে শশধরের ঘোমটা-টানা বৌ। কোন ফাঁকে কখন বাড়ির কোন আড়াল হইতে আসিয়া সে যে সদানন্দের সামনে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল এবং আবার নিজের অন্তরালে চলিয়া গেল, কেউ খেয়ালও করিল কিনা সন্দেহ। শশধরের বৌ যে বাড়িতে থাকে, অধিকাংশ সময়ে তা টেরও পাওয়া যায় না।

মহেশ কেবল একবার একরাশি বাসন হাতে খিড়কি পুকুর যাওয়ার সময় উঠানের কোণে পিছন হইতে তাকে পাকড়াও করিয়া বলিল, বৌমা, তুমিই প্রভুর জন্য রান্না কোরো। চান করে

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যেমন করে ঠাকুরদেবতার ভোগ রান্না কর না, ঠিক তেমনি করে।

শশধরের বৌ মামাশ্বশুরের সঙ্গে কথা বলে না। ডাক শুনিয়া মহেশ চৌধুরীর দিকে পিছন করিয়াই সে থমকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক সেই অবস্থাতেই ঘোমটার মধ্যে মাথা নত করিয়া সে নীরবে সায় দিল। মহেশ চৌধুরী সরিয়া গেলে আর কিছু বলিবার নাই জানিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল খিড়কির পুকুরের দিকে।

তারপর মহেশ জিজ্ঞাসা করিতে গেল, শশধরের বৌ স্নান করিয়া ভোগ রান্না করিয়া দিলে সদানন্দের আপত্তি নাই তো?

সদানন্দ বলিল, বাড়াবাড়ি কোরো না মহেশ, বাড়াবাড়ি কোরো না।

মহেশ বলিল, না প্রভু।

সকলের জন্য যা রান্না হবে, আমিও তাই খাব। আমার ওসব নেই জান তো?

আপনি অনুমতি দিলে একটু বিশেষভাবেই রান্নাটা করাই প্রভু। আশ্রমের কথা আলাদা, এখানে-

সদানন্দ হাসিয়া বলিল, তুমি আমায় টিকতে দেবে না মহেশ।

মহেশও হাসিয়া বলিল, আপনাকে আমি আর ছাড়ব না প্রভু, আজ থেকে আপনি আমার হয়ে গেলেন।

অন্য কেহ হইলে হয়তো এ কথার জবাবে তামাশা করিয়া বলিত, আজ তোমার সম্পত্তি হয়ে গেলাম মহেশ? কিন্তু ওসব রসিকতা সদানন্দের আসে না। মহেশ যে তাকে সত্য সত্যই স্থায়ীভাবে এখানে আটকাইয়া ফেলিবার বিরাট আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, সদানন্দের এটা যেন ভালো লাগিতেছিল না। বিপিন একবার রাগ করিয়া আশ্রম হইতে একদিনের জন্য কিছু না বলিয়া যখন চলিয়া গিয়াছিল, আশ্রমের পাশের আমবাগানটি যেবার সে বাগাইয়া আনে, তখন বিপিনের জন্য তার কি রকম মন কেমন করিয়াছিল, সদানন্দের মনে আছে। আজ নিজে রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াও তার তেমনি মন কেমন করিতেছে। সেবার যেমন কেবলই মনে হইত বিপিন ফিরিয়া আসিবে, আজ তেমনি আশা হইতেছে বিপিন হয়তো ডাকিতে আসিবে, হাতে-পায়ে ধরিয়া তাকে ফিরাইয়া নিয়া যাইবে।

মহেশ চৌধুরী বলে, আশ্রম থেকে আপনার জিনিসপত্র সব আনিয়ে নিই প্রভু?

সদানন্দ বারণ করিয়া বলে, না, না, এখন থা। তাড়াতাড়ির কি আছে।

জন্মের মতো আশ্রম ত্যাগ করিয়া সদানন্দ চলিয়া আসিয়াছে, বলিয়া আসিয়াছে জীবনে আর কোনোদিন বিপিনের জমিদারিতে আর সে পা দিবে না। আশ্রমের সঙ্গে আর তার কিসের সম্পর্ক? তবু তার নিজস্ব জিনিসপত্রগুলি যতক্ষণ আশ্রমে আছে, একটু যেন যোগাযোগ বজায় রহিয়াছে ততক্ষণ আশ্রমের সঙ্গে, ওই যোগাযোগটুকুও ঘুচাইয়া ফেলিতে সদানন্দের ইচ্ছা হয় না। তাছাড়া, সদানন্দের একটু ভয়ও হয়। জিনিসপত্রগুলি আনাইয়া নিলে বিপিন যদি আরো রাগিয়া যায়, তাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া নিয়া যাওয়ার সাধ থাকিলেও যদি ওই কারণেই সে মতটা বদলাইয়া ফেলে।

মহেশ চৌধুরীও বোধহয় এসব কথা অনুমান করিতে পারে। সদানন্দের আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের পথে আরো একটু বাধা সৃষ্টি করিতে তার আগ্রহ দেখিয়া অন্তত তাই মনে হয়। জিনিসগুলি আনাইবার অনুমতি পাওয়ার জন্য সে পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। পরে আনাইলেও অবশ্য চলিবে, কিন্তু এখন আনাইলেই বা দোষ কি? এক মুহূর্তের জন্যই বা সদানন্দ সামান্য একটু অসুবিধা ভোগ করিবে কেন। মহেশের তো তা সহ্য হইবে না।

কিন্তু সদানন্দ কিছুতেই অনুমতি দেয় না। বলে, আজ থাক মহেশ। কাল যা হয় করা যাবে।

বিপিন তাকে হাতে-পায়ে ধরিয়া ফিরাইয়া নিতে আসিবে, সদানন্দের এরকম আশা করার। একটু কারণ ছিল। বিপিন সত্যই তাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। সহজ ভাষায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে, আমার আশ্রম ছেড়ে চলে যাও।

সদানন্দ রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। তাকে এভাবে তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য বিপিনের মন। খারাপ হওয়া আশ্চর্য নয়, তাকে ফিরাইয়া নিতে আসাও আশ্চর্য নয়।

সেদিন সকালে বিপিনের বিনা অনুমতিতে মাধবীলতার আশ্রমে আসা এবং সদানন্দের পায়ে বিভূতিকে প্রণাম করানো নিয়া যে কাণ্ডটা হইয়া গিয়াছিল, তারপর সারাদিন বিপিন আর সদানন্দের দেখা হয় নাই।

অনেক রাত্রে বিপিন সদানন্দের ঘরে আসিয়াই বলিয়াছিল, সদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম তোকে। আগের মতো আমার কথা শুনে চলবি কি চলবি না তুই?

আমি কি তোর মাগনায় কেনা চাকর যে, তোর সব হুকুম মেনে চলব?

ওসব বাজে কথা থাক। তোর সঙ্গে কোনোদিন আমি ওরকম ব্যবহার করি নি, সে সম্পর্ক আমার নয় তোর সঙ্গে। আমার কথা শুনে চলা মানে আমার হুকুম মেনে চলা নয়। নিজেই ভেবে দ্যাখ, আমি বুদ্ধি খাঁটিয়ে আশ্রমের উন্নতির ব্যবস্থা করব, তুই আমার একটা কথা মানবি, একটা কথা মানবি না, তাহলে কি আশ্রম চলে? আশ্রমের জন্য তোক দরকার আছে, কিন্তু আশ্রম চালাবার ক্ষমতা তোর নেই, তুই যদি

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। আসল কথাটা শুনি?

বিপিন একটু চুপ করিয়া থাকিয়াছিল। রাগ করিবে না এবং তর্ক করিবে না ঠিক করিয়াই সে এখন সদানন্দের কাছে আসিয়াছে, কিন্তু আজকাল কথায় কথায় সদানন্দের সঙ্গে তর্ক করিতে ইচ্ছা। হয়, ঝগড়া করিবার সাধ জাগে।

আসল কথাটা এই। আগে যেমন সব বিষয়ে আমার কথা শুনে চলতিস, তেমনিভাবে যদি না চলিস, তোকে দিয়ে আমার কাজ হবে না।

না হলে কি করব?

তোকে বিদেয় দেব।

বিদেয় দিবি! তোর তো স্পর্ধা কম নয়। তোকে কে বিয়ে দেয় ঠিক নেই—

আমার আশ্রম থেকে আমাকে কে বিদেয় দেবে?—বিপিন হাসিয়াছিল।

সদানন্দ সগর্বে বলিয়াছিল, আমি একটা মুখের কথা বললে সবাই তোকে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলবে, তা জানিস?

বিপিন নির্বিকারভাবেই বলিয়াছিল, বলেই দ্যাখ না মুখের কথাটা?

কথাটার ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। সদানন্দ হুকুম দিলেও আশ্রমের কেউ বিপিনের বিরুদ্ধে যাইবে না। এ বিষয়ে সদানন্দের মনেও বরাবর একটা খটকা আছে। সকলে তাকে ভক্তি করে বটে, কিন্তু সাধুতার মধ্যে যেমন ফাঁকি আছে, সকলের ভক্তির মধ্যেও তেমনি একটা ফাঁকি আছে বলিয়া সদানন্দের সন্দেহ হয়।

বিপিন একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিয়াছিল, তুই বড় বোকা সদা। সবাই টিপটিপ করে প্রণাম করে, আর তুই ভাবি তোর জন্য প্রাণ দিতে সবাই ছটফট করছে। প্রাণ পাওয়া অত সহজ নয় রে! আমি তোকে ভড়ং শিখিয়েছি, সেই ভড়ং করে লোকের মনে তুই জন্মিয়েছিস একটা ভয়। তুই থাকিস একটা ধোঁয়ার আড়ালে, তোর সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না, সকলের সামনে মহাপুরুষের মতো চলিস ফিরিস, সবাই তাই তোকে মহাপুরুষ ভেবে রেখেছে। কল্পনা-জগতের অবাস্তব প্রমাণ দেখিয়ে দেখিয়ে তোক আমার মহাপুরুষ দাঁড় করাতে হয়েছে। তুই যে মহাপুরুষ নোস, তার একটা বাস্তব প্রমাণও কেহ যাতে না পায়, সেইজন্যই তোকে আমার লুকিয়ে রাখতে হয়। সকলে। তোকে কি রকমের ভয় ভক্তি করে জানিস? কাল যদি আমি রটিয়ে দিই তোর অত্যাচারে মাধুকে আশ্রম ছাড়তে হয়েছে, সবাই তাই বিশ্বাস করে বসবে। মাধুকে নিয়ে কয়েকটা যে বোকামি করেছি, সেগুলি হবে তার বাস্তব প্রমাণ। এত বড় সাধু তুই, কিন্তু তোর সাধুত্বের বাস্তব প্রমাণ নেই কিনা, তাই মাধুর সম্বন্ধে তোর বোকামির ওই কটা তুচ্ছ প্রমাণেই তোর সাধুত্ব ফেঁসে যাবে।

মাধুকে নিয়ে কি বোকামি করেছি?

জানিস না? তা নাও জানতে পারিস! চোর কি করে জানিস, যখন দরকার নেই তখন বেশি বেশি সাধু বনে থাকে, আর চুরি করার সময় ভাবে কেউ জানতে পারছে না। তবু চোর ধরা পড়ে জেলে যায়। আজ সকালেই তো সকলের সামনে কেঁদে কেঁদে বললি, একবার আমার ঘরে আসবে না মাধু? আহা, একটা মেয়ের কাছে কি করুণ মিনতি মহাপুরুষ সদানন্দে! মাধু মুখ ফিরিয়া পটগট করে চলে গেল। কথাটা কেউ মনে আনছে

না তাই, কিন্তু একবার যদি কেউ সুর তোলে, কারো দুবার ভাবতে হবে না কিসের মানে কি।

এবার সদানন্দ রাগ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, বিপিনের মনটাই কদর্য। কতদূর কদর্য, লাগসই উপমা দিয়াও বুঝাইয়া দিয়াছিল। বিপিন যা ভাবে, কেউ তা ভাবিবে না। সকলে তো বিপিন নয়, বিপিনের মতো কুৎসিত মন তো নয় সকলের, বিপিন যেমন বড়লোকের পা-চাটা, ফন্দিবাজ, হীন, বিশ্বাসঘাতক মানুষ-

তিন দিনের মধ্যে তুই আমার আশ্রম ছেড়ে চলে যাবি। আমি যা-ই হই, আশ্রমের কুটোটি পর্যন্ত আমার, তা মনে রাখিস। তুই সত্যি আমার চাকর-তাকে থাকবার কোয়ার্টার দিয়েছি, খেতে পরতে দিয়েছি, চাইলে মাইনে বাবদ কিছু টাকা পাবি, ব্যস। আর কোনো কিছুর অধিকার তোর নেই।

আচ্ছা, রাজাসায়েবের সঙ্গে সে বোঝাপড়া হবে।

রাজাসায়েব? রাজাসায়েব কি করবেন? দুদিন আগে রাজাসায়েবের যা খুশি করার ক্ষমতা ছিল, এখন আর নেই। এখন সমস্ত কিছুর মালিক আমি। তুই কি ভাবিস সেবার গিয়ে আমি শুধু আমবাগানটা বাগিয়ে এনেছি? সব নিজের দখলে এনেছি। টাকা-পয়সার মালিক তো ছিলাম প্রথম থেকেই, এবার জমিজমারও মালিক হয়েছি। কি করবেন বল রাজাসায়েব, কবিঘা জমির জন্য ছেলেকে তো আর জেলে পাঠাতে পারেন না।

জেল!

আমি না বাঁচিয়ে দিলে, মাধুর জন্য নারাণবাবুর জেল হত বৈকি।

ও!

সদানন্দ চুপ করিয়া ছিল অনেকক্ষণ। আশ্রমের আয়ে প্রথম থেকে তোর অধিকার ছিল?

ছিল বৈকি। আমার নামে আশ্রম হল, আশ্রমের আয় আমার হবে না? লোকসান হলেও অবশ্য আমার ঘাড়ে চাপত। প্রথমে কজনকে নিয়ে কতটুকু আশ্রম হয়েছিল মনে আছে সদা? তখন তোরা ভাবতেও পারিস নি একদিন আশ্রম এত বড় হবে-দিন-রাত কেবল কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করতিস, আশ্রম চলবে না, আশ্রম চলবে না। রাজাসায়েবও আশ্রমের এ রকম উন্নতির কথা ভাবতে পারেন নি, তাই প্রথম দফায় অল্প জমি আমাকে একেবারে দান করে দিয়েছিলেন। পরের দফায় যখন জমি দিলেন, তখন করলেন কি জানিস, এত সব অধিকার চেয়ে বসলেন যে, আশ্রয় নিয়ে যা খুশি করতে পারেন। আমি তাতেই রাজি হয়ে গেলাম। জানতাম, একদিন সমস্ত ক্ষমতা আবার আমার হাতেই ফিরে আসবে।

এক মুহূর্তের জন্য বিপিন থামিয়াছিল, তারপর আবার বলিয়াছিল, এসব কথা তোকে বলতাম। না, তোকে আর রাখা চলবে না বলেই বললাম। আমার আশ্রম ছেড়ে তুই চলে যা ভাই, দোহাই তোর। গোলমাল তুই করতে পারি, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না, যেতে তোকে হবেই। গোলমাল না করে যদি চলে যাস, আশ্রমের লাভের একটা ভাগ বরং তোকে দেব, যতই হোক, এতদিন তো তুই আশ্রমের উন্নতিতে সাহায্য করেছি, কিছু দাবি তোর আছে। ওই টাকায় যেখানে খুশি নিজের একটা ছোটখাটো আশ্রম তুই খুলতে পারবি।

রাত্রি বাড়িবার জন্যই ঘরের আলোটার জ্যোতি যেন একটু ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছিল। দুজনে চুপ করিয়া থাকিয়াছে। বিপিন একবার ভালো করিয়া মুখখানা দেখিয়াছে। সদানন্দের, সদানন্দ একবার ভালো করিয়া মুখখানা দেখিয়াছে বিপিনের। ব্যাপারটা গুরুতর, তাই তারা ভিন্ন কে বুঝিবে কি গুরুত্ব সেই দেখার! দুজনে তারা বন্ধু, বন্ধুর মধ্যে ছাড়া এমন ব্যাপার। ঘটে না, এ রকম বিচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় না। সদানন্দ কি বলিত অনুমান করা কঠিন, বিপিন একটা খাপছাড়া কথা বলিয়া বসায় সে আর মুখ খোলে নাই।

আরো একটা জিনিস তোকে দিলাম সদা। মাধুকে তুই নিস। ওকে দিয়ে আমার আর দরকার নেই।

বিপিনের শেষ কথাটার কোনো মানে হয়? মাধবীলতাকে সে দান করিয়া দিল, মাধবীলতা যেন তার সম্পত্তি! আশ্রমটা সম্পূর্ণরূপে নিজের দখলে আনার জন্য এতদিন মাধবীলতাকে তার দরকার ছিল, এখন আর দরকার নেই, তাই বন্ধুকে দিয়া দিয়াছে! কেমন লাগে কথাটা ভাবিতে? মনটা কি রকম জ্বালা করে? কে বলিয়াছে বিপিনকে, মাধবীলতাকে তার দরকার আছে?

তবু বিপিনের কথার একটা ইঙ্গিত নিন্দনীয় অভিপ্রায়ের ধারাবাহিক অবাধ্যতার মতো মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়ায়। মাধবীলতাকে নিয়া সদানন্দ এবার যা খুশি করিতে পারে, বিপিনের দিক হইতে এতটুকু বাধার সৃষ্টি হইবে না। মাধবীলতাকে বিপিন আশ্রমে আনিয়াছিল কিন্তু ওর সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব তার শেষ হইয়া গিয়াছে। হয়তো এতটুকুই ছিল বিপিনের আসল বক্তব্য। মাধবীলতার সম্বন্ধে বন্ধুকে অভয় দেওয়া।

মহেশ যখন সদানন্দকে তার ঘরে একা বিশ্রাম করিবার সুযোগ দিয়াছে, সকলকে বারণ করিয়া দিয়াছে ঘরে যাইতে, তখন মাধবীলতা আসিয়া হাজির হয়।

ব্যাপার কি বলুন তো?

এস মাধু। বোসো।

বসছি, কিন্তু ব্যাপারটা কি হল?

ব্যাপার আর কি হবে, ঝগড়া করে চলে এলাম। ও রকম স্বার্থপর ছোটলোকের সঙ্গে মানুষের পোষায়? এতদিন সহ্য করেছিলাম, আর সহ্য হল না।

মাধবীলতা মুখ গম্ভীর করিয়া বলে, আপনাদের দিয়ে কোনো ভালো কাজ হতে পারে না। খালি নিজেদের মধ্যেই মারামারি করবেন তো কাজ হবে কি। ডি ছি, নিজের নিজের স্বার্থচিন্তাই যদি করবেন দিন-রাত, এসব কাজে কেন আসেন আপনারা?

সদানন্দ গম্ভীরভাবে একটু হাসিয়া বলে, স্বার্থচিন্তাই যদি করতাম মাধু, আশ্রম ছেড়ে আজ চলে আসতে হত না। বিপিনের বদলে আশ্রমটা আমিই দখল করতাম।

পারলে তা করতেন।

মাধবীর মন্তব্যে সদানন্দ রাগ করিয়া বলে, আমাকে কি তুমি বিপিনের মতো অপদার্থ ভাব?

বিপিনবাবুকে আমি অপদার্থ ভাবি না।

মহাপুরুষ ভাব বুঝি?

সদানন্দের ব্যঙ্গের জবাবে মাধবীলতাও ব্যঙ্গ করিয়া বলে, বিপিনবাবু কেন মহাপুরুষ হবেন, মহাপুরুষ তো আপনি!

মাধবীলতা আর সে মাধবীলতা নাই। সদানন্দের কাছে সব রকম চাপল্য হারাইয়া আর সে। জড়োসড়ো হইয়া যায় না, ভয়ে ভয়ে হিসাব করিয়া কথা বলে না, অনায়াসে ব্যঙ্গ করে। মাধবীলতার সঙ্গে সদানন্দের ব্যবহারও অবশ্য বদলাইয়া গিয়াছে। বাহিরের সকল ভক্তের সঙ্গে আলাপ করার অভ্যস্ত ভঙ্গিতেই প্রথম প্রথম সে মাধবীলতার সঙ্গে আলাপ করিত, মাঝে মাঝে সব গোলমাল হইয়া যাইত বটে, কিন্তু তাও যেন ছিল ছেলেমানুষি ভাবপ্রবণতার আবরণে মানবীকে দেবতার প্রশ্ন দেওয়া, দেবতার বাড়াবাড়ি অন্তরঙ্গতার জবাবেও যাতে মাথা তুলিবার সাহস মানবীর হয় না। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে মাধবীলতার সঙ্গে আলাপ করাটা তার নামিয়া গিয়াছে বিপিনের সঙ্গে আলাপ করার স্তরে।

মাধবীর আগের মন্তব্যে সদানন্দ রাগ করিয়াছিল, এবারকার ব্যঞ্জে হাসিয়া বলে, তোমার কাছে তাই বটে। আমাকে মহাপুরুষ না ভেবে তো তোমার উপায় নেই।

কেন?

তোমাকে যে তাহলে দ্বিচারিণী হতে হবে।

মুখ মাধবীর লাল হয় না, বিবর্ণ হইয়া যায়। ধীরে ধীরে উঠিয়া সে বাহিরে চলিয়া যায়।

সদানন্দ নিচু গলায় ব্যথভাবে বলে, রাগ করলে মাধু? মোন, শুনে যাও—

কিন্তু মাধবীলতা আজকাল বড়ই অবাধ্য হইয়াছে, কোনো কথাই শুনতে চায় না।

সদানন্দ যতই আশা করুক, বিপিন তো আসেই না, আশ্রম হইতে কোনো শিষ্যও আসে না। সদানন্দ কারো কাছে কিছু বলিয়া আসে নাই, আশ্রমের শিষ্যদের কিছু জানাইবার কথা ভাবিতেও তার সঙ্কোচ হইতেছিল। বিপিন তাদের কি বুঝাইয়াছে, সেই জানে। হয়তো আশ্রমের কেউ এখনো জানিতেই পারে নাই, সদানন্দ চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে অথবা সদানন্দ বাগবাদায় মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে গিয়া উঠিয়াছে। হয়তো বিপিন তাদের বুঝাইয়াছে, সদানন্দ বিশেষ কারণে কিছুদিন মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে বাস করিতে গিয়াছে, তাকে গিয়া কারো দর্শন করা বারণ। বিশেষ কারণটাও হয়তো বিপিন সকলকে ইঙ্গিতে জানাইয়া দিয়াছে। মাধবীলতার আকর্ষণ।

মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে আসিয়া উঠিলে বিপিন যে এমন একটা ইঙ্গিত করার সুযোগ পাইবে, এখানে আসিবার আগে সদানন্দের সেটা খেয়াল হয় নাই। যাই হোক, এখন নানাভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথাটা সে ভাবে। মাধবীলতা এখানে আসিবার কয়েকদিন পরে সেও আসিয়া হাজির হইয়াছে, মাধবীলতার সঙ্গে তার নাম জড়াইয়া কলঙ্ক রটানোর পক্ষে এ একটা জোরালো যুক্তিই বটে। ভাবিতে ভাবিতে মাথা গরম হইয়া উঠিলে এই বলিয়া সদানন্দ নিজেকে সান্ত্বনা দেয় যে, বিপিন কি বলিয়াছে কি বলে নাই না জানিয়া

নিজের মনের অনুমান নিয়া বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ হয় না। হয়তো ক্ষতিকর কিছুই বিপিন বলে নাই, সদানন্দের অন্তর্ধানের একটা সাধারণ ও সঙ্গত কারণই সকলকে জানাইয়াছে। আর যদি সত্য সত্যই তাকে ফিরাইয়া নিয়া যাওয়ার ইচ্ছা বিপিনের জাগিয়া থাকে, তবে হয়তো সেই সঙ্গে এ কথাও সকলকে জানাইয়া দিয়াছে যে, কয়েকদিন পরেই সাধুজী আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

আশ্রমের কেউ না আসুক, আশপাশের গ্রামের নরনারী দলে দলে সদানন্দকে দর্শন ও প্রণাম করিতে আসে। প্রথমে ঝোঁকের মাথায় সদানন্দ এখানে সকলের কাছে নিজের আশ্রমত্যাগের ভিতরের ব্যাপারটা ঘোষণা করিয়া ফেলিয়াছিল, তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া মহেশ চৌধুরীকে বলিয়া দিয়াছে, কথাটা কয়েকদিন যেন বাহিরে প্রকাশ না পায়।

এখন সকলকে জানিও, আমি এমনি কয়েকদিন তোমার এখানে থাকতে এসেছি।

প্রভু?

সদানন্দ বুঝিতে পারিয়াছে।

না, মিথ্যে কথা তোমায় বলতে বলি নি মহেশ। তোমরা যে জান আমি কেন আশ্রম ছেড়ে এসেছি, এ কথা অস্বীকার করবে কেন? শুধু বলবে যে, কারণটা এখন প্রকাশ করা হবে না।

পরদিন সকালেই দলে দলে দর্শনার্থীর সমাগম ঘটায় মহেশ বারণ না মানিয়া সব কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে ভাবিয়া সদানন্দ প্রথমটা বড়ই রাগিয়া যায়।

মহেশ চৌধুরী বলে, আজে না, আমি কিছুই বলি নি। আপনি এখানে এসেছেন জেনে সকলে প্রণাম করতে আসছে।

আমি এখানে এসেছি, এ কথাটাও এত তাড়াতাড়ি নাই বা ছড়িয়ে দিতে মহেশ? দুদিন একটু শান্তিতে থাকতাম।

আপনি এসেছেন, এ কথা কি ছড়িয়ে দেবার দরকার হয় প্রভু? মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে যায়। সূর্যকে কি লুকিয়ে রাখা চলে প্রভু! কাল সকালে যখন এলেন, তখনি গাঁয়ের অর্ধেক লোক জেনে। গেছে আপনি এসেছেন। কালও অনেকে এসেছিল, আমি আপনাকে বিরক্ত করতে দিই নি। আজ আসতে বলে দিয়েছিলাম।

সকলে আসে, প্রণাম করিয়া যায় এবং অনেকে প্রণামীও দেয়। মাধবীলতা কাছে উপস্থিত থাকিলে কেউ কেউ কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকে দ্যাখে, কৌতূহলের সঙ্গে মেশানো থাকে ভয়। কে জানে, মাধবীলতার সম্বন্ধে তাদের মনে কি কল্পনার ছায়া ভাসিয়া আসিতে শুরু করিয়াছে। মেয়ে দরকার হয়, এমন সাধনাও তো সাধু-পুরুষেরা করে, শব-সাধনার মতো যে সব সাধনার কাল্পনিক বিবরণ শুনিলেই সাধারণ মানুষের রোমাঞ্চিত হয়।

প্রণামী নিয়া একটু বিপদ হয়। প্রণামী নেওয়া হইবে কিনা, সদানন্দও ঠিক করিতে পারে না, মহেশও ঠিক করতে পারে না। প্রথমে মুখ খোলে মহেশ।

কি করব প্রভু?

তুমি কি বল মহেশ?

আমার মনে হয়, প্রণামী এখন না নেওয়াই ভালো। এখন প্রণামী নিলে যেন নিজের জন্য নেওয়া হবে প্রভু। আশ্রম খোলা হলে তখন আশ্রমের জন্য প্রণামী নিলে দোষের হবে না।

শুনিয়া সদানন্দ ভাবে, মহেশ তবে তাকে নিয়া নূতন একটি আশ্রম খুলিবার কল্পনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে? কে জানে, প্রথম হইতেই মনে মনে মহেশের এ মতলব ছিল কিনা! হয়তো এরকম একটা উদ্দেশ্য নিয়াই তাকে বাগানোর জন্য এতকাল মহেশ হাজার অপমান সহিয়াও আশ্রমে যাতায়াত করিয়াছে, অতিভক্তির বন্যায় তাকে ভাসাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে। প্রথম প্রথম মহেশকে একটু বোকা মনে হইত, কিন্তু এখন সময় সময় তাকে সদানন্দের বিপিনের চেয়েও চালাক মনে হয়।

না, ঠিক বিপিনের চেয়ে চালাক নয়, বিপিনের চেয়ে বুদ্ধিমান মনে হয়। বিপিনের সঙ্গে মহেশের পার্থক্য এত বেশি প্রকট যে, দুজনের বুদ্ধিকে এক শ্রেণীতে ফেলিতে মনে খটকা লাগে। মহেশও হয়তো বিপিনের মতোই ভালো উদ্দেশ্যে ভড়ং করে, মিথ্যার আশ্রয় নেয়, মনে মনে ধারণা পোষণ করে যে, রোগীকে আর শিশুকে ভুলানোর মতো জগতের পীড়িত, বয়স্ক শিশুগুলিকেও দরকারমতো ভুলাইলে দোষ হয় না, তবু যেন বিপিনের বেলা এসব মনে হয় অন্যায় কিন্তু মহেশের বেলা অন্যায়ের প্রশ্ন মনেও আসে না।

তবে এ কথা সত্য যে, বিপিনের ঘোরপ্যাচ বোঝা যায়। উদ্দেশ্য তার অতি মহৎ, এটা বোঝা গেলে, পাঁচ যে কষিতেছে সে অতি জটিল, তাতে আর সন্দেহ থাকে না। মহেশের উদ্দেশ্য না বুঝিলেও, কখনো জোর করিয়া ভাবা চলে না তার মধ্যে ঘোরপ্যাচ আছে, মতলব হাসিল করিবার জন্য তলে তলে সে চালিতেছে চাল।

কেন এমন হয়? দশজনের ভালোর জন্য একজনের সর্বনাশ করাটা বিপিন অন্যায় মনে করে না, কিন্তু কারো সামান্য একটু ক্ষতি করার চিন্তা মহেশের পক্ষে মনে আনাও সম্ভব নয়, এইজন্য? সদানন্দের মনে হয়, আরো অনেক কারণ আছে। মহেশের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ আছে, বিপিনের যা নাই। বিপিনের মধ্যে এমন কতকগুলি দোষ আছে, মহেশের যা নাই। কিন্তু আসল গুণ বা দোষ, যার শাখা-প্রশাখাই মানুষের মধ্যে ছোট-বড় নানা রকম দোষগুণের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, মানুষের তো দশটা থাকে না? কি সেই গুণ মহেশের এবং কি সেই দোষ বিপিনের অথবা কি, সেই দোষের অভাব মহেশের এবং কি সেই গুণের অভাব বিপিনের, যার জন্য দুজনের মধ্যে এতখানি পার্থক্য সম্ভব হইয়াছে?

ভাবিতে ভাবিতে সদানন্দ আনমনে বলে, আচ্ছা, এখন তবে প্রণামী নিও না।

মনে হয়, সাধু সদানন্দ যেন মহেশ চৌধুরীকে এই কয়েকটি কথার মধ্যে নূতন একটি আশ্রম খুলিবার অনুমতিই দিয়া ফেলিয়াছে, মহেশ চৌধুরীর মুখখানা আনন্দে এমনি উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

## ১১. দিন কাটিয়া যায়

দিন কাটিয়া যায়, আশ্রম হইতে বিপিনও আসে না, কোনো শিষ্যও আসে না। সদানন্দ আকাশপাল ভাবে মন খারাপ করিয়া। শিষ্যদের না আসিবার কারণটা যে সদানন্দ মোটামুটি অনুমান করিতে পারে না, তা নয়। বিপিনের কোনো কারসাজি আছে নিশ্চয়। কিন্তু আশ্রমে কি এমন ভক্ত তার একজন নাই, বিপিনের কোনো কথায় কান না দিয়া যে তার সঙ্গে দেখা করিতে আসাটা দরকার মনে করে? মুখখানা তার বড় বিমর্ষ দেখায়। কেউ সেটাকে ভাবে গান্ধীর্ষ, কেউ মনে করে গভীর চিন্তার ছাপ। যে বুঝিতে পারে সাধু সদানন্দের মুখখানা বিষণ্ণ দেখাইতেছে, সে ভাবে, সাধু-সন্ন্যাসী মানুষের আবার মন খারাপ হওয়া কেন? মাধবীলতা মনের দুঃখে মাথা নাড়িয়া ভাবে, নাঃ, লোকটার একটুও মনের জোর নেই।

একদিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় বিনা খবরে রত্নাবলী আসিয়া হাজির হয়। সঙ্গে কেউ নাই। কার একটা মোটা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া একাই এতখানি রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়াছে।

মাধবীলতা চোখ কপালে তুলিয়া বলে, কি করে এলি!

রত্নাবলী হাসিয়া বলে, এলাম।

মাধবীলতা খুঁতখুঁত করিয়া বলে, দিনের বেলা এলেই হত, নয়তো কাউকে সঙ্গে নিয়ে—

চুপি চুপি এলাম যে লুকিয়ে।

কেন, লুকিয়ে কেন?

বিপিনবাবু টের পেলে তাড়িয়ে দেবে না আশ্রম থেকে?

দেয় দেবে তাড়িয়ে, এখানে এসে থাকবি তুই।

আহা, সেটা জানতে হবে তো আগে? এখানে থাকতে পাব কিনা, না জেনে আগে থেকে ওখানকার আশ্রয়টা তো আর ঘুচিয়ে দিতে পারি না।

রত্নাবলী গোড়া হইতে হাসিতেছিল, এবার হাসিল শশধরের দিকে তাকাইয়া।

ঘরে অনেক লোক, কিছুক্ষণ আগে মহেশ চৌধুরীর চেষ্টায় এ ঘরে বাড়ির সকলের ঘরোয়া মজলিস বসিয়াছে। হাতে-পায়ে ধরিয়া সদানন্দকে মহেশ এ মজলিসে টানিয়া আনিয়াছে। সতরঞ্চি বিছানো প্রকাণ্ড চৌকিতে অন্য সকলে বসিয়াছে, কিছু তফাতে অন্য একটি ছোট চৌকিতে ঘরে বোনা সুদৃশ্য আসনে সদানন্দের বসিবার ব্যবস্থা। আশ্রমে সদানন্দের কুটিরে মাঝে মাঝে শিষ্য ও ভক্তদের মজলিসে সদানন্দ উপস্থিত থাকিত, নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করা, সদানন্দকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, এসব অধিকার ভক্তদের কিছু কিছু থাকিত, তবু সে মজলিসের সঙ্গে এ। মজলিসের অনেক তফাত। যেটুকু স্বাভাবিক হওয়ার স্বাধীনতা সেখানে সকলকে দেওয়া হইত, সদানন্দের সামনে সেটুকু স্বাধীনতা কাজে লাগানোর সাহস কারো হইত না, সকলে কথা বলিত ভয়ে ভয়ে। এখানে মহেশ নিজেই বাজে গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, রত্নাবলী যখন ঘরে ঢোকে, বিভূতি রস দিয়া জেলের কাহিনী বলিতেছে, সকলে মন দিয়া শুনিতোছে তার কথা, সদানন্দের দিকে কারো নজর নাই! বিপিন সদানন্দকে আড়ালে রাখিত তার অসাধারণত্ব অটুট রাখিবার জন্য, মহেশের সব ব্যবস্থাই যেন উল্টা, সে যেন সকলের সামনে আনিয়া আনিয়া সদানন্দের কৃত্রিম অসাধারণত্বের আবরণটি ঘুচাইয়া দিতে চায়। বিভূতির গল্প শুনিতো শুনিতো সদানন্দ এই কথাটাই ভাবিতেছিল। বিভূতির মাও ঘরে আসিয়াছে, ছেলের দুর্দশার রসালো কাহিনী শুনিতো শুনিতো তার চোখ ছলছল করিতেছিল। ঘরে আসে নাই কেবল শশধরের ঘোমটা-টানা বৌ। তবে তার অনুপস্থিতিটা কেউ একবার খেয়াল করিয়াছে কিনা সন্দেহ। বাড়ির কারো চেতনায় নিজের অস্তিত্বের সাড়া না তুলিয়া বাঁচিয়া থাকিবার কঠিন সাধনায় বৌটি প্রায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ফেলিয়াছে।

রত্নাবলীর কথার জবাবে মহেশ চৌধুরী বলিল, তুমি তো আমার মেয়ে, মা? এখানে থাকতে পাব কিনা তাতে তো তোমার সন্দেহ থাকা উচিত নয় মা!

রত্নাবলী এবার হাসিল না।-না না, এমনি কথাটা বলছিলাম মাধুকে তামাশা করে। থাকতে পাব বৈকি এখানে।

তুমি এখানে এসে থাকলে আমরা বড় সুখী হব মা।

আমি তো যখন খুশি আসতে পারি, কেবল উমা-মাসির জন্যে, রত্নাবলী একটু হাসিল।

মহেশ বলিল, প্রভু যখন এখানে আছেন, ওঁকে বললে উনি এসে এখানে থাকতে রাজি হবেন। না?

মনে তো হয় না। উনি বড় চটেছেন।

রত্নাবলী আসিয়া সদানন্দকে প্রণাম করে নাই। সদানন্দ এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এবার জিজ্ঞাসা করিল, উমা চটেছে কেন?

আজ্ঞে, আপনি সন্ন্যাস ছেড়ে দিলেন বলে।

সন্ন্যাস ছেড়ে দিলাম? সন্ন্যাস ছেড়ে দিলাম মানে?

সন্ন্যাস ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন নি আপনি?

বিপিন বলেছে বুঝি?

রত্নাবলী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, বলিল, তাছাড়া, সন্ন্যাস না ছাড়লে গেরস্তের বাড়ি তিন রাত্রির বেশি বাস করছেন কি করে।

সদানন্দের তীব্র দৃষ্টিপাতে রত্নাবলী মথা হেঁট করে, সকলে স্তব্ধ হইয়া থাকে। মহেশ চোখ বুজিয়া হাঁটুতে হাত বুলায়। মাধবীলতা চাহিয়া দেখিতে থাকে সকলের মুখের দিকে।

হঠাৎ সদানন্দ বলিল, তাই বুঝি তুমি আজ আমার প্রণাম করলে না?

রত্নাবলী মাথা হেঁট করিয়া রাখিয়াই বলিল, আজ্ঞে না। আমার আজ কাউকে প্রণাম করতে নেই।

ওঃ! বলিয়া সদানন্দ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। আর কি বলেছে বিপিন আমার নামে?

মহেশ চৌধুরী হাত জোড় করিয়া বলিল, প্রভু?

সদানন্দ অধীর হইয়া বলিল, না মহেশ, আমায় শুনতে দাও। বল রতন, বল আর কি বলেছে বিপিন?

রত্নাবলী বলিল, আমি আর কি বলব, ও তো সবাই জানে।

তবু তুমিই বল না শুনি।

রত্নাবলী মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি জানেন না কিছু?

সদানন্দ বলিল, না। কি জানি না?

তবে তো সত্যি নয়! খুব সম্ভব রত্নাবলীর বিস্ময় আরো বাড়িয়া যায়, কিন্তু সেটা মুখে ভালো করিয়া ধরা পড়ে না, হাসি ছাড়া আর কিছুই রত্নাবলীর মুখে ভালো করিয়া পরিস্ফুট হয়। না।-ওমা, আমি তো সত্যি কিনা জানতেই ছুটে এলাম! সত্যি নয় তবে! কি কাণ্ড মা, এ্যা! এমন করেও বলতে পারেন বিপিনবাবু!

কি ছ্যাবলামি করছ রতন? কি সত্যি নয়? কি বলেছে বিপিন?

সদানন্দের ধমকে রত্নাবলী মুষড়িয়া গেল, আমতা আমতা করিয়া বলিল, আর আমি তা উচ্চারণ করতে পারব না! সত্যি যখন নয় ছি ছি...

কিন্তু আর কি এখন উচ্চারণ না করিলে চলে? কদিন ধরিয়া আশ্রম আর বিপিনের কথা ভাবিতে ভাবিতে সদানন্দের মাথা গরম হইয়া গিয়াছে, তার উপর রত্নাবলীর এতক্ষণের ভণিতা! সদানন্দ সিধা হইয়া বসিয়া ডাকে, রতন!-আর সে ডাক শুনিয়া ঘরের সকলের বুক কাঁপিয়া ওঠে।

আমার দিকে মুখ করে বোসো।

রত্নাবলী সদানন্দের দিকে মুখ করিয়া বসে।

চোখের দিকে তাকাও আমার।

রত্নাবলী সদানন্দের চোখের দিকে তাকায়।

এইবার বল।

রত্নাবলী বলে, তবে বলার আগে চোখ নামাইয়া নেয়। প্রথমে আশ্রমে রটিয়াছিল সদানন্দ। সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়াছে। তারপর কয়েকদিন আগে রটিয়াছে, সদানন্দ নাকি মাধবীলতাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে। সন্ন্যাস ত্যাগ করার উদ্দেশ্যও তাই। খবরগুলি অবশ্য রত্নাবলী সোজাসুজি বিপিনের কাছে শোনে নাই। তবে আশ্রমে বিপিন ছাড়া এসব খবর আর কে ছড়াইবে?

আশ্রমের কেউ আসে নাই কেন? বিপিন একদিন আশ্রমের সকলকে একত্র করিয়া বলিয়া দিয়াছে, যে কারণেই হোক, সদানন্দ যখন কারো কাছে বিদায় না নিয়া আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়া উচিত হইবে না। যতই হোক, এতদিন তো সদানন্দ তাদের শ্রদ্ধেয় গুরুদেব ছিলেন। যুক্তিটার জন্য যত না থোক, বিপিনের হুকুমের বিরুদ্ধে কেউ আসিতে সাহস পায় নাই। বিপিন এই রকম ভাবেই হুকুম দেয়। তাছাড়া, মনেও সকলের প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে। কয়েকজন খুব কাঁদিয়াছে।

সদানন্দ সিধা হইয়াই বসিয়া থাকে কিন্তু নিজেকে তার বড়ই দুর্বল অসহায় মনে হইতে থাকে। সে ছাড়া এ জগতে আর সকলেই কি অবস্থা বুঝিয়া হিসাব করিয়া নিজেকে বাঁচাইয়া নিজের কাজ হাসিল করিয়া চলিতে পারে, সে-ই কেবল সব সময় ঠকিয়া যায়, না পারে গুছাইয়া কোনো একটা কাজ করিতে, না পারে নিজেকে বিপদের হাত হইতে বাঁচাইয়া চলিতেঃ বিপিন যখন ওদিকে তার নামে নানা কথা রটাইয়া আটঘাট বাঁধিয়া নিতেছে, সে তখন ভাবিতেছে কখন বিপিন আসিবে হাতে-পায়ে ধরিয়া তাকে ফিরাইয়া নিতে অনুতপ্ত, লাঞ্চিত বিপিন। বিপিন যে বলিয়াছিল বাস্তব জগতে তার কোনো দাম নাই, কথাটা তো মিথ্যা নয়। কত হিসাব করিয়া বিপিন কাজ করে, প্রত্যেকটি সুযোগ সুবিধা কিভাবে কাজে লাগায়, সে শুধু বসিয়া বসিয়া আকাশপাতাল ভাবে। গৃহস্থের বাড়ি তিনরাত্রির বেশি বাস করা যে সন্ন্যাসত্যাগের কত বড় একটা প্রমাণ সাধারণ মানুষের কাছে, আর এক্ষেত্রে সন্ন্যাসত্যাগের কারণ হিসাবে মাধবীলতাকে বিবাহ করিয়া সংসারী। হওয়ার উদ্দেশ্য যে কত জোরালো সমর্থক যুক্তি, কিছুই বিপিনের ভাবিতে বাকি থাকে নাই। আর এখানে আসিবার পরে তার শুধু একবার খেয়াল হইয়াছিল মাত্র যে, মাধবীলতার সঙ্গে তার নাম জড়াইয়া বিপিন কুৎসা রটনার সুযোগ পাইবে।

এখন সদানন্দ বুঝিতে পারে, এর চেয়ে কুৎসা রটানো ঢের ভালো ছিল। কারো কারো মনে একটু খটকা লাগিত মাত্র। মহেশ চৌধুরীর এ বাড়িতে আজ কত যুগ ধরিয়া একটি পারিবারিক জীবনের ধারা বহিতেছে, বাড়িতে গৃহিণী আছে, একটি বৌ আছে, মেয়েরা মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করে, এখানে মাধবীলতা আর সাধু সদানন্দের বাস করাটাই তো নিন্দনীয় হইতে পারে না। মাধবীলতার পিছনে পিছনে সদানন্দও মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে আসিয়া হাজির হইয়াছে, কুৎসার স্বপক্ষে শুধু এই যুক্তি। কিন্তু ও যুক্তি বাতিল হইয়া যাইত দুদিনে, সদানন্দ যখন ঘোষণা করিয়া দিত আশ্রম সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে অনাচার ও ব্যভিচারে ভরা বিপিনের টাকা রোজগারের উপায় সে আশ্রম। কিন্তু বিপিন তার নিন্দা করে নাই, তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে। নাই, কেবল এত বড় সাধু সদানন্দ তার সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া সংসারী হওয়ার ইচ্ছার জন্য বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে। এ গুজবও মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া যাইবে, কিন্তু লোকের মনে একটা ছাপ থাকিয়াই যাইবে।

কত কথাই মনে হইবে লোকের। কেউ ভাবিবে, কোনো কারণে বিবাহ ভাঙিয়া গেল। কেউ ভাবিবে, বিবাহটা বোধহয় দরকার হইল না, বিবাহ ছাড়াই

মাধবীলতা সদানন্দের সম্পত্তি, সদানন্দের কোনো রোমাঞ্চকর গোপন সাধনার জন্য। মাধবীলতাকে প্রয়োজন হয়, এসব কল্পনাও যে ইতিমধ্যে অনেকের মনে দেখা দিয়াছে আশপাশের গ্রামে, সে খবরটা সদানন্দ জানি না। নিজে সাধু বনিয়া থাকিয়া সাধু-সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা যে কি রকম, সে বিষয়ে সদানন্দের পরীক্ষার ধারণা নাই। স্ত্রী সঙ্গে থাকিলেও সাধু-সন্ন্যাসীর কিন্তু আসিয়া যায় না, স্ত্রীও যদি সন্ন্যাসিনী সাজিয়া থাকে। তখন লোকে তাকে বলে মাতাজী এবং টিপটিপ করিয়া তার পায়েও প্রণাম করে। সাধু-সন্ন্যাসীর নামে স্ত্রীলোক সংক্রান্ত কুৎসা বলিয়া কিছু হয় না। সাধু-সন্ন্যাসী তো সামাজিক জীব নয়, সাধারণ মানুষ নয়। তাদের কথাই আলাদা। স্ত্রীলোক ছাড়াও তাদের সাধনা চলে, স্ত্রীলোক নিয়াও সাধনা চলে। যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, যে মুক্ত পুরুষ, তার আবার ব্যভিচার কিসের? কত বদমেজাজী সাধু থাকে, কথায় কথায় রাগে আগুন হইয়া অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয়, মারিতে ওঠে কিন্তু সেজন্য কে মনে করে এই সাধুটি ক্রোধ রিপুর বশ, রিপুই যখন দমন করিতে পারে নাই, এ আবার সাধু কিসের? রাগারাগি গালাগালির জন্যই বরং লোকের ভয়ভক্তি আরো বাড়িয়া যায়। কামও তো একটা তুচ্ছ রিপুমাত্র।

তবে জটা-ভস্ম-বিবর্জিত, প্রচলিত কুসংস্কার ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রচারকারী আদর্শবাদী সাধু সম্বন্ধে লোকের মনে অনেক রকম খুঁতখুঁতানি থাকে। এসব সাধু চমকপ্রদ কিছু করে না কিনা, ওষুধ দেয় না, রোগ ভালো করে না, মরা মানুষকে বাঁচায় না, ভবিষ্যৎ গুনিয়া দেয় না, বৃষ্টি নামায় না, হিমালয়ের দুর্গম গুহায় দিনযাপনের কাহিনী শোনায় না, মাটির নিচে কিছুদিনের জীবন্ত সমাধির পর জ্যান্ত হইয়া আসে না-এক রকম কিছুই করে না। শুধু বলে, এই কোরো না, ওই কোরো না।

তবে সদানন্দকে লোকে অবিকল এই ধরনের সাধুর পর্যায়ে ফেলে না। সদানন্দের কিছু কিছু অলৌকিক শক্তি আর কার্যকলাপের বিজ্ঞাপন বিপিন আগে প্রচার করিয়াছিল।

সকলের আগে কথা বলিল মহেশ চৌধুরী।

বিয়ের কথাটা মিথ্যে নয় মা। তবে বিপিনবাবু একটু ভুল শুনেছেন। মাধুর বিয়ে হবে আমাদের বিভূতির সঙ্গে।

মাধবীলতার সঙ্গে সদানন্দের বিবাহের গুজব রটিয়াছে শুনিয়া সকলে হতবাক হইয়া গিয়াছিল, মহেশ চৌধুরীর কথা শুনিয়া চমকাইয়া গেল। সকলে এমনভাবে মুখ ফিরাইল মহেশ চৌধুরীর দিকে যে, ঘাড়ে একটু ঝাঁকুনি লাগিল সকলেরই, বিভূতির পাট করা চুলের কিছু অংশ সিঁথির লাইন। ডিঙাইয়া ও-পাশে চলিয়া গেল, মাধবীলতার কানে বিভূতির মার আদর করিয়া পরাইয়া দেওয়া দুল দুটি কানের সামনে আর পিছনে জোরে জোরে আঘাত করিয়া দুলিতে লাগিল, রত্নাবলীর এলো খোপা খুলিয়া গেল।

তারপর খোপা ঠিক করিতে করিতে রত্নাবলী বলিল, সত্যি?

মহেশ চৌধুরী হাসিয়া বলিল, সত্যি বৈকি মা। এখন একটি শুভদিন দেখে—

দিন ঠিক হয় নি?

বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে আর দিন ঠিক হতে কতক্ষণ লাগে মা?

অন্য সকলে এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। এবার সদানন্দ বলিল, মহেশ।

প্রভু?

সদানন্দ কিছুই বলিল না।

রত্নাবলী বলিল, কিন্তু তুই কি মাধু? আমায় জানাস নি কিছু!

মাধবীলতাও কিছু বলিল না।

রত্নাবলী একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মাধবীলতার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া এক রকম টানিতে টানিতেই তাকে সঙ্গে নিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

তখন বিভূতি গম্ভীরমুখে ডাকিল, বাবা?

মহেশ চৌধুরী বলিল, বুঝেছি, তুমি কি বলতে চাও। কিন্তু এখন নাই বা বললি? ভেবেচিন্তে কথা বলতে কিছু দোষ আছে? যদি কিছু বলার থাকে, কাল না হয় পরশু বলিস, কেমন?

বিভূতি খুব সম্ভব বলার কথাটা ভাবিয়া দেখার বদলে, কথাটা এখনই বলিয়া ফেলিবে না। ভাবিয়া চিন্তিয়া কাল পরশু বলিবে, গম্ভীরমুখে প্রচণ্ডভাবে তাই ভাবিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সদানন্দ বলিল, তোমার ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না মহেশ।

প্রভু?

মুখখানা একবার একটু বিকৃত করিয়া সদানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল, বাহিরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া বলিল, ঘরে গেলাম মহেশ। ঘণ্টাখানেক পরে একবার শুনে যেও।

মিনিটি দুই বসিয়া থাকিয়া বিভূতিও উঠিয়া গেল।

বিভূতির মা তখন বলিল, তুমি আর মেয়ে পেলে না?

কেন, মাধু তো বেশ মেয়ে।

আমার অমন ছেলে, তার জন্যে কুড়োনো মেয়ে!

অন্য মেয়েকে তোমার ছেলে বিয়ে করলে তো। দ্যাখ, হয়তো শেষ পর্যন্ত না বলে বসবে। কথাটা ভেবে দেখতে রাজি হয়েছে, এইটুকু যা ভরসা। আমি তো ভাবলাম, মুখের উপরেই বুঝি বলে বসে, চোখ বুজিয়া মহেশ একটা নিশ্বাস ফেলিল। পরক্ষণে চোখ মেলিয়া বিভূতির মার। ডান হাতটি বুকের উপর রাখিয়া বলিল, এখনো বুক কাঁপছে দ্যাখ।

রত্নাবলীকে আশ্রমের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আসিতে গেল শশধর। এতক্ষণে মাধবীলতা যেন এত রাতে লুকাইয়া রত্নাবলীর একা এখানে আসার কারণটা বুঝিতে পারি। একা আসিলেও তাকে যে কেউ পৌঁছিয়া দিয়া আসিতে যাইবে, তা কি আর রত্নাবলী জানিত না? এবং সঙ্গে যে যাইবে, তার শশধর হইতেই বা বাধা কি?

অন্য সময় মাধবীর মনে ব্যাপারটা পাক খাইয়া বেড়াইত, আজ তার এমন একটা বিষয়েও মাথা ঘামানোর ক্ষমতা ছিল না। কি উদ্ভট মানুষ মহেশ চৌধুরী! কেমন অনায়াসে বলিয়া বসিল বিভূতির সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে! কাউকে একবার জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করিল না। এক মুহূর্ত আগে এ রকম একটা সম্ভাবনার কথা কি কারো কল্পনাতে ছিল?

অথবা আগেই কথাটা সকলে আলোচনা করিয়াছিল, সে-ই কিছু জানে না? তাকে না জানাইয়াই সকলে তলে তলে বিভূতির সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে? কিন্তু তাও কি সম্ভব।

কি হইবে এবার? মহেশ চৌধুরী তো যা মুখে আসিল বলিয়াই খালাস, ফলটা দাঁড়াইবে কি? সদানন্দ কি করিবে? কি করিবে সদানন্দ সদানন্দের সেদিনকার সেই কথাটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মাধবীলতার মনে ভাসিয়া আসিতে থাকে, আমাকে মহাপুরুষ না ভেবে তো তোমার উপায় নাই, তোমাকে যে তাহলে দ্বিচারিণী হতে হবে!।

সদানন্দের ভয়টাই মাধবীলতার মনে সবচেয়ে বড় হইয়া দেখা দেয়। বিভূতিকে বিবাহ করার কথাটা সে কখনো ভাবে নাই, এ রকম একটা সম্ভাবনার কথা তার কল্পনাতেও আসে নাই। আজ এ বিষয়ে মাথা ঘামানোই তার পক্ষে উচিত ও স্বাভাবিক ছিল সব চেয়ে বেশি, কিন্তু কথাটা যে বিবেচনা করা দরকার, নিজের মনে তারও যে এ বিষয়ে একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিতে হইবে আজকালের মধ্যে, এটা যেন তার খেয়ালও হইল না। বিভূতির জীবনসঙ্গিনী হইতে সে রাজি আছে। কি নাই, নিজেই সে তা এখনো জানে না।

তবু সদানন্দ কি ভাবিবে, সদানন্দ কি বলিবে, সদানন্দ কি করিবে, কল্পনা করিয়া সৰ্বাঙ্গে যেন রীতিমতো অপরাধমূলক ভয়ের টিপটিপানি অনুভব করিতে থাকে।

নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া মাধবীলতা ভাবিতেছিল, কে যেন পাশে আসিয়া বসিল সন্তর্পণে, চোরের মতো। মুখ ফিরাইয়া মাধবীলতা দেখিল শশধরের বৌ ঘোমটা কমাইয়া দিয়াছে, তবু কপাল প্রায় সবখানিই ঢাকা।

দিদি?

আজ সে প্রথম ঘোমটা কমাইয়া মাধবীলতার সঙ্গে কথা कहিল, এতদিন কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও মাধবীলতা তাকে কথা বলাইতে পারে নাই। হাত দেখিয়াই বোঝা যায় বৌটির রং খুব সুন্দর, মুখের রং আরো টুকটুকে।

ঠাকুরপোর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে দিদি?

এমন সুন্দর মুখের এত আনন্দের কথা কি যে বিশ্রী শুনাইল, বলিবার নয়। বৌটি ফোকলা!

সদানন্দ বলে, তবে কি তুমি বলতে চাও, ওদের মধ্যে কোনো কথাই হয় নি, বিভূতি আর মাধুর মধ্যে?

মহেশ বলে, আজ্ঞে না। তবে দুজনে বেশ ভাব হয়েছে সেটা তো বোঝাই যায়।

সদানন্দ বলে, ভাব তো আর প্রণয় নয় মহেশ। দুজনে সৰ্বদা মেলামেশা করছে, এদের ভাব হওয়াটা আশ্চর্য কি। কিন্তু বিয়ে হল আলাদা ব্যাপার। সকলের সামনে কথাটা বলার আগে ওদের একবার জিজ্ঞাসা করা তো তোমার উচিত ছিল? আমার সঙ্গেও তো পরামর্শ করতে পারতে একবার?

সময় পেলাম না যে প্রভু? আপনার নামে অমন একটা কুৎসিত কথা রটেছে শুনে মনে হল, বিয়ে যখন এদের হবেই, আর দেরি না করে মেয়েটিকে কথাটা জানিয়ে দেওয়াই ভালো। মাধুর সম্পর্কে আপনার নামে আর কোনো কথাই তাহলে উঠতে পারে না।

বিয়ে যখন ওদের হবেই মানে?

আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে বিয়েটা ওদের নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে প্রভু। ছেলেটার মাথাও একটু ঠাণ্ডা হবে, মেয়েটাও সুখী হবে।

শুনিলে মনে হয় না, বিভূতি আর মাধবীলতার বিবাহ যে হইবেই, সে বিষয়ে মহেশ চৌধুরীর কিছুমাত্র সন্দেহ আছে। কারো মত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, কারো সঙ্গে পরামর্শ করা হয় নাই, যাদের বিবাহ দুঘণ্টা আগেও তাদের ইঙ্গিতেও ব্যাপারটা জানানো হয় নাই, তবু যেন মহেশ চৌধুরী জানে, এ বিবাহ হইয়া যাইবে। রাগে সদানন্দের গা যেন জ্বলিয়া যায়। একটু ভয়ও হয়। মহেশ চৌধুরীর একগুঁয়েমির কিছু কিছু পরিচয় সে পাইয়াছে।

জান মহেশ, তোমার ব্যাপার ভালো বুঝতে পারছি না। বিভূতির একটা বিয়ে দিতে চাও, ভালো কথা। কিন্তু মাধুর সঙ্গে বিয়ে হবে কি করে? মাধু আশ্রমে এসেছে, সংসার ওর ভালো লাগে। নি বলে, সেবা আর আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়ে ওর জীবনটা কাটিয়ে দেবার ইচ্ছা। আমি ওকে দীক্ষা দেব, নিজে ওকে সাধনপথে চালিয়ে নিয়ে যাব। ওর বিয়ের প্রশ্নই তো উঠতে পারে না।

প্রভু?

তুমি বুঝতে পার না মহেশ, ও মেয়েটির মধ্যে খাঁটি জিনিস আছে? আমি কি সাধে ওকে বেছে নিয়েছি! একদিন ও অনেক উঁচুতে উঠে যাবে, হাজার হাজার মানুষের জীবনে একদিন ও সুখশান্তি এনে দেবে। এমন একটা খাঁটি জিনিস নষ্ট হতে দেওয়া যায়!

প্রভু?

বল না, কি বলতে চাও? আলোচনা করবার জন্যই তো ডেকেছি তোমায়!

বিয়ে না হলে মেয়েটির মন শান্ত হবে না, প্রভু। বিয়ের জন্য মেয়েটি ছটফট করছে।

সদানন্দ ব্যঙ্গ করিয়া বলে, তোমায় বলেছে নাকি, তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে দিয়ে দিন, বিয়ের জন্য আমি ছটফট করছি মহেশাবাবু?

মহেশ হাত জোড় করিয়া বলে, আপনার তো অজানা কিছু নেই প্রভু! কেন মনে কষ্ট দিচ্ছেন। আমার কোনো মেয়ে অমন করে বলেও না, পারেও না। কিন্তু মেয়েমানুষের মন কি বোঝা যায় না? রাজাসায়েবের ছেলে তো ওকে বিয়ের লোভ দেখিয়ে বার করে এনেছিল!

ছেলেমানুষ হঠাৎ একদিন মনের ভুলে কি করেছিল-

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও তো তাই বলি। নইলে নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইতাম? বিয়ে। করে সংসারী হবার ইচ্ছা মেয়েটির মনে প্রবল।

কিন্তু মহেশ-

আজ্ঞে হ্যাঁ। বিয়েটা হয়ে যাক, দুজনকেই আপনি দীক্ষা দিয়ে পায়ের তলে আশ্রয় দেবেন। যেমন চান তেমনি করে গড়ে তুলবেন দুজনকে। আপনার কাজে দুজনে জীবন উৎসর্গ করবে। ওরা তো আপনারই সন্তান প্রভু?

সদানন্দের মনে হয়, মহেশ যেন তাকে ভক্তিমাখা চাবুক মারিয়াছে।

## ১২. বিভূতি সত্যই বড় ছেলেমানুষ

এ বিষয়ে বিভূতি সত্যই বড় ছেলেমানুষ বিবাহ করার বিষয়ে। এতটুকু অভিজ্ঞতা নাই। মেয়েদের সম্বন্ধে কোনোদিন সে যে মাথা ঘামায় নাই তা নয়, তবে সেটা খুবই কম। অস্পষ্ট একটা ধারণা তার মনে আছে যে, দেখিলেই ভালো লাগে এমন চেহারার আর মিশিলেই মিষ্টি লাগে এমন স্বভাবের একটি চালাকচতুর চটপটে মেয়ের সঙ্গে একদিন প্রেম তার হইবেই, ব্যস্, তারপরেই মালাবদল। কিন্তু মাধবীলতা কি তার কল্পনার সেই মেয়ে? দুদিন ভাবিয়া বাপকে একটা জবাব দিবে বলিয়াছিল, সাতদিন ভাবিয়াও কিছু ঠিক করিতে পারি না। তারপর মনে হইল, মাধবীলতার সঙ্গে পরামর্শ করিলে দোষ কি?

মাধবীলতা সোজাসুজি জবাব দিল, আমি কি জানি।

অর্থাৎ মাধবীলতার আপত্তি নাই। মনে মনে বড় অভিমান হয় মাধবীলতার, তাকে জিজ্ঞাসা করা কেন, কি করা উচিত? ইচ্ছা না থাকে, বাতিল করিয়া দিলেই হয়! সে তো আর পায়ে ধরিয়া সাধে নাই!

সদানন্দ অনেকবার মাধবীলতাকে ডাকিয়া পঠাইয়াছে, সে যায় নাই। কি করিবে গিয়া? সদানন্দ কি বলিবে, সে ভালো করিয়াই জানে! আর ওসব কথা শুনিবার সাধ মাধবীলতার নাই। নিজে সে অনেক ভাবিয়াছে এখনো ভাবিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে মাথার মধ্যে যখন একটা যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, মনে হয় মাথার ঘিলুগুলি গলিয়া গলিয়া তালুর কাছ হইতে টপটপ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে (মোমের মতো), তখন হঠাৎ একসময় দুকানে তার তালা লাগিয়া গিয়া সমস্ত জগৎ বদলাইয়া যায়। স্তব্ধ ও শান্ত চারিদিক। ভাবনার তো কিছু নাই? আত্মগ্লানির কোনো কারণ তো খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? সব ভালো, সব মিষ্টি, সব সুন্দর। জীবনে সুখী হওয়ার পথে একটা বাধাও আর নাই। কত আনন্দ জীবনে। আফসোস শুধু এই যে, সে জানে, আবার গোড়া হইতে সব শুরু হইবে, দুর্ভাবনা, অস্বস্তিবোধ, আত্মগ্লানি, আর মাথার অনির্দিষ্ট দুর্বোধ্য যাতনা। প্রথমে

সামান্যভাবে আরম্ভ হইয়া বাড়িতে বাড়িতে কয়েকদিনে উঠিয়া যাইবে চরমে, তখন আবার দুকানে তালা লাগিয়া পাওয়া যাইবে শান্তি ও স্তব্ধতা। ব্যাপারটা মাধবীলতা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এ কি কোনো অসুখ? মাথার অসুখ? পাগল-টাগল হইয়া যাইবে না। তো? সদানন্দ একদিন বিভূতিকে দিয়াই তাকে ডাকিয়া পাঠাইল। মাধবীলতা নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করিল, যাব?

যাবে বৈকি, বাঃ রে।

একা একা যেতে আমার কেমন ভয় করে।

ভয় আবার কিসের?

সদানন্দের সামনে নিজেকে মাধবীলতার সত্যই কেমন যেন পুতুলের মতো অসহায় মনে হয়। তাকে নিয়া যা খুশি করার ক্ষমতা যেন এই লোকটির কেমন করিয়া জন্মিয়া গিয়াছে।

আমাকে একেবারে ত্যাগ করে দিলে মাধু।

মাধবীলতা পুতুলের মতোই চাহিয়া থাকে। এই তো সবে আরম্ভ, আরো কত কথা সদানন্দ বলিবে! কিন্তু সদানন্দও কথা না বলিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া, খানিক পরে সে সত্যই আশ্চর্য হইয়া যায়। তখন মাধবীলতা মাথা নিচু করে, অনেক ভাবিয়া আস্তে আস্তে বলে, আপনি যদি বারণ করে-

সদানন্দ ভাবিতেছিল সেদিনকার কথা, আঙুলগুলিকে সেদিন পাখির পালকের চেয়ে কোমল করিয়া মাধবীলতার গায়ে বুলাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। আজ মারিতে ইচ্ছা হইতেছে। এমন কোমল, এমন মোলায়েম গা মাধবীলতার, দেখিলেই মনে হয় চামড়ার উপর বুঝি আর একটা অপার্থিব আবরণ আছে (এটা সদানন্দ অনেকবার কল্পনা করিয়াছে), তাকে স্পর্শ করিবার কল্পনাতেই রোমাঞ্চ হইত, আজ কাটিয়া ছিড়িয়া রক্তপাত করিয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইচ্ছা হইতে হইতে হঠাৎ উঠিয়া গিয়া সদানন্দ

দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দেয়। সত্যই কি মাধবীলতার শরীরটা সে ছিড়িয়া ফেলিবে নাকি? চোখ দেখিয়া মাধবীলতার সর্বাঙ্গ অসাড় হইয়া আসে। পাগল না হইয়া গেলে কি মানুষের এমন চোখ হয়? কি করিবে সদানন্দ? খুন-টুন করিয়া ফেলিবে না তো?

কাছেই বসে সদানন্দ, ডান হাত শক্ত করিয়া তার বাঁ হাতের কজির কাছে চাপিয়া ধরে। মায়ামমতা যে আজ সদানন্দের মনে এক ফোটা নাই, রাগে দুঃখে অপমানে মানুষটা গরগর করিতেছে, মাধবীলতা অনেক আগেই সেটা টের পাইয়াছিল। এতক্ষণে সে বুঝিতে পারে, ভয়ঙ্কর একটা আঘাতে দেহে মনে তাকে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করিয়া দিবার সাধটাই সদানন্দের মনে মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে। এতদিন মনে মনে সদানন্দ কি ভাবিয়াছে কে জানে, হয়তো এইরকম একটা কল্পনাই মনে মনে নাড়াচাড়া করিয়াছে। আজ আর কোনো রকমেই ঠেকানো যাইবে না। গলা টিপিয়া তাকে মারিয়া ফেলাও সদানন্দের পক্ষে আজ আশ্চর্য নয়। মাধবীলতা জানে বা হাতের কজিটা তার ভাঙিয়া গিয়াছে কিন্তু মাথার মধ্যে এমন ঝিমঝিম করিতেছে যে ব্যথাটা ভালো রকম অনুভব করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বিস্মারিত চোখ দুটি সদানন্দের চোখের সঙ্গে মিলাইবার চেষ্টা করিতে করিতে মাধবীলতা জ্ঞান হারাইয়া সদানন্দের গায়েই ঢলিয়া পড়িয়া গেল।

ঘরের কুঁজায় জল ছিল, মাথায় খানিকটা জল চাপড়াইয়া দিয়া সদানন্দ দরজা জানালা খুলিয়া দিল। খানিক তফাতে হাত গুটাইয়া বসিয়া বিড়বিড় করিতে লাগিল। বোধহয়, আত্মরক্ষার এত বড় অস্ত্র আয়ত্ত করিয়া রাখার জন্য মাধবীলতাকে গালাগালি।

মাধবীলতা জ্ঞান হওয়ার পর সদানন্দ উদাসভাবে বলিল, আচ্ছা তুমি যাও মাধু।

আপনি কি করলেন আমার?

কিছুই করি নি।

মাধবীলতা সে কথা বিশ্বাস করিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। গেল একেবারে বিভূতির কাছে। নালিশ যদি করিতে হয়, হবু স্বামীর কাছে করা ভালো।

বিভূতি শুনিয়া অবাক। অপমান করেছেন? কি অপমান করেছেন স্বামীজি তোমাকে?

মাথার মধ্যে কতকগুলো বড় অদ্ভুত প্রক্রিয়া চলিতেছিল মাধবীলতার, স্থান ও কালের কতকগুলি নিয়ম যেন চিলা হইয়া গিয়াছে। মাথার মধ্যে, অথচ ঠিক যেন মাথার মধ্যেও নয়, মাথার পিছন দিকে একটা বাড়তি অঙ্গ আছে, সেইখানে কত কি জিনিস এক সঙ্গে সরু আর মোটা হইয়া যাইতেছে, কয়েক দিন পরে পরে কানে যে তার তালা লাগে, সেই বীভৎস স্তব্ধতা সর্বব্যাপী আলোড়নের মধ্যে ঢেউ তুলিয়া এমন একটা এলোমেলো গতি লাভ করিয়াছে, যা চোখে দেখা যায়, আর এমন একটা অকথ্য ভয় (অনির্দিষ্ট ভয়ের যে এমন একটা অবর্ণনীয় রূপ থাকে, মাধবীলতার জানা ছিল না)-ব্যাপারটা বুঝিবারও নয়, বুঝাইবারও নয়। অথচ মস্তিষ্কের সাধারণ অংশটা এদিকে বেশ কাজ করিতেছে। সমস্ত ঘটনাটা অনায়াসে গড়গড় করিয়া সে বিভূতিকে বলিয়া গেল। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া হাত ধরিয়া টানিবার সময় ভয়ে অজ্ঞান হইয়া যাওয়ায় আজ কি ভাবে রান্ধসটার হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

তুমি যদি এর প্রতিকার না কর-

বিভূতির মুখে মুখ গুঁজিয়া দিয়া মাধবীলতা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিভূতি কথা বলে না দেখিয়া, খানিক পরে মুখ তুলিয়া চাহিয়াই সে চমকাইয়া গেল। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া আসিয়া হাত চাপিয়া ধরিবার সময় সদানন্দের মুখ যেমন হইয়াছিল, বিভূতির মুখও তেমনি দেখাইতেছে।

একটু বোসো, আমি আসছি।

মাধবীলতা সভয়ে তার হাত চাপিয়া ধরিল, কি করবে? থাকগে, কিছু করে কাজ নেই। যা হবার তা তো হলই-

কিন্তু আর কি বিভূতিকে আটকানো যায়? হাত ছাড়াইয়া সে চলিয়া গেল। সদানন্দর ঘরে গিয়া সদানন্দের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, মাধুর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করার মানে?

দ্যাখ বিভূতি, তুমি ছেলেমানুষ-

বাকি কথাগুলি সে বলিয়া উঠিতে পারি না, বিভূতির ঘুসিতে নাকটা হেঁচিয়া গেল। বিভূতি আরো মারিত, কিন্তু পিছন হইতে মহেশ তাকে জড়াইয়া ধরায় আর কিছু করিতে পারিল না।

ছেড়ে দাও বাবা, বজ্জাতটাকে আমি খুন করব।

ছি বিভূতি, ছি!

আমাকে ছি করছ? জান ও কি করেছে?

জানি বৈকি।

জান?-বিভূতি এতক্ষণ ছাড়া পাওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করিতেছিল, এবার স্তব্ধ হইয়া গেল।

নাক দিয়া রক্ত পড়া বন্ধ হইল প্রায় আধঘণ্টা পরে, সেবা বেশিরভাগ করিল শশধরের বৌ। কখন কোন্ ফাঁকে সে যে আসিয়া জুটিয়াছিল, কেউ টেরও পায় নাই। বিভূতি একদিকে ছোট একটা টুলে বসিয়া ব্যাপার দেখিতেছিল আর থাকিয়া থাকিয়া মুখ বাকাইতেছিল। এখনো তার রাগ কমে নাই, বেশ বোঝা যায় একটা হেস্তুনেস্ত করিবার জন্যই সে বসিয়া আছে। মাঝখানে একবার সে একটা মন্তব্য করিতে গিয়াছিল, মহেশ হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল, দোহাই তোর, একটু থাম। তারপর হইতে সে চুপ করিয়া আছে।

বোঝা যায়, মহেশ ভাবিতেছে।

ভাবিবার কি আছে বিভূতি বুঝিতে পারে না। তার বিরক্তির সীমা থাকে না। মহেশ যদি সব জানেই, তবে আর এই পাষণ্ড সম্বন্ধে কর্তব্য স্থির করিতে তো একমুহূর্ত দেরি হওয়া উচিত নয়। এত সেবা যত্নই বা কি জন্য? ঘাড় ধরিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিলেই হয়!

সদানন্দ একটু সুস্থ হইলে মহেশ বলিল, বিভূতি, বড় ঘরের রোয়াকে ভাঙা কাঠের বাক্সটা আছে না, তার থেকে বড় হাতুড়িটা নিয়ে আসবে?

হাতুড়ি দিয়ে কি করবে?

একটু কাজ আছে।

বিভূতি হাতুড়ি আনিয়া দিল। লোহায় মরিচা ধরিয়া গিয়াছে। হাতুড়ি হাতে করিয়া মহেশ চৌধুরী বলিল, প্রভু, আমার ছেলের হয়ে আমি আপনার কাছে মাপ চাইছি। ছেলে আমার প্রায়শ্চিত্ত করবে না, ওকে বলা বৃথা। ছেলের হয়ে আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি, আপনি তাই মঞ্জুর করুন।

বলিতে বলিতে মহেশ চৌধুরী করিল কি, হাতুড়িটা দিয়া নিজের নাকের উপর সজোরে মারিয়া বসিল। সকলে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, কেবল শশধরের বৌ আবার সেবা আরম্ভ করিয়া দিল মহেশের। সে যেন এইরকম একটা কাণ্ড ঘটিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সদানন্দের চেয়ে মহেশের যে জোরে লাগিয়াছিল তাতে সন্দেহ নাই, রক্ত আর বন্ধ হইতে চায় না। মহেশের বারণ না মানিয়া বিভূতি পাড়ার সুবিমল ডাক্তারকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিল। ডাক্তার আসিয়া কিন্তু করিতে পারিল না কিছুই, তেলা নাকটা পরীক্ষা পর্যন্ত নয়। মহেশ তাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া অতিকষ্টে খোনাসুরে বলিল, না না, আমার কর্মভোগ আমায় ভোগ করতে দিন।

সুবিমল ডাক্তারের কাছে পাড়ার লোক জানিতে পারিল, সাধু সদানন্দ আর মহেশ চৌধুরীর মধ্যে ভয়ানক রকমের একটা হাতাহাতি হইয়া গিয়াছে। দুজনেই দারুণ আহত। মহেশ চৌধুরীর এখন ভয়ানক অনুতাপ হইয়াছে, বিনা চিকিৎসায় মরিয়া যাইতে চায়।

হাতাহাতি হইল কেন? প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর হাতাহাতি! ও রকম তো ওদের মধ্যে লাগিয়াই আছে। অন্যদিন কথা কাটাকাটির মধ্যেই সমাপ্তি হয়, আজ হাতাহাতি পর্যন্ত গড়াইয়াছে।

কথাটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত রূপ নিল অন্যরকম। ঘটনাটা অপরাত্নের, সন্ধ্যার পর অনেকে খবর জানিতে আসিল। সদানন্দ তখন নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে, তার দেখা কেউ পাইল না। মহেশ চৌধুরীর সমস্ত মুখটাই ফুলিয়া গিয়াছে, কথা বলিতেও কষ্ট হয়। তবু সেই সংক্ষেপে ব্যাপারটা সকলকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিল। গোয়ারগোবিন্দ একটা ছেলে আছে তার সকলে জানে তো? একটা ভুল বোঝার দরুন হঠাৎ রাগের মাথায় সে সদানন্দকে অপমান করিয়া বসে। ছেলের হইয়া মহেশ চৌধুরী তাই শাস্তি গ্রহণ করিয়াছে।

রসিক ভট্টাচার্য মহেশ চৌধুরীর বন্ধু। সে বলিল, তুমি কি উন্মাদ মহেশ?

কাল-পরশু তোমার সঙ্গে ও বিষয়ে তর্ক করা যাবে, কেমন? বলিয়া মহেশ চৌধুরী শয়ন করিতে ভিতরে গেল।

যে দশ-বারজন উৎসাহী ও কৌতুহলী পরিচিত লোকের কাছে মহেশ চৌধুরী কথাগুলি বলিল, তারা তখন ডাকাইয়া আনিল বিভূতিকে। কি হইয়াছিল? সদানন্দকে সে কি অপমান করিয়াছিল? কেন অপমান করিয়াছিল? কি দিয়া সদানন্দ মহেশ চৌধুরীকে আঘাত করিয়াছে?

কিন্তু বিভূতি তেমন ছেলেই নয়, সে সংক্ষেপে শুধু বলিল, আমি কিছু জানি না। আপনারা এবার যান তো।

সকলে দয়া করিয়া তার বাড়িতে পায়ের ধূলা দিয়াছে, সকলকে বসাইয়া রাখিয়া বাড়ির ভিতরে যাইতে মহেশ চৌধুরীর কত সঙ্কোচ, কত আফসোস! আর তার ছেলে কিনা সোজাসুজি সকলকে বিদায় দিল! ছেলেটা সত্যি গোঁয়ার।

পরদিন অনেক দূরের গ্রামে পর্যন্ত এটিয়া গেল, ছেলেটাকে বাঁচাইতে গিয়া মহেশ চৌধুরী। সদানন্দের হাতে ভয়ানক মার খাইয়াছে। একটি টু শব্দও করে নাই মহেশ চৌধুরী, সদানন্দ মার বন্ধ করিলে রক্তাক্ত শরীরে সদানন্দের পায়ে মাথা ঠেকাইয়া ছেলের হাত ধরিয়া ঘরের বাহির হইয়া আসিয়াছে। ডাক্তার ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু মহেশ চৌধুরী বলিয়াছে, প্রভুর প্রহারের চিকিৎসা ছি!

শেষ কথাটাতে সকলে যে কি মুগ্ধ হইয়া গেল বলিবার নয়। এমন ভক্তি মহেশ চৌধুরীর যে মার খাইয়া মরিতে বসিয়াছে তবু চিকিৎসা করিবে না-গুরু মারিয়াছে বলিয়া! সকলের কানে যেন বাজিল, মারলি মারলি কলসী-কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না?

না জানি কত বড় মহাপুরুষ সদানন্দ, যার জন্য মহেশ চৌধুরীর এমন অলৌকিক ভক্তিভাবের উদয় হইয়াছে, এমন মহৎ প্রেরণা আসিয়াছে। সদানন্দের উপর মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা যেন সভয় বিস্ময়ে হু হু করিয়া বাড়িয়া গেল। অনেকের মনে হইতে লাগিল, সদানন্দ হয়তো মানুষ নয়, মানুষের রূপধারী-

ফিসফিস করিয়া অন্তরঙ্গ মানুষের কানে কানেই শুধু কথাটা বলা যায়। কয়েকটি ভাঙা কুঁড়ের ভিতরে, গোঁয়ো পথের ধারে, কয়েকটি জমকালো গাছের ছায়ায় দেবতার আবির্ভাবের কথাটা কানাকানি হয়। অকাল-বার্ধক্যের ছাপমারা কয়েকটি ক্লিষ্ট মুখে উত্তেজিত আনন্দের বিস্ময়কর আবির্ভাব ঘটে।

কয়েকটা দিন একরকম একা একা ঘরের কোণে কাটাইয়া দিবার পর সদানন্দই প্রথম কথাটা পাড়ে। বলে, আমি বরং কোথাও চলে যাই মহেশ।

মহেশ চৌধুরী বলে, আর ও কথা কেন প্রভু? সে দিন তো ক্ষমা করেছেন, ও ব্যাপার তো চুকে গেছে?

চুকে গেছে বললেই কি সব ব্যাপার চুকে যায় মহেশ?

আজ্ঞে তা যায় বৈকি। আমরা এখন ভাবব ও ঘটনাটা যেন ঘটেই নি, মন থেকে একেবারে মুছে ফেলব। মনের বাইরে তো কোনো কিছুই জের চলতে পারে না প্রভু।

মাঝে মাঝে মহেশ চৌধুরী এমনভাবে কথা বলে, মনে হয় ঠিক যেন সদানন্দকে উপদেশ দিতেছে। প্রথম প্রথম সদানন্দ অতটা খেয়াল করিত না, আজকাল মন দিয়া শোনে। উপদেশের মতোই কথাগুলি সে গ্রহণ করে এবং পালন করিবার চেষ্টাও করে। মহেশ চৌধুরীর এখনকার উপদেশ, সেদিনকার ব্যাপারটা মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। কথায়, ব্যবহারে, এমন ভাব দেখাইতে হইবে, যেন কিছুই ঘটে নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া সদানন্দ সেই চেষ্টাই করে। কয়েকদিন গস্তীর ও বিষণ্ণভাবে ঘরের কোনায় কাটাইবার পর হঠাৎ সেদিন হাসিমুখে গিয়া হাজির হয় সাক্ষ্য মজলিসে।

সকলেই উপস্থিত আছে। বিভূতি এবং মাধবীলতাও। প্রথমটা সদানন্দের ভয় হয়, বিভূতি হয়তো রাগ করিয়া উঠিয়া যাইবে, হয়তো একটা কেলেক্সারি করিয়া বসিবে। মাধবীলতা হয়তো তেমন কিছু করিবে না, সে সাহস তার নাই, কিন্তু কথায় ব্যবহারে সহজ ভাব কি ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে মেয়েটা? মহেশ চৌধুরী তো বলিয়া খালাস, সব চুকিয়া বুকিয়া গিয়াছে, কিন্তু ওদের দুজনের পক্ষে কি চুকিয়া বুকিয়া যাওয়া সম্ভব?

কিছুক্ষণ কাটিয়া যাওয়ার পর সদানন্দ বুঝিতে পারে, ব্যাপারটা সত্য সত্যই সকলে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে যতটা মুছিয়া ফেলা সম্ভব। বিভূতি আর মাধবীলতা যে একটা

সক্কেচ আর অস্বস্তি বোধ করিতেছে, প্রথমদিকে এটা পরীক্ষার বোঝা গিয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে দুজনেই অন্যদিনের মতো সহজভাবে সকলের হাসি-গল্পে যোগ দিয়াছে।

সদানন্দের খুশি হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু মনটা তার হঠাৎ বড় খারাপ হইয়া গেল। আর একবার সে যেন মহেশ চৌধুরীর কাছে হারিয়া গিয়াছে। অতি শোচনীয় কুৎসিত পরাজয়। সেদিনকার ব্যাপারে মহেশ চৌধুরীর কাছে সে যে ছোট হইয়া গিয়াছে, আজ এই সাক্ষ্য মজলিসে আসিয়া প্রথম সেটা সদানন্দের খেয়াল হইল।

তার মনে হইতে লাগিল, এই উদ্দেশ্যই ছিল মহেশ চৌধুরীর, তাকে হীন করার জন্যই সে হাতুড়ি দিয়া সেদিন নিজের মুখে আঘাত করিয়াছিল। এখনো মহেশ চৌধুরীর মুখ অল্প অল্প ফুলিয়া আছে-কি সাংঘাতিক মানুষ মহেশ চৌধুরী।

## ১৩. বিভূতি আর মাধবীলতার বিবাহ

যাই হোক, একদিন যথারীতি বিভূতি আর মাধবীলতার বিবাহটা হইয়া গেল। প্রকাশ্য জীবনটা যেমন কাটিতেছিল, প্রায় সেই রকমই কাটিতে লাগিল দুজনের, বেশভূষার কিছু পরিবর্তন দেখা গেল মাধবীলতার এবং চেহারাটাও যেন তার বদলাইয়া যাইতে লাগিল। এমন পরিবর্তন যে দেখিলে। মনে প্রশ্ন জাগে, এতদিন কি অসুখী ছিল মেয়েটা, এবার সুখী হইতে আরম্ভ করিয়াছে?

বিবাহে বিপিন আসিয়াছিল, পরে আরেক দিন আসিয়া সে অনেকক্ষণ সকলের সঙ্গে আলাপ। করিয়া গেল সদানন্দ ছাড়া। আমল দিলে সদানন্দের সঙ্গেও হয়তো সে ভাব জমাইয়া যাইত শত্রুতা তুলিয়া যাওয়ার প্রয়োজনে মানুষ মানুষের সঙ্গে যে রকম ভাব জমায়। মহেশ চৌধুরী সদানন্দকে কেন্দ্র করিয়া নতুন একটি আশ্রম খুলিতেছে, এ খবরটা বিপিন পাইয়াছিল, কিন্তু রাগ, দুঃখ বা হিংসার বদলে তার উৎসাহই দেখা গেল বেশি। নিজেই কথা তুলিয়া সে মহেশ চৌধুরীকে বলিয়া গেল যে, রেষারেষি আশঙ্কা করিবার কোনো কারণই অনুমান করা যায় না, বিপিন আর মহেশের আশ্রমের উদ্দেশ্য হইবে সম্পূর্ণ পৃথক।

আপনার আশ্রমের উদ্দেশ্যটা কি বিপিনবাবু?

প্রশ্নটা অসঙ্গত। এতকাল যে আশ্রম চলিতেছে, চারিদিকে যে আশ্রমের বেশ নামও একটু আছে, তার মালিককে বাড়িতে পাইয়া একেবারে আশ্রমের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এ রকম একটা প্রশ্ন না করিলেই ভালো হইত। মহেশ চৌধুরীকে বিপিন কোনোদিন পছন্দ করিত না, আশ্রমে লোকটাকে সে চিরদিন দমাইয়া রাখিবার চেষ্টাই করিয়াছে, এখন হঠাৎ অতীতের কথা ভুলিয়া বাড়ি বহিয়া আসিয়া এ রকম খাতির জমানোর চেষ্টাতেই মহেশের কৃতার্থ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। আশ্রমের উদ্দেশ্য? কে না জানে বিপিনের আশ্রমের উদ্দেশ্যের কথা! জিজ্ঞাসা করাটাই বাহুল্য।

বিপিনের কোনো জবাব না পাইয়া মহেশ চৌধুরী আবার বলিয়াছিল, সত্যি কথাটা বলি, এতকাল আপনার আশ্রমে যাতায়াত করছি, কিন্তু উদ্দেশ্যটা ঠিক বুঝতে পারি নি। প্রভু যতকাল ছিলেন ততকাল তবু একটা কারণ ছিল, ওঁর জন্যে—

বিপিন মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল, প্রভুই বটেন!

মহেশ চৌধুরী দুই কানে আঙুল দিয়া বলিয়াছিলেন, ছি বিপিনবাবু, ছি!

তবু তো সর্বজনবিদিত আশ্রমের উদ্দেশ্যটা বিপিন পর্যন্ত মহেশকে ঠিকভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিল না। নিজের মনেও তার ধারণা ছিল কথাটা অত্যন্ত সহজ ও সরল। বলার সময় দেশ, সমাজ ও ধর্মের মধ্যে বক্তব্যটা দিশেহারা হইয়া গেল। দেশ, সমাজ ও ধর্মের কল্যাণ তো বটেই, কিন্তু কোন দিকে, কি ভাবে?

আহা, আশ্রমে কি হয় না হয় সে তো আপনার জানাই আছে।

মহেশ চৌধুরী সবিস্ময়ে বলিয়াছিল, কিন্তু আশ্রমে তো আপনার একরকম কিছুই হয় না। ভালো একটা জায়গা দেখে কয়েকজন লোককে শুধু থাকতে দিয়েছেন। প্রভু যখন ছিলেন, তখন তবু মাঝে মাঝে দশজন এসে সদুপদেশ শুনবার সুযোগ পেত, এখন—

এখনো পায়।

কে বলেন?

আমি বলি। আশ্রমে যাঁরা আছেন, তাঁরাও বলেন। লোকজন আসে? মহেশ চৌধুরী সন্দিক্তভাবে বলিয়াছিল, শুনলাম লোকজনের আসা অনেক কমে গেছে?

মহেশ চৌধুরীর আশ্রম স্থাপিত হওয়ার পর বিপিনের আশ্রমের লোকজনের যাতায়াত আরো কমিয়া গেল একরকম বন্ধই হইয়া গেল বলা চলে। নূতন আশ্রমের উদ্বোধন

উৎসবটা হইল বেশ জমকালো। শহর হইতে দু-চারজন নামকরা লোক আসিল, খবরের কাগজে বিস্তারিত বিবরণও বাহির হইল। বিপিনের আশ্রমে যারা সদানন্দের উপদেশ শুনিতো যাইত, তারা সকলে তো আসিলই, কাছের ও দূরের আরো অনেক গ্রামের নারী পুরুষ ছেলেমেয়ের আবির্ভাব ঘটিল। ভিড় হইল ছোটখাটো একটি মেলার মতো। তার উপর আবার ছিল কাঙালিভোজনের ব্যবস্থা। কদিন ছোটখাটো গ্রামটির উপর দিয়া যে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার প্রবাহ বহিয়া গেল, তা সত্যই অভূতপূর্ব। উৎসব শেষ হইয়া গেল, দূরের যারা আসিয়াছিল সকলেই প্রায় ফিরিয়া গেল, আশ্রমের চিহ্ন হিসাবে খাড়া রহিল কেবল মহেশ চৌধুরীর বাড়ির পাশে বাগানের পিছনের মাঠে মস্ত একটা নূতন চালা আর বাগানের বাঁশের গেটের উপরে এক টুকরো আলকাতরা মাখানো চারকোনা কাঠে সাদা অক্ষরে লেখা শ্রী শ্রী সদানন্দ স্বামীর আশ্রম।

নূতন আশ্রমে মানুষের ভিড় কিন্তু কমিল না, মানুষের মুখে নূতন আশ্রমের আলোচনাও থামিল না। প্রত্যেক দিন দলে দলে লোক আসিয়া নূতন চালার নিচে বসে, মহেশ চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও সদানন্দের বিস্তারিত উপদেশ শোনে, দলে দলে সদানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সদানন্দ যতদিন বিপিনের কাছে ছিল, সাধারণ মানুষের পক্ষে তার শিষ্যত্ব লাভ করা প্রায় অসম্ভব ছিল, অনেক বাছাবাছির পর বিপিন কদাচিৎ যাকে উপযুক্ত মনে করিত তাকেই কেবল সদানন্দ শিষ্য করিত। এখানে সব বাছবিচার তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যে আসে তাকেই সদানন্দ আলিঙ্গন দেয়।

আলিঙ্গনটাই শিষ্যের দীক্ষা। এখানে মহেশ চৌধুরীর পরামর্শে অথবা অনুরোধে এই নূতন প্রথায় দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। মেয়েদের জন্য ব্যবস্থাটা অবশ্য অন্য রকম, দু পায়ের পাতার উপর মেয়েরা মাথা নামাইলে সদানন্দ মাথার উপর দুটি হাত রাখিয়া তাদের শিষ্যত্ব দান করে। বিভূতি আশ্রমের ম্যানেজার। প্রকাণ্ড একটা বাঁধানো খাতায় সে সকলের নাম, ঠিকানা এবং প্রণামীর পরিমাণটা লিখিয়া রাখে।

মন্ত্রশিষ্যও করা হয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম। মন্ত্রের জন্য বিশেষভাবে যারা আবেদন করে ও আগ্রহ জানায়, কেবল তাদেরই কানে সদানন্দ মন্ত্রদান করে।

মহেশ চৌধুরীই একদিন সবিনয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিয়া সদানন্দকে বুঝাইয়া দিয়াছিল, হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল, প্রভু, গুরু অনেকের আছে, গুরু ত্যাগ করাটা ঠিক উচিত কাজ হয় না। মন্ত্র দেওয়া তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শুধু মন্ত্র নিয়ে শিষ্য হবার নিয়ম করলে যারা আগেই মন্ত্র নিয়েছে তাদের বড় মুশকিল হবে। এমনি শিষ্য হতে দোষ নেই, উপদেশ শুনবে, সাধন-ভজন, পূজা-অর্চনার নিয়মকানুন জেনে যাবে, সৎকাজে যোগ দেবে, আশ্রমের নিজের লোক হয়ে থাকবে তাই যথেষ্ট। এভাবে শিষ্য করলে কারো আশ্রমে যোগ দিতে কোনো অসুবিধা থাকবে না।

সদানন্দ একটু খুঁতখুঁত করিয়া বলিয়াছিল, কিন্তু নির্বিচারে সকলকে—

মহেশ চৌধুরী বলিয়াছিল, বেশি বাছাবাছি করে লাভ কি প্রভু? সবাইকে নিয়ে আমাদের ক্ষতিও কিছু নেই। ফাঁকিবাজ বাজে লোক হয়, খাতায় শুধু তার নামটা থাকবে। শিষ্য হলেও শিষ্য হয়েছে বলেই বিশেষ কোনো অধিকার দেওয়া হবে না যে ক্ষতি করবার সুবিধা পাবে। ক্ষতি করার ইচ্ছা যদি কারো থাকে, শিষ্য হিসাবে খাতায় নাম উঠলেও যতটা সুযোগ পাবে, শিষ্য না হয়েও ততটা সুযোগ পাবে।

শুনতে শুনতে সদানন্দের মনে হইয়াছিল, মহেশ চৌধুরী বুঝি তাকে আশ্রম পরিচালনার কায়দা-কানুন শিখাইয়া দিতেছে গুরু যেমন শিখায়। মহেশ চৌধুরীর মুখে বিনয় ও ভক্তির স্থায়ী ছাপ থাকে, জোড় হাতে দেবপূজার মন্তোচ্চারণের মতো করিয়া সে কথা বলে, তবু আজকাল প্রায়ই সদানন্দের এ রকম মনে হয়। মনে হয়, এর চেয়ে বিপিন যেন ভালো ছিল, অন্তরালে সে তর্ক করিত, উপদেশও দিত, হুকুমও দিত, কিন্তু সে সব ছিল বন্ধুর মতো, তার কাছে নিজেকে এতটা অপদার্থ মনে হইত না।

আরো একটা ব্যাপার সদানন্দ লক্ষ করে। তার নামে আশ্রম করা হইয়াছে, সে-ই একরকম ভিত্তি এই আশ্রমের, অথচ খাতির যেন লোকে তার চেয়ে মহেশ চৌধুরীকেই করে বেশি লোকের কাছে নিজের দামটা আগের চেয়ে যে কমিয়া গিয়াছে, এটা সদানন্দ স্পষ্টই অনুভব করিতে পারে। সকলের মুখে আর যেন আগের সেই ভক্তির ছাপটা খুঁজিয়া

মেলে না, সকলের কথায় ও ব্যবহারে মানুষের বদলে নিজেকে আর দেবতা হিসাবে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায় না। মহেশ চৌধুরীর উপরে লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা যেন হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে দিন দিন। এত যে ন্যাকামি মহেশ চৌধুরী করে, সকলের কাছে সব সময় মোসাহেবের মতো নত হইয়া থাকে তবু!

মাঝে মাঝে সদানন্দ সন্দেহমূলক ক্ষীণ একটা অনুভূতির মধ্যে নিজের চালচলনের ভাঙনধারা পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ওঠে। আগের মতো তেজ কি আর তার নাই? আগের সেই সহজ আত্মবিশ্বাস? একটু একটু ভয় কি সে করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে সাধারণ তুচ্ছ মানুষগুলিকে? মানুষের সংস্পর্শে আসিলে মাঝে মাঝে হঠাৎ সদানন্দ নিজেকে যাচাই করিবার চেষ্টা করে, কোথায় কি চিলা হইয়া গিয়াছে তার নিজের মধ্যে যা সকলে টের পাইয়া যাইতেছে? টেরও কি পাইয়া যাইতেছে সত্য সত্যই? আর কিছুই সে ভালো করিয়া বুঝিতে পারে না, মৃদু একটা অস্বস্তিবব্বাধের। স্থায়ী অস্তিত্ব ছাড়া, আত্মবিশ্লেষণের অন্যমনস্কতা সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হইবার পর যেটা আরো বেশি জোরালো হইয়া পড়ে। সদানন্দ জানে, খুব ভালো করিয়াই জানে, এমন কোনো পরিবর্তন তার বাহিরে প্রকাশ পায় না, কারো পক্ষে যেটা লক্ষ করা সম্ভব। তবু মনটা কেন যে খুঁতখুঁত করিতে থাকে। আগে কথা বলার মধ্যেও একটা বিস্ময়কর আনন্দ ছিল, নিজের কথা শুনিতে শুনিতে নিজেই সে মুগ্ধ হইয়া যাইত, সকলের অভিভূত ভাব দেখিয়া নিজের মধ্যে একটা অপার্থিব শক্তির সঞ্চার অনুভব করিত। এখন কথা হয়তো সে বলে আগের মতোই, সামনের ভীৰু অসহায় আর অসুখী শিষ্যগুলিকে সুখ ও শান্তির সন্ধান দিবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা যে তার আছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই হয়তো বলার সময়টা তার থাকে না, কিন্তু তারপর একসময় তার মনে হইতে। আরম্ভ হয়, সমস্ত জড়াইয়া ফলটা সুবিধাজনক হইল না। এই ভীৰু অসহায় আর অসুখী শিষ্যগুলির মনে তার ব্যক্তিত্ব ও উপদেশের প্রভাব আগের মতো কাজ করিতেছে না। করা সম্ভবও নয়, কারণ নিজেই কি সে বুঝিতে পারিতেছে না যে, আর সব ঠিক আগের মত থাকিলেও, সমগ্রভাবে ধরিলে তার ব্যক্তিত্ব ও উপদেশের প্রভাবটা আর আগের মতো নাই?

ব্যাপারটা সদানন্দের বড়ই দুর্বোধ্য মনে হয়। কোনো কারণ খুঁজিয়া পায় না। কখনো সে ভাবে, সব কি তার নিজের কল্পনা, আজকাল একটু কল্পনাপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে? কখনো ভাবে, এখানকার প্রকাশ্য খোলাখুলি জীবন ভালো লাগিতেছে না বলিয়া, সব বিষয়ে বিরক্তি জাগিতেছে। বলিয়া, এ রকম হইতেছে? বিপিনের মতো একজন তাকে আড়াল করিয়া রাখে না, অধিকাংশ সময় নিজের একটি কুটিরের অন্তরালে নিজের মনে একা থাকার সুযোগ পায় না, সেই জন্য কি আনন্দ, উৎসাহ, শান্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে? অথবা মাধবীলতার জন্য মন কেমন করিতেছে, চিরদিনের জন্য মেয়েটা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া?

কিন্তু মাধবীলতার জন্য বিশেষ কোনো কষ্ট হইতেছে, তাও সদানন্দের মনে হয় না। প্রথমটা সত্যই বড় রাগ হইয়াছিল, পছন্দসই একটা খেলনা হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া সকাইয়া গেলে ছোট ছেলের যেমন অবুঝ রাগ হয়, খেলনাটা একেবারে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিবার সাধ জাগে, কিন্তু সে সব সাময়িক প্রতিক্রিয়া কি মিটিয়া যায় নাই? মাধবীলতাকে দেখিলে এখন কি একটা বিতৃষ্ণার ভাবই জাগে না তার?

অন্য একটা কারণেও মাধবীলতার উপর আজকাল মাঝে মাঝে সদানন্দের রাগ হয়। মাধবীলতা প্রাণপণে তাকে এড়াইয়া চলে। কথা তো বলেই না, সামনে পড়িলে তাড়াতাড়ি সরিয়া যায়। মাঝে মাঝে মহেশ চৌধুরীর পারিবারিক সাক্ষ্য মজলিসে বাধ্য হইয়া যদি বা হাজির থাকে, সদানন্দের যতটা তফাতে সম্ভব, পারিলে একেবারে পিছন দিকে বসিবার চেষ্টা করে।

একদিন খুব ভোরে বারান্দায় মাধবীলতাকে একা দেখিয়া সদানন্দের একটু আলাপ করার শখ চাপিয়াছিল। নিছক আলাপ, আর কিছু নয়। হাসিমুখে সে বলিয়াছিল, এই যে মাধু। তোমার যে আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না।

আমার বিয়ে হয়ে গেছে জানেন? বলিয়া মাধবীলতা তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। মাধবীলতার বাড়াবাড়িতে সদানন্দের বড় জ্বালা বোধ হয়, সেই সঙ্গে হাসিও পায়। এত

অবিশ্বাস কেন তাকে? এ রকম হীন অমানুষ মনে করা? কি ছেলেমানুষ মাধবীলতা! তাই বটে, মেয়ে জাতটাই এরকম উদ্ভট হয় বটে!

এ সব ছাড়াও সদানন্দের মানসিক জগতে আরো একটা ব্যাপার ঘটে, যেটা আরো গুরুতর, আরো মারাত্মক, আরো বিস্ময়কর, আরো গভীর এবং আরো অনেক কিছু। অন্য কেউ নিজের মনের এরকম একটা অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলে, সে সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়া নিত লোকটার মাথা খারাপ হইয়াছে, কিন্তু নিজের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটায় সে বেশ বুঝিতে পারে মাথা খারাপ হওয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক নাই, এটা মনোবিকার নয়, মনের মধ্যে তার এলোমেলো হইয়া যায় নাই কিছুই। যা কিছু অজানা ছিল, বুদ্ধির অগম্য ছিল, দুর্বোধ্য সঙ্কেতের মতো সে সব অস্পষ্ট স্পষ্টতা লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এতকাল নিজের সমগ্র নিজস্বতা বলিয়া যা সে জানিত, পরিবর্তনহীন বিচ্ছিন্নতা বজায় থাকিয়াও ওই অভিনব স্পষ্টতার সঙ্গে একটা আতঙ্কময় ফাপর-ফাপর ভাবের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সদানন্দ জানে সব সে বুঝিতে পারিতেছে, তবু বার বার নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া সে ব্যর্থ হইয়া যায়। বুঝাইবার চেষ্টাটা হয় নানা ভাবে। ধরা যাক, প্রকাণ্ড গভীর একটা বন, যার মধ্যে আনুমানিক আবছা অন্ধকার, বাঘ, ভালুক, সিংহ, চিরস্থায়ী ভয় ও বিষাদ-বনের ঠিক বাইরে ঝলমলে সূর্যালোকে দাঁড়াইয়া অজ্ঞাত কারণের অসহ্য শোকে শান্ত ও নির্বিকার সদানন্দ চুপচাপ গা এলাইয়া দিয়া মাটি হইতে কয়েক হাত উঁচুতে বাতাসে ভাসিতেছে। এরকম আরো কয়েকটা ইচ্ছাকৃত স্বপ্নের সাহায্যে সদানন্দ নিজের কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করে, নিজের মনের অপূর্ব ব্যাপারটা বুঝিতে পারে বলিয়া তার যে ধারণা আছে, সেটা মিথ্যা নয়। কিন্তু স্বপ্ন দেখার সময় স্বপ্ন যা থাকে এবং জাগিয়া থাকার সময় স্বপ্ন যা হইয়া যায়, তার পার্থক্যটা ঘুচাইয়া দিবার মতো ক্ষমতা তার হয় না, তাই ঘুমন্ত অবস্থার স্বাভাবিক স্বপ্নকে জাগ্রতাবস্থায় ব্যাখ্যা হিসাবে সামনে খাড়া করিয়া জাগ্রত অবস্থার স্বাভাবিক স্বপ্নের সঙ্গে কোনো মিল সে খুঁজিয়া পায় না। জাগ্রত অবস্থার কল্পনার স্বপ্ন হইলেও কথা ছিল, বিশেষ প্রশ্ন না দিলেও বিচিত্র, উদ্ভট আর অসম্ভব অনেক কিছুকে সম্ভব ধরিয়া নিয়া খাপছাড়া

আনন্দ উপভোগের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সদানন্দের পরিচয় আছে। কিন্তু সে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।

একবার কেবল সদানন্দের মনে হইয়াছিল, এই কি প্রেম, প্রিয়কে হারানোর পর প্রেম যা হয়, আসল খুঁটি প্রেম? মাধবীলতাকে হারানোর পর হইতেই তো তার মধ্যে এরকম হইতেছে? কিন্তু নিজের কাছে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিয়া ব্যাকুলতা এত সহজে মিটাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই। অজানা ও দুর্বোধ্য স্মৃতি হোক, উপলব্ধি হোক, ক্ষয়িতমূল আত্মবিকাশের বিচ্ছিন্ন অংশ হোক, অথবা আর যাই হোক, স্পষ্টতর হওয়ার যে প্রক্রিয়া চলিতে থাকে, তার সঙ্গে মাধবীলতার কোনো সম্পর্ক নাই। মাধবীলতা সম্বন্ধে মানসিক দুর্বলতা ঘটিবার একটা আশঙ্কা মনে আসিয়াছিল, সেই আশঙ্কাটার জন্যই এ ধরনের কথা সদানন্দের মনে আছে।

এক সময় হঠাৎ দরজা বন্ধ করিয়া সদানন্দ ঘরের কোণে মাটিতে বসিয়া পড়ে, আসন থাকিলেও মনে থাকে না। মেরুদণ্ড সিধা করিয়া বসে, চোখ বন্ধ করে, হাত জোড় করে ইচ্ছায়ও নয়, অনিচ্ছায়ও নয়। বিড়বিড় করিয়া বলিতে থাকে হে ঈশ্বর দয়া কর। ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাক, এ সময় আমায় দয়া কর। তুমি তো জান আমি স্বীকার করি না তুমি আছ, তবু যদি থাক, দয়া কর। তুমি তো সব জান-তুমি তো জান কি উদ্দেশ্যে আমি এখন মেনে নিচ্ছি যে তোমায় আমি স্বীকার করি না-তোমায় স্বীকার করি না মেনে নেওয়ার উদ্দেশ্যটা কেন মেনে নিচ্ছি তাও তো তুমি জান-কথা জড়াইয়া সদানন্দের কথা বন্ধ হইয়া যায়। মাথাটা প্রণাম করার ভঙ্গিতে মাটিতে ঠেকাইয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে।

এমনিভাবে ভাবোজ্ঞাসের নেশায় সদানন্দ অন্যমনস্কও হয়, নিজেকে শান্ত ও শান্ত করিয়া ঘুমও পাড়ায়।

আশ্রমের বড় চালাটার পাশে সদানন্দের জন্য একখানা নূতন ঘর তোলা হয়। সদানন্দ হাসিয়া বলে, বাড়িতে রাখতে ভরসা হচ্ছে না মহেশ।

মহেশ আহত হইয়া বলে, প্রভু?

আহা, এত সহজে ঘা খাও কেন বল তো মহেশ? তামাশা বোঝ না?

সুন্ধ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মহেশ হঠাৎ বলে, না প্রভু, আমি সত্যই বড় অপদার্থ। আপনি যা বললেন, ওই জন্যই আপনাকে সরিয়ে দিচ্ছি।

মহেশ চৌধুরীর মুখে কথাটা এমন খাপছাড়া শোনায়, বলিবার নয়। অন্তঃপুরে তাকে স্থান দিতে সাহস না হওয়াও মহেশের পক্ষে যেমন আশ্চর্য, তার সামনে এ ভাবে স্বীকার করার সাহস হওয়াও তার চেয়ে কম আশ্চর্য নয়। এই মহেশ চৌধুরীই না হাতুড়ি দিয়া নিজের মুখে আঘাত করিয়াছিল, মাধবীলতাকে অপমান করার জন্য সদানন্দের উপর ছেলের রাগ হওয়ার প্রায়শ্চিত্ত বাবদে?

আমায় তুমি আর বিশ্বাস কর না, না মহেশ।

বিশ্বাস করি বৈকি প্রভু, আপনি তো দেবতা। তবে সাধনার যে স্তরে আপনি পৌঁছেছেন, এখন আর আপনাকে ঘর-গেরস্থালির মধ্যে রাখতে ভরসা হয় না। আপনার জন্যে সারাদিন আমার বুকের মধ্যে কাপে প্রভু। আমি এ অবস্থাটা পার হতে পারি নি প্রভু, তবে আমি তো অপদার্থ বাজে লোক, আমার সঙ্গে আপনার তুলনাই হয় না-আপনি পারবেন। আপনি নিশ্চয় পার হয়ে যাবেন।

সদানন্দ ভূঁকুঁচকাইয়া মহেশ চৌধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, বুঝিয়াও যেন বুঝিয়া উঠিতে পারে না মানুষটাকে, দ্বিধা সন্দেহ ভয় শ্রদ্ধা মমতা প্রভৃতি কত বিভিন্ন মনোভাব যে পলকে উদয় হয়, তার হিসাব থাকে না। যা বলিল মহেশ চৌধুরী তাই কি তবে ঠিক? মিথ্যা কথা তো মহেশ বলে না। কেমন করিয়া লোকটি সম্বন্ধে এই ধারণাটা তার নিজের মনেই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, নিজেই সদানন্দ তা জানিতে পারে নাই, কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যে এই ধারণাটি আর সব মনোভাবকে যখন চাপা দিয়া মাথাচাড়া দিয়া ওঠে, তখন

সদানন্দ এক অদ্ভুত কাজ করিয়া বসে। হঠাৎ মহেশের পায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বলে, মহেশ, আমায় তুমি রক্ষা কর-বাঁচাও আমায়।

তিন সন্ধ্যা পরম ভক্তিতরে যার পায়ের ধূলা মাথায় ঠেকায়, তাকে এই ভাবে পায়ে পড়িতে দেখিয়া মহেশ চৌধুরীর মূর্ছা যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মানুষটা সে সত্যই খাপছাড়া। আরো কত তুচ্ছ কারণে কতবার যে ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু এখন ব্যাকুলতার বদলে আত্মপ্রতিষ্ঠাই যেন তার বাড়িয়া যায়। সহজভাবেই সে বলে, প্রভু, এ রকম করবেন না। এই জন্যই তো গেরস্থালির ভেতর থেকে আপনাকে সরিয়ে দিচ্ছি। আপনাকে রক্ষা করার ক্ষমতা কি আমার আছে প্রভু? নিজেকে আপনার নিজেরই রক্ষা করতে হবে ভেবে দেখুন, নিজেকে আপনার নিজেরই রক্ষা করতে হবে।

তারপর সদানন্দ উঠিয়া বাগানে চলিয়া যায়, লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ সদানন্দ। গেরস্থালি! কতবার মহেশ কথাটা উচ্চারণ করিয়াছে। মানুষটা কি কম চালাক মহেশ, কম ফন্দিবাজ! মেয়েমানুষ নয়, গেরস্থালি! গেরস্থালির মধ্যে সদানন্দকে আর রাখিতে ভরসা হইতেছে না, তাই মহেশ তাকে সরাইয়া দিতেছে! বাগান হইতে সদানন্দ মাঠে যায়, সেখানে নেংটি পরা কে যেন একটা মানুষ একটা বাধা গরুকে প্রাণপণে মারিতেছিল। দেখিয়াই প্রাণপণে ছুটিতে ছুটিতে কাছে গিয়া সদানন্দ লাঠিটা ছিনাইয়া লইয়া লোকটাকে এক ঘা বসাইয়া দেয়। এমন করে মারহিস, লাগে না। গরুটার? তারপর লাঠিটা ফেলিয়া দিয়া লোকটার যেখানে মারিয়াছিল সেখানে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলে, আহা তোমার লেগেছে বাবা? তারও পরে লোকটিকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া মহেশকে বলে, একে একটা টাকা দিয়ে দাও তো মহেশ।

গরিব-চাষাভূষা মানুষ সাধু-সন্ন্যাসী দেখিয়াই ভড়কাইয়া যায়। তার উপর, সাধুটি কে, তাও তার অজানা ছিল না। খতমত খাইয়াই ছিল, এতক্ষণে বলিল, মোটে একটা, আঙুর?

শুনিয়াই তো সদানন্দ চটিয়া গেল। ওরে হারামজাদা, যা করে মারছিলি গরুটাকে, তাকে খুন করে ফেলা উচিত ছিল। তার বদলে একটা টাকা দিচ্ছি, তাতে তোমার পোষাল না? যা এখান থেকে, ভাগ, কিছু পাবি না তুই।

আজ্ঞে না কর্তা, যা দিবেন মাথা পেতে লিব।

কিছু দেবে না তোক-একটি পয়সাও নয়। যা এখান থেকে-গেলি? দিও না মহেশ, খপদার দিও না।

রাগের মাথায় সদানন্দকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া টাকার আশা ছাড়িয়া লোকটি তখনকার মতো পালাইয়া যায়। টাকাটা কোমরে গুঁজিয়া সদানন্দ দাঁড়াইয়া থাকে। ঘণ্টাখানেক পরে আশ্রমের চালার নিচে মস্ত আসর বসিলে সকলের সামনেই জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সদানন্দ বলে, আমার মনটা বড় দুর্বল হয়ে গেছে, মহেশ।

মহেশ চৌধুরী ভরসা দিয়া বলে, তা তো যাবেই প্রভু?

ভরসা পাওয়ার বদলে সদানন্দ কিন্তু আবার ভয়ানক চটিয়া ধমক দিয়া বলে, যাবেই মানে? কি যে তুমি পাগলের মতো বল, তার ঠিক নেই।

## ১৪. সদানন্দ ভাবে

সদানন্দ ভাবে : আমি নিজে যে কি সাধনা করছি, আমি নিজে তা জানি না কেন? সাধনার কোন স্তরে আমি পৌঁছেছি, আমার চেয়ে মহেশ চৌধুরী তা বেশি জানে কেন? ব্যাপারখানা কি?

নিজের কাছে ফাঁকি খুব ভালোরকমেই চলে কিনা, সদানন্দ তাই ভাবিয়া পায় না ঠিক কোন্ প্রক্রিয়ায় কি ভাবে কোন সাধনাটা সে কবে করিয়াছে। আসন করিয়া অনেক সময় বসিয়া। থাকিয়াছে বটে, আবার অনেক সময় বসিয়া থাকেও নাই। কিন্তু আসন করিয়া বসিয়া থাকিলেই কি সাধনা হয়, আর কোনো রীতিনীতি নিয়ম-কানুন সাধনের নাই? আসন করিয়া বসিয়াই থাক আর বিছানায় চিৎ হইয়া পড়িয়াই থাক, চিন্তা সে যে একরকম সব সময়েই করে, জীবনের তুচ্ছতম বিষয়টির মধ্যে রহস্যময় দুর্বোধ্যতা আবিষ্কার করা হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট রহস্যগুলির ফাঁকি ধরিয়া ফেলা পর্যন্ত নানা ধরনের বিচিত্র চিন্তায় মশগুল হইয়া সে যে দিন কাটাইয়া আসিতেছে, এটা তার খেয়াল হয় না। দিনের পর দিন নিজেকে নূতন চেনায় চিনিয়াছে, আবার নূতন অচেনায় আত্মহারা হইয়া গিয়াছে। এ ব্যাপারটাকে সদানন্দ সাধারণ বাঁচিয়া থাকার পর্যায়েই ফেলে। এক একজন মানুষ থাকে যারা ঘরে বসিয়া এলোমেলো লেখাপড়া করে, আগে শেষ করে দ্বিতীয়ভাগ, তারপর ধরে প্রথমভাগ, জ্ঞান হয়তো তাদের জমা হয় অনেক ডিগ্রিধারী নামকরা জ্ঞানীর চেয়ে বেশি, কিন্তু জ্ঞান বলিয়া কিছু যে তারা সংগ্রহ করিয়াছে, এ ধারণাটাই তাদের মনে আসে না। ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভাঙিয়া যেখানে উঠিতে হয়, বাঁশের খুঁটি বাহিয়াও যে সেইখানেই উঠিয়া পড়িয়াছে, উঠবার পরও অনেকে তা বিশ্বাস করিতে চায় না। সাধু-সন্ন্যাসীর যোগসাধনার বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ হইলেও বরং কথা ছিল এসব যে ছেলেখেলা নয়, সদানন্দ তা ভালো করিয়াই জানে। নিজের অজ্ঞাতসারে সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া চলা এবং কঠিন ও বিপজ্জনক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছানো যে কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে, কোনোমতেই তার মাথায় ঢুকিতে চায় না।

রাতদুপুরে ঘুম আসে না। অনেকক্ষণ ছটফট করিয়া মহেশ চৌধুরীকে ডাকিয়া পাঠায়।

ভয় করছে প্রভু?

প্রশ্ন শুনিবামাত্র সদানন্দ টের পায়। এতক্ষণ ভয়ই করিতেছিল বটে। একটা দুর্বোধ্য বীভৎস আতঙ্ক মনের মধ্যে চাপিয়া বসিয়াছে।

তবু সাহস করিয়া সদানন্দ বলে, তুমি ভুল করছ মহেশ। আমি তো কোনোদিন সাধন-ভজন কিছু করি নি।

রাতদুপুরে জেগে বসে এই যে হিসাব করছেন সাধন-ভজন কিছু করেছেন নাকি, এটা কি প্রভু?

সদানন্দ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে।

জোড় হাতে সবিনয়ে মহেশ চৌধুরী সদানন্দকে নানারকম উপদেশ দেয়। সদানন্দ নিজে কেন। জানে না সে সাধক? কেন জানিবে! সাধক যে নিজেকে সাধক বলিয়া জানে, সেই জানাটা কি, সদানন্দ কি কখনো ভাবিয়া দেখিয়াছে? অনন্যসাধারণ প্রক্রিয়াগুলি ওই জ্ঞানের জন্ম দেয় আর যতদিন সাধক ওই জ্ঞানকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে না পারে, ততদিন সিদ্ধিলাভের কোনো ভরসাই থাকে না। সদানন্দের জানিবার তো কোনো কারণ ঘটে নাই যে সে সাধনা করিতেছে, প্রক্রিয়া সে ঠিক করিয়া গিয়াছে নিজে, ও সব তার কাছে বাঁচিয়া থাকারই অঙ্গস্বরূপ। তাছাড়া, যে রকম সাধনা সে কোনোদিন করে নাই, লোকের কাছে নিজেকে সেইরকম সাধক বলিয়া পরিচিত করার ফলে মনে মনে একটা তার ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, সাধনার ব্যাপারে সে ফাঁকিবাজ। আসলে কিন্তু

আমি যে ফাঁকিবাজ তাও দেখছি তুমি জান মহেশ?

ফাঁকিবাজ তো আপনি নন প্রভু!

সদানন্দ চটিয়া বলে, এই বলছ লোককে ফাঁকি দিই, সঙ্গে সঙ্গে আবার বলছ ফাঁকিবাজ নই, তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারি না মহেশ।

আজ্ঞে, দশজনকে জানিয়েছেন, আপনি সাধু তাতে তো ফাঁকিবাজি কিছু নেই। দশজনের ভালোর জন্য নিজেকে সাধু ঘোষণা করাও সাধু ছাড়া অন্যের দ্বারা হয় না প্রভু। নিজের জন্য তো চান নি, লোকে সাধু ভাবুক, অসাধু ভাবুক, আপনার বয়ে গেল!

সদানন্দ সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িয়া বলে, নিজের জন্য চেয়েছিলাম কিনা কে জানে!

না প্রভু, না। তাই কি আপনি পারেন?

খানিক পরে প্রকারান্তরে সদানন্দ মহেশ চৌধুরীকে এখানে শুইয়া থাকার অনুরোধ জানায়, কিন্তু মহেশ রাজি হয় না। বলে যে, ভয়কে এড়াইবার চেষ্টা করিলে তো চলিবে না, ভয়কে জয় করিতে হইবে।

মহেশ চৌধুরীর তুলনায় নিজেকে সদানন্দের অপদার্থ মনে হয়।

গভীর হতাশায় মন ভরিয়া যায়, রাগের জ্বালায় দেহের কি যেন সব পুড়িয়া যাইতে থাকে। মহেশ চৌধুরীর বাঁচিয়া থাকার কোনো মানে হয় না, এই ধরনের উদ্ভট চিন্তা অসংখ্য খাপছাড়া কল্পনার আবরণে আসিয়া ভিড় করে। ক্রমে ক্রমে একটা বড় আশ্চর্য ব্যাপার সে লক্ষ করে। মহেশ চৌধুরীর একটা বড় রকম ক্ষতি করার চিন্তাকে প্রশ্রয় দিলেই হঠাৎ নিজেকে যেন তার সুস্থ মনে হইতে থাকে, দেহ মনের একটা যন্ত্রণাদায়ক অসুস্থ অবস্থা যেন চোখের পলকে জুড়াইয়া যায়। যে আতঙ্কময় ফাপরাপর ভাবটা আজকাল তাকে থাকিয়া থাকিয়া আক্রমণ করে, আর যেন তার পাত্তাই পাওয়া যায় না। মহেশ চৌধুরীকে মনে মনে হিংসা করিবার সময়টা জাগ্রত স্বপ্নের প্রভাব হইতে সে মুক্তি পায়, মাথার ঝিমঝিমনি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। বাতাসে ভাসিয়া বেড়ানোর বদলে হঠাৎ যেন শক্ত মাটিতে দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া টের পায়।

মহেশ চৌধুরীকে তীব্রভাবে ঘৃণা করিয়া, দশজনের কাছে তাকে হীন প্রতিপন্ন করার সম্ভব অসম্ভব মতলব আঁটিয়া, আর নিজেকে তার চেয়ে ছোট মনে করার প্রতিক্রিয়ায় জর্জরিত হইয়া গিয়া, সদানন্দ আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। অন্তত তার তাই মনে হয়। ভয়টা যে এড়ানো যায়, রক্ত চলাচল শ্লথ করিয়া দেওয়ার মতো উত্তেজনাবিহীন সর্বগ্রাসী ভয়, তাও কি কম? মহেশ চৌধুরী অবশ্য ভয় এড়ানোর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এসব ব্যাপারের সে কি বোঝে, কি দাম আছে তার উপদেশের? সদানন্দকে উপদেশ দিতে আসে, স্পর্ধাও কম নয় লোকটার!

দিন কাটিয়া যায়। মহেশ চৌধুরী শান্ত চোখে সদানন্দের চালচলন আর ভাবভঙ্গি লক্ষ করে। মুখখানা যেন তার দিন দিন অল্পে অল্পে বিষণ্ণ ও গম্ভীর হইয়া উঠিতে থাকে।

একদিন মহেশ চৌধুরী বলে, প্রভু?

সদানন্দ একটা শব্দ করে, যেটা জবাব হিসাবে ধরা যায়, আবার অবজ্ঞা হিসাবেও ধরা যায়।

আর এগোতে পারছেন না প্রভু, না?

কিসের এগোতে পারছি না? কে বললে তোমাকে, এগোতে পারছি না?

মহেশ চৌধুরীর চোখ ছলছল করিতে থাকে, এগোতে না পারলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, পিছিয়ে আসছেন কেন প্রভু? এখন পিছু হটতে শুরু করলে কি আর উপায় আছে। প্রথমটা একটু ভালো লাগে, কিন্তু দুদিন পরে নিজের হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছা হবে। এমন যন্ত্রণা পাবেন, এখন তা ভাবতেও পারবেন না।

তোমার উপদেশ বন্ধ কর তো মহেশ।

উপদেশ নয়, কথাটা মনে পড়িয়ে দিচ্ছি। নিজেই বুঝে দেখুন, কি বিপদ ঘটছেন নিজের।

সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারলেও সদানন্দ কিছু কিছু বুঝিতে পারে। মহেশ চৌধুরীর সম্মুখ হইতে ছুটিয়া পালানোর এরকম জোরালো ইচ্ছা আগে তার হইত না এবং মহেশ চৌধুরীর দিকে চোখ তুলিয়া চাহিবার কাজে এতটা শক্তিক্ষয়ও করিতে হইত না! নূতন একটা অনুভূতি আজকাল তার কাছে ধরা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, মানুষের জীবনের ব্যর্থতার অনুভূতি। অনুভূতিটা একেবারে নূতন, এ পর্যন্ত চাপা পড়া সঙ্কেতের মতো কোনোদিন অনুভব করে নাই। মানুষের জীবনের ব্যর্থতার কথা অবশ্য সে অনেক ভাবিয়াছে, মাঝে মাঝে গভীর বিষাদে হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে যেন ছিল অন্য জিনিস। রোগে শোকে একজন মানুষকে কষ্ট পাইতে দেখিলে সহানুভূতির মধ্যে যে বিষাদ জাগিত, সমস্ত মানুষের জীবনের মূল্যহীনতা জাগাইয়া তুলিত সেই বিষাদ। কিন্তু এখন সে যা অনুভব করে, সেটা যেন ঠিক বিষাদ নয়। মানুষের বাঁচিয়া থাকার কোনো অর্থ নাই, তার নিজের জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত লোক বাঁচিয়া ছিল, তাহাদের জীবনও ব্যর্থ এবং ভবিষ্যতে যত লোক পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে, তাদের জীবনও ব্যর্থ-কিন্তু তাতে যেন কিছু আসিয়া যায় না। ব্যর্থতার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর নাই, জীবনের প্রতিকারহীন জীবনব্যাপী ব্যর্থতা। অথচ তাও যেন সদানন্দের কাছে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। নির্বিকার ভেতা একটা ক্ষোভ শুধু সে অনুভব করে। জ্বর আসিবার আগে শরীর ম্যাজম্যাজ করার মতো এটা কি ভয়ানক কিছুর সূচনা? মহেশ চৌধুরীর আলোচনা এই প্রশ্ন আর ভয় তার মধ্যে জাগাইয়া দেয়।

মহেশ চৌধুরীর ভক্তিশ্রদ্ধা ক্রমে ক্রমে যেন কমিয়া আসিতে থাকে। জোড় হাতে ছাড়া সদানন্দের সঙ্গে সে একরকম কথাই বলিত না, আজকাল হাত জোড় করিতে ভুলিয়া যায়। প্রভু শব্দটাও তার মুখে শোনা যায় কদাচিৎ। মহেশ চৌধুরীর ভক্তি শেষের দিকে সদানন্দকে বিশেষ কিছু তৃপ্তি দিত না, কিন্তু ভক্তির অভাব ঘটায় আজকাল তার ভয়ানক রাগ হয়।

সভায় কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া সে সকলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দ্যাখে। মহেশ চৌধুরীর মতো অন্য সকলের ভক্তিশ্রদ্ধাও কি কমিয়া গিয়াছে?

এতকাল যাদের সে শিশু মনে করিয়া আসিয়াছে, মতামত নিয়া কোনোদিন মাথা ঘামায় নাই, আজকাল তাদের তাকানোর ভঙ্গিতে অনুকম্পা আর অবজ্ঞা আবিষ্কার করিয়া বুকের মধ্যে হঠাৎ তার ধড়াস করিয়া ওঠে। কি করিয়াছে সে? কার কাছে কি অপরাধ করিয়াছে? কার সঙ্গে কিসের বাধ্যবাধকতায় সে আটক পড়িয়া গিয়াছে? দেহবাদী এইসব অপদার্থ মানুষ কেন তাকে সর্বদা ইঙ্গিত করিতেছে, আমরা কাপুরুষ, কিন্তু হে মহাপুরুষ, তোমার চেয়ে কত সুখেই আমরা বাঁচিয়া আছি।

নিছক ভাবপ্রবণতা? যে জিনিসটা চিরদিন সে এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে? বুঝিয়াও সদানন্দ যেন বুঝিতে পারে না। কোটা মনের দুর্বলতা জানিবার পরেও সেটাকে দমন করা যে এমন কঠিন ব্যাপার, এতকাল তার জানা ছিল না। আগে ঘরের কোণে নিজের ছেলেমানুষির কথা ভাবিয়া তার হাসি পাইত, এমন তুচ্ছ একটা বিষয়কে এত বড় করিয়া তুলিয়াছে কেন ভাবিয়া অবাক হইয়া যাইত আজকাল ছেলেমানুষিকে প্রশয় দেওয়ার দুর্ভাবনায় মাথা যেন তার ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম করে। হাত-পা নাড়ায় বাধা দিলে শিশু যেমন ক্ষেপিয়া যায়, ছেলেমানুষিকে উড়াইয়া দিবার। চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া সদানন্দের সেইরকম উন্মাদের মতো আতর্জনাদ করিতে ইচ্ছা যায়।

একবার বিপিন আসিয়া বলে, তোর চেহারাটা বড় খারাপ হয়ে গেছে সদা।

সদানন্দ রাগিয়া বলে, গেছে তো গেছে, তোর কি?

বিপিন উদাসভাবে বলে, আমার আবার কি! তুই মরলেই বা আমার কি?

ফিরে যাওয়ার সময় মহেশ চৌধুরীর সঙ্গে বিপিনের দেখা হয়। বিপিন হাসিয়া বলে, সাধুজীকে খেতে দেন না নাকি? মুখের চামড়া যে কুঁচকে যেতে আরম্ভ করেছে মশায়?

মহেশ চৌধুরী বলে, না খেলে কি মুখের চামড়া কুঁচকে যায় ভাই? নিজে কুঁচকে দিচ্ছেন, মুখের চামড়ার কি দোষ! বিষণ্ণভাবে মহেশ চৌধুরী মাথা নাড়ে কত আশা করেছিলাম,

সব নষ্ট হয়ে গেল। কি খেলাই যে ভগবান খেলেন। এমন একটা মানুষ আমি আর দেখি নি বিপিনবাবু, অবতার বলা চলত। কি যে হল, নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে ফেলেছেন।

বিপিন অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরী আবার বলে, গুরুর নির্দেশ মেনে সারা জীবন প্রাণপাত করে বড় বড় যোগী ঋষি যে স্তরে উঠতে পারেন না, উনি নিজের স্বাভাবিক প্রেরণায় বিনা চেষ্টায় সে স্তরে পৌঁছেছিলেন। এক একবার আমি ভাবি কি জানেন, আমিই ভুল করলাম নাকি? আমি সচেতন করিয়ে দিয়েছি বলে কি বিগড়ে গেলেন? যেমন অবস্থায় ছিলেন সে অবস্থায় থাকলে হয়তো নিজের চেষ্টায় আপনা থেকে সামলে এগিয়ে চলতেন।

মহেশ চৌধুরীর আফসোস দেখিয়া বিপিন আরো অবাক হইয়া যায়। এতকাল লোকটাকে একটু পাগলাটে বলিয়া তার ধারণা ছিল, আজ হঠাৎ যেন ধারণাটা নাড়া খায়। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মহেশ চৌধুরী আবার বলে, এসব লোকের প্রচণ্ড তেজ আর শক্তি থাকে। যেই জেনেছেন সাধনার পথে এগোতে হবে, অমনি বিদ্রোহ করে বসেছেন। সামনে এগিয়ে দেবার জন্য আমি একটু আধটু ঠেলা দিয়েছি বলেই বোধহয় রাগ করে পিছু হটতে আরম্ভ করেছেন। কি সর্বনাশটাই আমি করলাম বিপিনবাবু?

যা করেছেন, ভালো উদ্দেশ্যেই তো করেছেন।

তবু আমার ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাই উচিত ছিল।

দিন দশেক পরে মহেশ চৌধুরী একদিন সকালে বিপিনের আশ্রমে গেল। বিপিন আশ্রমে ছিল না, উমা আর রত্নাবলী মহেশকে আদর করিয়া বসাইল। আজকাল মহেশ চৌধুরীর সম্মান বাড়িয়াছে-মাধবীলতা তার ছেলের বৌ!

রত্নাবলী বলিল, আপনার ওখানে এবার আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিন?

মহেশ হাসিয়া বলিল, আমাদের ওখানে কি কারো থাকবার ব্যবস্থা আছে?-গিয়ে থাকতে

হয়।

উমা বলিল, আমাদের যেতে দিতে আপনি আপত্তি করছেন কেন বুঝতে পারি না।

আপত্তি? আপত্তি কিসের! তবে জানেন আপনারা গেলে বিপিনবাবু রাগ করবেন কিনা, তাই আপনাদের নিয়ে যাই নি।

বিপিনবাবু রাগ করবেন বলে ইচ্ছে হলে আমরা কোথাও যেতে পারব না। আমরা কি বিপিনবাবুর কয়েদি নাকি?

উঁহু, তা কেন হবেন। আপনাদের ইচ্ছে হলে আপনারা যেখানে খুশি যাবেন, কিন্তু আমার কি নিয়ে যাওয়া উচিত? সে রকম ইচ্ছেও আপনাদের হয় নি যাওয়ার, হলে আপনারা নিজেরাই যেতেন,

জোর করে যেতেন।

থাকতে দিতে গেলে?

থাকতে দিতাম বৈকি।

রত্নাবলী একটু খোঁচা দিয়া বলিল, কিন্তু বিপিনবাবু যে রাগ করতেন?

মহেশ সহজভাবেই বলিল, রাগ করলে কি আর করতাম বলুন। আমি আপনাদের নিয়ে যাই। নি, আপনারা নিজের ইচ্ছায় গিয়েছেন। তাতেও যদি বিপিনবাবু রাগ করতেন-করতেন!

আপনি আশ্চর্য মানুষ! উমা বলিল।

উচিত অনুচিত জ্ঞানটা আপনার যেন একটু বেশি রকম সূক্ষ্ম। সব ব্যাপারেই কি এমন করে বিচার করেন? রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিল।

বিবেক বড় কামড়ায় কিনা, বিচার না করে উপায় কি? বিবেকের কামড় এড়বার সহজ উপায় থাকতে জেনেশুনে সাধ করে কামড় খাওয়া কি বোকামি নয়?

জীবনটা একঘেয়ে লাগে না আপনার? রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিল।

কেন, একঘেয়ে লাগবে কেন? সবাই বিচার করে কাজ করে, আমিও করি। অন্য দশজনে নিজের নিজের বুদ্ধি বিবেচনামত কর্তব্য ঠিক করে, আমিও তাই করি। কেউ জেনেশুনে ভুল করে, কেউ বুদ্ধির দোষে ভুল করে, কেউ কেউ আবার করছে কি না করছে গ্রাহ্য করে না। আমি একটু চালাক মানুষ কিনা, তাই সব সময় চেষ্টা করি যাতে ভুল না হয়। তবু আমিও অনেক ভুল করে বসি। আমার যদি একঘেয়ে লাগে, তবে পৃথিবীর সকলেরই একঘেয়ে লাগবে।

আপনিও তবে ভুল করেন?

করি না? মারাত্মক ভুল করে বসি। সাধুজীকে নিয়ে গিয়ে একটা ভুল করেছি।

উমা ও রত্নাবলী দুজনেই একসঙ্গে বলে, বলেন কি!

আজ্ঞে হ্যাঁ! জীবনে এমন ভুল আর করি নি।

উমা আর রত্নাবলী মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।-কিন্তু বিপিনবাবু ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বলেই তো আপনি-

মহেশ চৌধুরী মাথা নাড়িয়া বলিল, না না, তাড়াবেন কেন? দুজনে একটু মনোমালিন্য হয়েছিল, বন্ধু কিনা দুজনে। বিপিনবাবু তাই রাগ করে-যাকগে, কি আর হবে ওসব কথা আলোচনা করে?

ঘণ্টাখানেক পরে বিপিন ফিরিয়া আসিলে মহেশ চৌধুরী তাকে আড়ালে ডাকিয়া নিয়া গেল। তাকে আশ্রমে দেখিয়াই বিপিন অবাক হইয়া গিয়াছিল, প্রস্তাব শুনিয়া তার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

ওকে ফিরিয়ে আনতে বলছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আগের অবস্থায় ফিরে এলে হয়তো আত্মসংবরণ করতে পারবেন।

ও কি ফিরে আসবে?

আসবেন বৈকি।

বিপিন চুপ করিয়া থাকে। মাঝে মাঝে চোখ তুলিয়া তাকায় আর চোখ নামাইয়া নেয়। তারপর হঠাৎ বলে, দেখুন আপনাকে সত্যি কথা বলি। মাঝে মাঝে আমি যে আপনার ওখানে যেতাম, আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। সদা চলে যাওয়ার পর আমার কতগুলি ভারি মুশকিল হয়েছে। তাছাড়া ছেলেবেলা থেকে আমরা বন্ধু, ওকে ছেড়ে থাকতেও কেমন কেমন লাগছে। তাই ভেবেছিলাম, বলে কয়ে আবার ফিরিয়ে আনব। আমি অনেক বলেছি, ও কিন্তু রাজি হয় নি।

মহেশ চৌধুরী বলিল, তা জানি। আমিও ওই রকম অনুমান করছিলাম।

বিপিন চোখ বড় বড় করিয়া চাহিয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরী আবার বলিল, এতকাল রাজি হন নি, এবার বললেই রাজি হবেন। এখানে উনি ভয়ানক যন্ত্রণা পাচ্ছেন।

## ১৫. বলামাত্র সদানন্দ রাজি হইল না

বলামাত্র সদানন্দ রাজি হইল না, তবে শেষ পর্যন্ত রাজি সে হইয়া গেল। তবে একটা চুক্তি সে করিল বড় খাপছাড়া। প্রথমটা আরম্ভ করিল যেন একটু সলজ্জভাবে, সঙ্কোচের সঙ্গে, বিপিনের হাঁটুর দিকে তাকাইয়া, আমার সব কথা শুনে চলবি?

না।

আর খানিকটা চোখ তুলিয়া সদানন্দ বলিল, কোনো বিষয়ে আমায় জ্বালাতন করবি না? করব।

আর খানিকটা তুলিয়া; আমার কাছে কিছু গোপন করবি না? করব।

তখন সোজাসুজি চোখের দিকে চাহিয়া সদানন্দ বলিল, আরেকটা কাজ করতে হবে আমার জন্যে। মাধুকে আমার চাই।

মাধুকে তোর চাই? কি করবি মাধুকে দিয়ে-ও!

বিপিন হাঁ করিয়া সদানন্দের দিকে চাহিয়া রহিল। এ রকম সদানন্দের সঙ্গে তার কোনোদিন পরিচয় ছিল না। মাধবীলতার জন্য আকর্ষণ অনুভব করা অবস্থাবিশেষে সদানন্দের পক্ষে সম্ভব, অবস্থাবিশেষে হঠাৎ মাথাটা তার মাধবীলতার জন্য খারাপ হইয়া যাওয়াও অসম্ভব নয়, কিন্তু এভাবে কোনো মেয়েমানুষকে চাওয়ার মানুষ সে নয়। যদি বা মনে মনে চায়, লজ্জায়, দুঃখে, ঘৃণায়, লোকের কাছে মুখ দেখাইতে তার অস্বস্তি বোধ হওয়া উচিত। বিপিন নিজেই দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে, সে স্পষ্টই বুঝিতে পারে, মাধুকে পাওয়া সম্বন্ধে চেষ্টা করিবার কথা না দিলে সদানন্দ ফিরিয়া যাইবে না।

কিন্তু মাধুর যে বিয়ে হয়ে গেছে?

তাতে কি?

তাতে কি? তাতে কি? তুই একটা পাঁঠা সদা, আস্ত পাঁঠা। আগে বলিস নি কেন, বিয়ের আগে? তোর কথায় যখন উঠত বসত?

সদানন্দের চোখ জুলিয়া উঠিল-এ জ্যোতি বিপিন চেনে। মানুষকে খুন করবার আগে মানুষের চোখে এ জ্যোতি দেখা দেয়-কি জানিস বিপিন, আগে মেয়েটাকে বড় মায়া করতাম, তখন কি জানি এমন পাজি শয়তান মেয়ে, তলে তলে এমন বজ্জাত! একটা রাত্রির জন্য ওকে শুধু আমি চাই, ব্যস, তারপর চুলোয় যাক, যা খুশি করুক, আমার বয়ে গেল। ওর অহঙ্কারটা ভাঙতে হবে।

এবার বিপিন যেন ব্যাপারটা খানিক খানিক বুঝিতে পারে। মাধবীলতা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, তাই সদানন্দের এত জ্বালা। নিজে সে যাচিয়া মাধবীলতাকে প্রত্যাখ্যানের অধিকার দিয়াছে, তাই আজ প্রত্যাখ্যানের জ্বালা সহ্য হইতেছে না, নয়তো তাকে অবহেলা করার অধিকার কোনো মেয়ের আছে, এ ধারণাই সদানন্দের মনে আসিত কিনা সন্দেহ। নিজে সে মাধবীলতাকে বড় করিয়াছে, মাধবীলতাকে অধিকার দিয়াছে অনেক, নিজের উপভোগের স্বাদ বাড়ানোর জন্য নিজের কামনাকে জোরালো করিয়াছে, ব্যাপক করিয়াছে। নয়তো কে ভাবিত মাধবীলতার কথা

-কেবল মাধবীলতার কথা নয়, সে কি করে না করে আর ভাবে না ভাবে তা পর্যন্ত! বড়জোর একদিন তার কাছে মুচকি হাসির সঙ্গে আফসোস করিয়া বলিত, ঘুড়িটা বড় ফসকে গেল রে বিপিন!

নূতন করিয়া সদানন্দকে আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করিয়া এই ব্যাপারটা নিয়াই বিপিন মাথা ঘামায়। সদানন্দের সম্বন্ধে মহেশ চৌধুরীর কয়েকটা মন্তব্যও সে যেন কম বেশি বুঝিতে পারে। সদানন্দের সংযম সত্যই অসাধারণ ছিল, কারণ তার মধ্যে সমস্তই প্রচণ্ড

শক্তিশালী, অসংযম পর্যন্ত। কেবল তাই নয়, সংযমও তার মাঝে মাঝে ভাঙিয়া পড়ে। কামনার যার এমনিই জোর নাই, ভিতর হইতে যার মধ্যে বোমা ফাটিবার মতো উপভোগের সাধ কোনোদিন ঠেলা দেয় নাই, আত্মজয়ের তো তার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সদানন্দের মতো মানুষ, অতি অল্প বয়সেই যারা নিজের উপর অধিকার হারাইয়া বিগড়াইয়া যাইতে আরম্ভ করে, তার পক্ষে তো হঠাৎ কদাচিৎ অন্যায় করিয়া ফেলিয়াও অন্যায় না করিয়া বাঁচিয়া থাকা, অন্যায় করার অসংখ্য সুযোগের মধ্যে অন্যায় করার সাধ দমন করিয়া চলা, আত্মোপলব্ধির সাংঘাতিক সাধনায় ব্যাপ্ত থাকার মতো মনের জোর বজায় রাখা তো সহজ ব্যাপার নয়। সদানন্দের অনেক দুর্বলতা, অনেক পাগলামির একটা নূতন অর্থ বিপিনের কাছে পরিষ্কার হইয়া যায়। সে বুঝিতে পারে মহেশ চৌধুরীর কথাই ঠিক, ও সব দুর্বলতা শক্তির প্রতিক্রিয়া, ও সব পাগলামি অতিরিক্ত জ্ঞানের অভিব্যক্তি। নিজে সদানন্দ জানি না সে সত্য সত্যই মহাপুরুষ, তাই ভাবিত লোকের কাছে মহাপুরুষ সাজিয়া লোককে ঠাইতেছে। শত শত মানুষ যে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অভিভূত হইয়া যায়, সামনে দাঁড়াইয়া চোখ তুলিয়া মুখের দিকে চাহিতে পারে না, তাও সে ধরিয়া নিয়াছিল শুধু তার নানারকম ছল আর মিথ্যা-প্রচারের ফল। এত বড় বড় আদর্শ সে পোষণ করিত ( হয়তো এখনো করে) যে, নিজের অসাধারণত্বকে পর্যন্ত তার মনে হইত (হয়তো এখনো হয়। সাধারণ লোকের তুচ্ছতার চেয়েও নিচু স্তরের কিছু।

বন্ধুর জন্য বিপিন একটা শ্রদ্ধার ভাব অনুভব করে, বন্ধুর আধুনিকতম এবং বীভৎস ও বিপজ্জনক প্রস্তাবটাও যার তলে চাপা পড়িয়া যায়। যোগাযোগটা তার বড় মজার মনে হয়। মহেশ চৌধুরী যখন সদানন্দকে মনে করিত দেবতা, তখন তার জন্য বিপিনের মনে ছিল প্রায় অবজ্ঞারই ভাব, তারপর সদানন্দের অধঃপতনের জন্য মহেশ চৌধুরীর ভক্তি যখন উবিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন বিপিনের মধ্যে জাগিয়াছে শ্রদ্ধা! মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের নিয়মকানুনগুলি খাপছাড়া নয়?

বিপিনের আশ্রম ত্যাগ করা, মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে বাস করা, নূতন আশ্রম খুলিয়া নূতনভাবে জীবনযাপন করা এবং তারপর আবার নিজের পুরাতন আশ্রমে ফিরিয়া আসা,

নাম ছড়ানোর দিক দিয়া এ সমস্ত খুবই কাজে আসিল সদানন্দের। মহেশ চৌধুরীর আশ্রমে সমবেত নারী-পুরুষের ভক্তিপ্রদ্বা হারানোর যে ভয়টা সদানন্দের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা দিতেছিল সেটা অবশ্য নিছক ভয়, সকলেই শিষ্যত্ব অর্জনের এবং তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার অধিকার আর সুযোগ পাওয়ায় তার সম্বন্ধেই লোকের অস্বাভাবিক ভয়টা কমিয়া আসিতেছিল। বিপিনের সাহায্যে নিজের চারিদিকে সে যে কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিল, মহেশের চেষ্টা ছিল সেটা ভাঙিয়া ফেলিয়া সকলের সঙ্গে তার সম্পর্কটা সহজ করিয়া তোলা। সম্পর্কটা সত্য সত্যই সহজ হইয়া আসিতে থাকায় সদানন্দের মনে হইয়াছিল, লোকের কাছে সে বুঝি নিচে নামিয়া যাইতেছে।

হয়তো নামিয়া যাওয়াই। সংস্কার-নাড়া-দেওয়া ভয়ের ভিত্তিতেই হয়তো দেবতার সর্বোচ্চ আসন পাতা সম্ভব।

সদানন্দের সঙ্গে মহেশ চৌধুরীর আশ্রমের জনপ্রিয়তা যেন শেষ হইয়া গেল, যেদিন পুরাতন আশ্রমে সদানন্দ নূতন পর্যায়ে আসর বসাইল প্রথমবার, সেদিন মহেশ চৌধুরীর আশ্রমে লোক আসিল মোটে দশ-বার জন। সকলে সদানন্দের উপদেশ শুনিতে গিয়াছে—আগে যত লোক আসিত তার প্রায় তিনগুণ। সদানন্দ ভাবিয়াছিল এবার হইতে যতটা সম্ভব মহেশ চৌধুরীর নিয়মেই আশ্রম পরিচালনা করবে, শিষ্য করিবে সকলকেই, নাগালের মধ্যে আসিতে দিবে সকলকেই, কথা বলিবে সহজভাবে। একনজর তাকাইয়াই আর নারী বা পুরুষকে অপদার্থ করিয়া দিবে না। কিন্তু ভিড় দেখিয়া হঠাৎ তার কি যে জাগিল উল্লাস আর গর্ব মেশানো একটা নেশা, মুখের গান্ধীর্যের আর তুলনা রহিল না, যেন গোপন পাপ সব আবিষ্কার করিয়া ফেলিতেছে দৃষ্টির তীব্রতায়, এমনি অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল অনেকের, আর কথা শুনিতে শুনিতে অনেকের মনে হইতে লাগিল তার পায়ে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে মরিয়া যায়।

প্রণামী দিতে গিয়া দু-একজন পায়ে আছড়াইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সুবিধা হইল না!

প্রথম জনকে সদানন্দ বলিল, উঠে বোসো। তিনমাস মাছ, মাংস, মেয়েমানুষ ছুঁয়ো না। এবার যাও-যাও!

দ্বিতীয় জনকে সংক্ষেপে বলিল, পাঁচ বছরের মধ্যে তুমি আমার কাছে এস না।

আগে কেউ বাড়াবাড়ি করার সাহস পাইত না, ভাবপ্রবণতার নাটকীয় অভিব্যক্তি সদানন্দ পছন্দ করে না। মাঝখানে অনেকগুলি ব্যাপার ঘটায় আর সদানন্দ নিজের নূতন পরিচয় দেওয়ায় কয়েকজনের সাহস হইয়াছিল, নূতন লোকও আজ আসিয়াছিল অনেক। কিন্তু পায়ে আছড়াইয়াই পড়ার (তিন টাকা প্রণামী দেওয়ার পরেও) আর হাউ হাউ করিয়া কাঁদতে আরম্ভ করার (প্রণামী-আড়াই টাকা) ফল দেখিয়া সকলের সাহস গেল। সকলের বসিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, সদানন্দ যেন কোথাও কোনোদিন যায় নাই, মাঝখানে প্রায় বছরখানেকের ফাঁক পড়ে নাই, এইখানে আগে যেমন সভা বসিত, আজ একটু বড় ধরনে সেই রকম সভাই বসিয়াছে।

কিন্তু দোকানে ফিরিয়া গিয়া শ্রীধর সেদিন সন্ধ্যার পর মুখখানা যেন কেমন একটু ম্লান করিয়া বলিল ঠাকুরমশায় কেমন যেন বদলে গেছেন। ঠাকুরমশায়ের রাগ তো দেখি নি কখনো, সত্যিকারের রাগ?

ঠিক সেই সময় আশ্রমে নিজের গোপন অন্তঃপুরে সদানন্দ বিপিনকে বলিতেছিল, উমা আর রতনকে দিয়ে মাধুকে আনতে হবে। এই ঘরে মাধুকে বসিয়ে রেখে ওরা চলে যাবে, তারপর আমি না ডাকলে কেউ আমার মহলে আসবে না।

উমা আর রতন? ওরা কেন রাজি হবে?

হবে। আমি বললেই হবে।

তা হবে না। এ রকম মতলবের কথা শুনলেই ওদের মন বিগড়ে যাবে, আশ্রম ছেড়েই হয়তো চলে যাবে।

সে আমি বুঝব।

কিন্তু বোঝা বিপিনের পক্ষেও প্রয়োজন, সে তাই সন্দিক্তভাবে মাথা নাড়ে। তারপর অন্য কথা বলে, কিন্তু মহেশ বা বিভূতি যদি পুলিশ ডেকে আনে?

আনে তো আনবে।

আনে তো আনবে? তোর খারাপ মাথাটা আরো খারাপ হয়ে গেছে সদা।

তুই বড় বোকা বিপিন। পুলিশ আশ্রমের ধারে আসামাত্র উমা, রতন আর আশ্রমের আরো পাঁচ-সাতটি মেয়ে মাধুকে ঘিরে বসবে। পুলিশ এসে দেখবে মাধুকে কেউ আটকে রাখে নি, মেয়েদের সঙ্গে ফাকা জায়গায় বসে গল্প করছে। তবু যদি জেলে যেতে হয়, আমি যাব, সব দোষ আমি নিজে মেনে নেবখন।

কিন্তু দরকার কি শুনি এত হাঙ্গামায়?

সে তুই বুঝবি না।

বুঝুক না বুঝুক, বিপিন ভয় পাইয়া গেল। একদিন চুপিচুপি গিয়া মাধবীলতাকে সাবধান করিয়া দিয়া আসিল। সব কথা সে ফাঁস করিয়া দিল তা নয়, আভাসে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে সদানন্দ বড় চটিয়াছে, সে যেন কখনো কোনো অবস্থায় আশ্রমে না যায়।

যেই নিতে আসুক, যে উপলক্ষেই নিতে আসুক, যেও না। উমা, রতন এলেও নয়। বুঝেছ? মাধবীলতা সায় দিয়া বলিল, বুঝেছি। আপনি না বললেও আমি যেতাম না।

কয়েকদিন পরে উমা আর রত্নাবলী মাধবীলতাকে আনিতে গেল। সদানন্দ যেন কোথায় গিয়াছে, আশ্রমে মেয়েদের কি যেন একটা ব্রত আছে, কি যেন একটা বিশেষ কারণে বিপিন তাকে ডাকাইয়া পঠাইয়াছে। মহেশ চৌধুরী আর বিভূতির অবশ্য নিমন্ত্রণ আছে।

মাধবীলতা আসিল না, বিভূতিও নয়। মহেশ চৌধুরী শুধু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল। ব্রতের কোনো আয়োজন নাই দেখিয়া সে আশ্চর্যও হইয়া গেল না, কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। মেয়েদের ব্রত কোন ঘরের কোণে, গাছের নিচে বা পুকুরঘাটে কি ভাবে হয়, মেয়েরাই তা ভালো করিয়া জানে! নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়া কেউ কিছু খাইতে দিল না দেখিয়াই সে একটু আশ্চর্য হইয়া গেল। কে জানে, হয়তো ব্রত শেষ না হইলে খাইতে দিতে নাই। কিন্তু বেলা তিনটার সময়ও যদি ব্রত শেষ না হয়, না খাওয়াইয়া বসাইয়া রাখিবার জন্য কেবল তার বাড়ির তিনজনকে নিমন্ত্রণ করিবার কি দরকার ছিল?

সদানন্দ যেখানেই গিয়া থাক, ফিরিয়া আসিয়াছে। মহেশ চৌধুরী তার কাছে গিয়া বসে। এদিকে বিপিন ভাবে, উমা আর রত্নাবলী যখন সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, তারাই মহেশের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিবে। উমা আর রত্নাবলী ভাবে, বিপিন যখন নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে বলিয়াছে, সেই জানে অতিথিকে কি খাইতে দেওয়া হইবে। বিপিন নিশ্চিত্তমনে কাজে বাহির হইয়া যায়। সদানন্দের কুটিরে মহেশকে খাইতে দেওয়া হইয়াছে ভাবিয়া উমা আর রত্নাবলী নিশ্চিত্তমনে বিশ্রাম করে।

সদানন্দ বলে, কি খবর মহেশ?

মহেশ বলে, আজ্ঞে, খবর আর কি?

মহেশ যেন প্রভু শব্দটা উচ্চারণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

কিছু উপদেশ দেবে নাকি?

কি আর উপদেশ দেব বলুন?

এই আমার কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়-

মহেশ একটু ভাবিয়া বলে, উপদেশ তো নয়, পরামর্শ দিতে পারি। কথাটা মনে রাখলে কাজ হবে। মানুষ যখন উঁচু পাহাড় পর্বতে ওঠে, কত যত্নে, কত সাবধানে প্রাণপণ চেষ্টায়

তিল তিল করে ওঠে, সময়ও লাগে অনেক, কিন্তু মানুষ যখন উঁচু থেকে হাত-পা এলিয়ে নিচে পড়ে, পড়বার সময় কোনো কষ্টই হয় না, সময়টা কেবল চোখের পলকে ফুরিয়ে যায়।

সদানন্দ গম্ভীর হইয়া বলে, পড়বার সময়টা ফুরিয়ে গেলেও অনেক সময় কষ্ট হয় না মহেশ। বরং উঁচু থেকে পড়লে চিরকালের জন্য কষ্ট ফুরিয়ে যায়।

ফুরিয়ে যায়, না শুরু হয়, কে তা জানে বলুন?

আমি জানি। যে সীমার মধ্যে কষ্ট, সে সীমাই যদি পার হয়ে গেলাম, তবে আর কষ্ট কিসের? যারা বোকা তারাই বেঁচে থেকে রোগের জ্বালা, শোকের জ্বালা সহ্য করে। অথচ আত্মহত্যা করা এত সহজ!

আত্মহত্যা করা সহজ? আত্মরক্ষা করা সহজ বলুন। আত্মহত্যা করা সহজ হলে মানুষের। জীবনটাই আগাগোড়া বদলে যেত, সমাজ, ধর্ম, রীতিনীতি, সুখ-দুঃখ, ভাবনা-চিন্তা, অনুভূতি সব অন্যরকম হত। ব্রহ্মচারী দু-চারজন আছে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য কি সহজ, না মানুষের পক্ষে সম্ভব? আত্মহত্যা দু-চারজন করে, কিন্তু সেটাও সহজ নয়, মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি তো যন্ত্রণায় ক্ষেপে যাবার উপক্রম করেছেন, একবার দেখুন তো আত্মহত্যা করতে গিয়ে পারেন কিনা? কষ্ট পাবেন, বেঁচে থাকার সাধ থাকবে না, তবু বেঁচে থেকে কষ্ট ভোগ করবেন। এই সমস্যা আছে বলেই তো বেঁচে থাকার এত নিয়ম-কানুনের আবিষ্কার। আসল সাধু কি ঈশ্বরকে চায়, স্বর্গ চায়, পরকালের কথা ভাবে? সাধু চায়, বিশেষ কতকগুলি অবস্থায় বাঁচতে যখন হবেই, বাঁচার সবচেয়ে ভালো উপায় কি, তাই আবিষ্কার করতে। অনেক যুক্তিই লাগসই মনে হয়, কিন্তু সব যুক্তিই কি খাটে? অতি তুচ্ছ বিষয়ে যুক্তি খাড়া করবার সময় বিচার করে দেখবেন, কত অসংখ্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্তিটার যোগ আছে। কোন যুক্তিটা সবচেয়ে বেশি খাটবে, কোনটা সবচেয়ে কম খাটবে, ঠিক করতে নিরপেক্ষ মন নিয়ে জগতের সমস্ত যোগাযোগ বিচার করতে হয়। ওটা হল মহাপুরুষের কাজ। মূল্য যাচাই করার ক্ষমতা অর্জন করবার নাম সাধনা। এইজন্য সাধনা

এত কঠিন। মানুষকে জানেন তো, মরুভূমিতে তৃষ্ণায় মরবার সময় পর্যন্ত এক গ্লাস জল আর একদলা সোনার মধ্যে বেছে নিতে বললে-

আমি তাই করেছি, না? সদানন্দ ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ, একেই পাপ বলে।

পাপ? অনুতাপ না হলে আবার পাপ কিসের?

অনুতাপ যদি না হয়, তবে আর পাপ কিসের? হজম করতে পারলে আর শরীরের পুষ্টি হয়ে স্বাস্থ্য বজায় থাকলে, রাশি রাশি অখাদ্য, কুখাদ্য খাওয়া আর দোষ কি? কিন্তু মুশকিল কি জানেন, অনুতাপ হয়। ভগবান দেন বলে নয়, লোকে বলে বলে নয়, অনুতাপ হওয়ার কথা বলেই অনুতাপ হয়। একটা কাজ করলে যদি আনন্দ হয়, আরেকটা কাজ করলে নিরানন্দ হতে পারে না?

সাধারণ লোকের হতে পারে, সকলের হয় না। মনকে যদি বশ করা যায়, আফসোস হতে না দিলে কেন হবে?

সে তো বটেই, কিন্তু মনকে বশ করা হয় না। অনুতাপ বড় ভীষণ জিনিস, মনকে একেবারে ক্ষয় করে দেয়। অনুতাপ এড়িয়ে চলাও বড় শক্ত, একটা নখ কাটার জন্য পর্যন্ত অনুতাপ হতে পারে কিনা। যাই করুক মানুষ, হয় সুখ পাবে নয় কষ্ট পাবে, উঠতে বসতে চলতে ফিরতে এ দুটোর একটা ঘটবেই ঘটবে। মহাপুরুষেরা এর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ঘটাবার উপায় দেখিয়ে দেন। অনুতাপ হবেই, তবে মারাত্মক রকমের না হয়। মারাত্মক অনুতাপ যাতে হয়, তাকেই লোকে পাপ বলে। যেমন ধরুন, আপনি যদি গায়ের জোরে মাধুর ওপর অত্যাচার করেন-

সদানন্দ চমকাইয়া বলে, তার মানে?

মহেশ শান্তভাবেই বলে, কথার কথা বলছি, একবার মাধুকে ধরে টানাটানি করেছিলেন। কিনা, তাই কথাটা বলছি. ও রকম কিছু করলে আপনার অনুতাপ হবেই। হিসাব করে হয়তো দেখলেন ওজন্য অনুতাপ করা মনের দুর্বলতা, প্রকৃতির নিয়ম ধরে বিচার করলে ও কাজটা আপনার পক্ষে কিছুমাত্র অন্যায় হয় নি, তবু অনুতাপে আপনি ক্ষয় হয়ে যাবেন। উচিত হোক আর অনুচিত। হোক, এ প্রতিক্রিয়াটা ঘটবেই। মনকে যদি এমনভাবে বদলে নিতে চান, যাতে ওরকম পাপ করে অনুতাপ হবে না, তখন বিপদ হবে কি জানেন, যতদিন পাপ করার ইচ্ছা না লোপ পাবে, মনটা বদলাবে না। যোগসাধনার মূল নীতি এই। সাধারণ জীবনে উঠতে বসতে আমরা অসংখ্য ছোট-বড় পাপ করি আর অনুতাপ ভোগ করি, সব সময় টেরও পাই না। সেইজন্য যোগসাধনার নিয়ম এত কড়া করার নিশ্বাস নিতে হবে তা পর্যন্ত ঠিক করে দেওয়া আছে। কানের চুলকানি জয় করলেই লোকে যোগী ঋষি হয় না, পিঠের চুলকানি পর্যন্ত জয় করতে হয়-নইলে মন বশে আসে না। তেইশ ঘণ্টা উনষাট মিনিট তপস্যা করেও হয়তো এক মিনিট শিষ্যকে দিয়ে ঘামাচি মারানোর জন্য তপস্যা বিফল হয়ে যায়।

গায়ে ছাই মেখে যে তপস্যা-

মহেশ মৃদু হাসে, আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলে, আপনাকে বলা বৃথা, আপনি আমার কথা বুঝবেন না। গায়ে ছাই মেখে হাত উঁচু করে বসে থাকা কি তপস্যা? না আমি সে তপস্যার কথা বলছি? আমি বলছিলাম আপনার তপস্যার কথা, আপনি যে তপস্যায় দিন দিন সফল হচ্ছিলেন।

এবার সদানন্দ অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকে, তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে, আমার আর কোনো উপায় নেই?

মনে তো হয় না। তবে তেমন গুরু যদি খুঁজে বার করতে পারেন-

শেষ বেলায় উপবাসী মহেশ বাড়ি ফিরিয়া গেল। খাইতে চাহিল মাধবীলতার কাছে।

মাধবীলতা অবাক হইয়া বলিল, এ আবার কোন দেশী ব্যাপার, নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে খেতে না দেওয়া!

যে ব্যাপার সে জানিত তার চেয়ে এ ব্যাপারটা তার খাপছাড়া মনে হয়। তার সম্বন্ধে সদানন্দের খারাপ মতবল আঁটা আশ্চর্যের কিছু নয়, কিন্তু ডাকিয়া নিয়া গিয়া মহেশ চৌধুরীকে খাইতে না দেওয়ার কোনো মানে হয়?

বড় পাজি লোক ওরা।

ছি মা, রাগ করতে নেই। কোনো একটা কারণ নিশ্চয় ছিল, বিব্রত করার ভয়েই তো আমি বললাম না, নইলে চেয়ে খেয়ে আসতাম।

দুজনে এ সব কথা বলাবলি করিতেছে, শশধরের বৌ খাবার আনিয়া হাজির। কোথায় সে থাকে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু সব সময়েই বোধহয় আশপাশে আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া সকলের কথা শোনে।

মাধবীলতা কিন্তু হঠাৎ বড় চটিয়া গেল।

সব ব্যাপারে তোমার বড় বড়াবাড়ি। আমিই তো দিচ্ছিলাম!

আড়ালে গিয়া শশধরের বৌ ঘোমটা ফাঁক করিয়া তাকে দেখাইয়া একটু হাসিল, হাতছানি দিয়া তাকে কাছে ডাকিল।

মাধবীলতা কাছে গেলে ফিসফিস করিয়া বলিল, তোমাকে না আজ কিছু ছুঁতে নেই-?

মাধবীলতা চুপ করিয়া রহিল। সদানন্দের আশ্রমে নিমন্ত্রণ রাখিতে না যাওয়ার মিথ্যা অজুহাতের কথাটা তার মনে ছিল না।

এদিকে আশ্রমে তখন সদানন্দ বিপিনকে ডাকিয়া আনিয়াছে।

মাধু এল না কেন?

উমা আর রত্নাবলীর কাছে বিপিন যা গুনিয়াছিল জানাইয়া দিল! সদানন্দ বিশ্বাস করিল না। দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া বলিল, ও সব বাজে কথা, আসল কথা আসবে না। না আসুক, আমিও দেখে নেব কেমন না এসে পারে। তোকে বলে রাখছি বিপিন, ওর সর্বনাশ করব, মহেশকে পথে বসাব, তবে আমার নাম সদানন্দ।

কয়েকদিন পরে মহেশের বাড়িঘর, বাগান আর আশ্রম পুলিশ তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাশ করিয়া গেল। বিভূতির সঙ্গে যখন সংস্রব আছে মাঝে মাঝে হঠাৎ এ রকম পুলিশের হানা দেওয়া আশ্চর্য নয়। তবু, বাহির হইতে তাগিদ না পাইলে এ সময়টা পুলিশ হয়তো বিভূতির নূতন আশ্রম নিয়া মাথা ঘামাইত না। বিভূতিকে যে কতগুলি কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিল, খবরটা সে-ই ফাঁস করিয়া দিয়া গেল। পুলিশের লোকটি একদিন সদানন্দকে প্রণাম করিতে গিয়াছিল, কথায় কথায় সদানন্দ নাকি এমন কতকগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল যে তাড়াতাড়ি অনুসন্ধান না করিয়া উপায় থাকে নাই।

সত্যি সত্যি কিছু আরম্ভ করেছেন নাকি আবার? উনি তো মিথ্যে বলবার লোক নন।

উনিই মিথ্যে বলবার লোক।

পুলিশের লোকটি সন্দিক্তভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, বিয়ে থা করেছেন একটু সাবধান থাকবেন, আর কি ও সব ছেলেমানুষি পোষায়?

পুলিশের খানাতল্লাশের পর মহেশের আশ্রমে লোকের যাতায়াত আরো কমিয়া গেল। এতদিন পরে লোকের মুখে মুখে কি করিয়া যে একটা গুজব রটিয়া গেল, মহেশ চৌধুরী লোক ভালো নয় বলিয়া সদানন্দ তাকে ত্যাগ করিয়াছে, সাধু সদানন্দ।

## ১৬. দেখলে বাবা তোমার দেবতার কীর্তি

রাগে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে দেখিতে বিভূতি বলিল, দেখলে বাবা তোমার দেবতার কীর্তি?

মহেশ বলিল, ওর অধঃপতন হয়েছে।

বিভূতি নাক সিঁটকাইয়া বলিল, ও আবার ওপরে উঠল কবে যে পতন হবে? ও লোটা চিরকাল ভেতরে ভেতরে এমনি বজ্জাত। সাথে কি ওকে ঘুসি মেরেছিলাম।

ছেলের সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে মহেশকে হাতুড়ি দিয়া নিজেকে আঘাত করিতে হইয়াছিল, ব্যাপারটা সহজে ভুলিবার নয়। মহেশ জিজ্ঞাসা করিল, -ঘুসি মেরে লাভ কি হয়েছিল?

তোমার জন্যে-

আমার কথা বাদ দিয়ে বল। আমি কিছু না করলেও তোর লাভটা কি হত? চারিদিকে বিচ্ছিরি একটা কেলেক্কারি বেধে যেত, গায়ের লোক আমাদের মারতে আসত, নিজে রাগের যন্ত্রণায় ছটফট করতিস-।

মহেশের যুক্তিতর্ক কোনোদিনই ভালো করিয়া বিভূতির মাথায় ঢেকে না, তার মনে হয় ছেলেবেলা হইতেই সে যা বলে আর ভাবে, মহেশ ঠিক তার উল্টা কথাটা বলিয়া আসিতেছে। রক্তটা বিভূতির একটু গরম, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ আর কর্তব্যপ্রবণতা বাপের জীবন্ত দেবতার নাকে ঘুসি মারানোর মতো উদ্ধত, মানুষের চাপে পৃথিবীতে মানুষ কষ্ট পায় বলিয়া তার আফসোসের সীমা নাই। আর আদর্শগুলি এমন যে, কাজে কিছু

করার সুযোগ না পাইলেও, কেবল একটা দলে কয়েকমাস মেলামেশা করার জন্যই পুলিশ তাকে কয়েকটা বছর আটকাইয়া। রাখিয়াছিল। মনটা যে বিভূতির একটু নরম হইয়াছে, সংসারের অন্যায়গুলির সঙ্গে রক্ষা করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে সে যে প্রস্তুত হইয়াছে, মাধবীলতাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়াটাই তার প্রমাণ। তবুও, মানুষের মন মানে না, কাজে না পারিলে তর্কে নিজেকে জাহির করে।

তুমি বুঝি ভাব, তোমার জন্যে চুপ করে গিয়েছিলাম বলেই আমার রাগ কমে গিয়েছিল?  
ক্ষমা চাওয়ার জন্যে তো কমেছিল।

তুমি আমাকে দিয়ে জোর করে ক্ষমা চাওয়ালে, তাতে কখনো রাগ কমে?

কমে বৈকি, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ক্ষমা চাইলেই মানুষের রাগ কমে যায়। তখন কি মনে হয় জানিস, মনে হয় এবারকার মতো চুলোয় যাক, আবার যদি লোকটা কিছু করে তো দফা নিকেশ করে দেব। আমি জোর করে ক্ষমা চাওয়ালে কি হবে, নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা তো তোকে সত্যি সত্যি চাইতে হয়েছিল। ক্ষমা চাওয়ার পর আগের মতো জোরালো রাগ পুষে রাখতে মানুষের বড় বিরক্তি বোধ হয়।

বিভূতি বিশ্বাস করিল না। আগের বারের চেয়েও এবার তার বেশি রাগ হইয়াছিল। তার চলাফেরার দিকে পুলিশ একটু নজর রাখিবে, মাঝে মাঝে বাড়িঘর খানাতল্লাশ করিবে, এ সব। বিভূতির কাছে খাপছাড়া ব্যাপার নয়। এতকাল আটক রাখার পর তাকে পুলিশ একেবারে জনুর মতো ত্যাগ করিবে, বিভূতি নিজেও তা বিশ্বাস করে না। ছাড়া পাওয়ার পর সব সময়েই তার মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া আছে, কখন আবার ডাক আসে। এমনিই পুলিশ যাকে বাগে পাওয়ার জন্যে ওত পাতিয়া আছে, তার নামে মিথ্যা করিয়া পুলিশের কাছে লাগানো! বিভূতির মনে ভয় ছিল, সকলের মনেই এ অবস্থায় থাকে, রাগের জ্বালায় তাই তার মনে হইতে লাগিল, ভেঁাতা একটা দা দিয়া সদানন্দের গায়ের মাংস কাটিয়া নেয়।

এই অসম্ভব কাজটার বদলে একবার আশ্রমে সদানন্দকে একটু ধমক দিয়া আসিবে কিনা ভাবিতে ভাবিতে বিভূতি অন্যমনস্ক হইয়া থাকে।

রাতে মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করে, কি ভাবছ?

বিভূতি বলে, না। কিছু ভাবছি না।

মাধবীলতা গভীর আদরের সঙ্গে তাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া বলে, বল না, কি ভাবছ?

দিনের বেলা মেলামেশা চলে, কিন্তু দিনের বেলা ভালবাসার খেলা মাধবীলতার পছন্দ হয় না। মাঝে মাঝে স্বামীর পাওনাগণ্ডার বিষয়টা খেয়াল না থাকিলেও এমনও হয় যে, ফাঁকলে একটু সোহাগ করিতে আসিয়া দুহাতের জোরালো ঠেলায় বিভূতি চমকিয়া যায়। তখন অবশ্য মাধবীলতার খেয়াল হয়, মৃদু তিরস্কারের সুরে সে বলে, কি যে কর তুমি চাদিকে লোক রয়েছে না? ওমা, দরজা বন্ধ করে দিয়েছ! বেশ লোক তো তুমি? তবু, দিনে রাত্রে সব সময় মাধবীলতাকে নিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিবার অধিকার জন্মানোর অল্পদিনের মধ্যেই বিভূতি টের পাইয়া গিয়াছে, দিনের বেলা মিলনের আনন্দ ভোগ করার ক্ষমতাটা মাধবীর যেন ভেঁাতা হইয়া যায়। ব্যাপারটা তার বড়ই দুর্বোধ্য মনে হয়, কারণ, রাত্রে মাধবীর তীক্ষ্ণতায় তাকেও মাঝে মাঝে বিব্রত হইতে হয়, ঘুম পর্যন্ত যেন মাধবীর চলিয়া যায়, বিভূতির ঘুম আসিলেও তাকে সে ঘুমাইতে দেয় না, প্রাণের চেয়ে যে প্রিয়তর, তাকে পর্যন্ত ভালবাসিতে ভালবাসিতে শান্ত হইয়া বিভূতি ঝিমাইয়া পড়িবে, মাধবীলতা অক্লান্ত চেষ্টায় যেভাবে আবার তাকে বাঁচাইয়া তোলে, মানুষের বাস্তব জীবনে যে সে ধরনের অনুরূপ কাব্যের স্থান আছে, বিভূতি কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

বিভূতি বলে, পুলিশের কথা ভাবছিলাম। আবার যদি আমায় ধরে নিয়ে যায়?

এক নিমেষে মাধবীলতা বদলাইয়া যায়, রুদ্ধশ্বাসে বলে, মাগো, পুলিশ দেখে আমার যা হচ্ছিল!

পুলিশ চলিয়া যাওয়ার পর আরো তিন-চার বার এমনভাবে সে প্রায় এই কথাগুলি বলিয়াছে। হঠাৎ একবার বিভূতির মনে হয়, সব কি মাধবীলতার ন্যাকামি, বাড়াবাড়ি, হিষ্টিরিয়া? কিন্তু এই টাইপের খাঁটি ন্যাকামি আর বাড়াবাড়ি আর হিষ্টিরিয়া ঠিক কি রকম, সে বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা না থাকায় সন্দেহের চোখে মাধবীলতার ভীত চোখ দুটি দেখিতে গিয়া সে মুগ্ধ হইয়া যায়। কত জন্ম তপস্যা করিয়া সে এমন বৌ পাইয়াছে, কত ভাগ্য তার!

তখন মাধবীলতার ভয় দূর করার জন্য তাকে ভিতরের সব কথা খুলিয়া জানাইয়া দেয়। আশ্বাস দিয়া বলে যে, সমস্তটাই সাধু সদানন্দের কারসাজি, সদানন্দ পিছনে না লাগিলে পুলিশ আর তাকে জ্বালাতন করিতে আসিত না। ভয় নাই, মাধবীলতার কোনো ভয় নাই, পুলিশ আর বিভূতিকে ধরিবে না, বৌকে এমনভাবে বুকে করিয়া, বিভূতি জীবন কাটাইয়া দিবে।

শুনিয়া, ভয়ে না যত হইয়াছিল মাধবীলতার চোখ তার চেয়ে বেশি রকম বিস্ফারিত হইয়া গেল।

উনি! উনি এমন কাজ করলেন।

কেন, ও কি এমন কাজ করতে পারে না?

মাধবীলতা সায় দিয়া বলিল, পারে, ও লোকটা সব পারে। ওর অসাধ্য কাজ নেই। ওর মতো ভয়ানক মানুষ-

মাধবীলতার ক্ষোভ-দুঃখের বাড়াবাড়ি দেখিয়া আবার বিভূতির মনে হইল সে যেন বাড়াবাড়ি করিতেছে। ভালবাসিতে আজ যেন মাধবীলতার ভালো লাগিল না, ঘুরাইয়া

ফিরাইয়া বার বার সে ওই কথাই আলোচনা করিতে লাগিল। প্রথমটা কয়েক মুহূর্তের জন্য বাড়াবাড়ি মনে হইলেও তার বিচলিত ভাব দেখিয়া বিভূতি আবার মুগ্ধ হইয়া গেল। কি ভালোই মাধবীলতা তাকে বাসে!

বিভূতির এই কৃতজ্ঞতাই মাধবীলতাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করিয়াছিল। বড় সহজে বিভূতির মন ভুলানো যায়? একটু আদর যত্ন করা, রূপের সামান্য একটু বিশেষ ভঙ্গি দেখানো, বিভূতির। কাছে এ সমস্ত যে কত দামি বুঝিতে পারিয়া মাধবীলতা নিজেই অবাক হইয়া যায়। কত সহজে কত গভীর আনন্দ সৃষ্টি ও উপভোগ করা যায়, মাঝে মাঝে খেয়াল করিয়া নিজের অফুরন্ত মন। কেমন করার অভিশাপ তার যেন অসহ্য ঠেকে। ভয়ানক কিছু, বীভৎস কিছু প্রচণ্ড কিছুর জন্য কামনা যে স্বরানুভূতির মতো মৃদু অথচ মানসিক রোগের মতো একটানা হইতে পারে, মাধবীলতার তা জানিবার বা বুঝিবার কথা নয়, ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার তরঙ্গে উঠিতে নামিতে তার প্রাণান্ত হইতে থাকে বলিয়া, জীবনের প্রত্যেকটি সহজ সুখ ও আনন্দের জন্য বিভূতিকে মনে মনে সে প্রায় পূজা করে। বিচলিত ভাবটা যতক্ষণ না কমে ততক্ষণ অবশ্য বিভূতিকে বড় করার কথাটা তার খেয়ালও হয় না এবং বিচলিত ভাবটা কমিতে কমিতে মাঝরাাত্রি প্রায় কাবার হইয়া যায়। তখন হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ায় আফসোসের তার সীমা থাকে না। বিভূতির কপালে হাতের তালু ঘষিয়া দিতে দিতে সে ব্যগ্রকণ্ঠে বলে, না, না, তুমি ভেব না, ও তোমার কিছু করতে পারবে না।

এতক্ষণ পরে নিজের দেওয়া আশ্বাস ফিরাইয়া পাইয়া গভীর ঘুমের আক্রমণ আর বিভূতিকে কাবু করিতে পারে না, মাধবীলতার গোলামি করার একটা রোমাঞ্চের সাধ বরং তাকে ছোট ছেলের মতো লজ্জার হাসি হাসাইয়া দেয়।

তার মাথাটা সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মাধবীলতা বলে, তোমার কিছু হলে আমি মরে যাব।

বিভূতি চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে।

লণ্ঠনের বাদামি আশোয় মশারির ভিতরে ও বাহিরে গভীর রাত্রি রূপ নিয়াছে, লণ্ঠনের কয়েকটা জিনিস ছাড়া মশারির জন্য বাহিরের আর কিছু ভালো দেখা যায় না, রঙিন কুয়াশায় যেন। একটু ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। স্টোভের পাশেই স্পিরিটের বোতলটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে আবেগের ভাঙনপ্রবণতার জন্য মাধবীলতার চোখে যেন জল আসিয়া পড়ে। এমন কোমল কেন বিভূতি, এত বেশি ভাবপ্রবণ আর মমতাময়? এত অল্পে সে সন্তুষ্ট কেন, এত কম সে। চায় কেন, এত কম সে নেয় কেন, কেন সে এত ব্যগ্র শুধু দেওয়ার জন্য? জেল আর ফাঁসির ভয় তুচ্ছ করিয়া সে বুক-কাঁপানো কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, অনায়াসে সে সদানন্দের নাকে ঘুসি মারিতে পারে, সে যেন মাটির পুতুল, মায়ের কোলের শিশু।

তা হোক। তাই ভালো।

আরো জোরে বিস্তৃতির মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া গায়ের জোরেই যেন মাধবীলতা স্পিরিটের বোতলটার দিক হইতে দৃষ্টি সরাইয়া আনে।

ঘুমোবে না?

তোমার ঘুম পেয়েছে?

হাতের চাপ একটু আলগা করিয়া মাধবীলতা মৃদু হাসে, আমার ঘুম দিয়ে কি করবে, আমি তো দিনে ঘুমোই। তোমার ঘুম পেয়েছে কিনা তাই বল।

পরদিন দুপুরে ঘুমানোর বদলে মাধবীলতা শশধরের বৌকে সঙ্গে করিয়া সদানন্দের আশ্রমের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল। গেল প্রতিবেশী মনোহর দত্তের গরুর গাড়িতে।

আশ্রমে যাইবে শুনিয়া মনোহর দত্তের বুড়ো মা, বয়স তার প্রায় সত্তরের কাছে গিয়াছে, তাড়াতাড়ি নামাবলী গায়ে জড়াইয়া তাদের সঙ্গে নিল।

মনোহর দত্তের বৌ দেড় মাসের ছেলে কোলে করিয়া আফসোস করিয়া বলিল, আমিও যেতাম বাছা তোমাদের সঙ্গে, কিন্তু আমার কপালে কি আর ধম্মোকমো আছে।

আগে মাধবীলতা শশধরের বৌকে কিছু বলে নাই, বাহির হওয়ার একটু আগে কেবল খবরটা দিয়াছিল। শশধরের বৌ তো শুনিয়া অবাক।

আশ্রমে যাবে? সাধুবাবাকে তুমি এত ভক্তি কর তা তো জানতাম না ভাই!

ভক্তি না তোমার মাথা। যাচ্ছি তার মুণ্ডপাত করতে। আমাদের বাড়িতে পুলিশ লেলিয়ে দেয়, এমন আশ্পদ্ধা!

শশধরের বৌ খতমত খাইয়া গিয়াছিল, একটু ভয়ও পাইয়াছিল। বলিয়াছিল, বাড়িতে ওঁরা জানতে পারলে কিন্তু বড্ড রাগ করবেন।

বাবাকে বলে এসেছি।

চুপিচুপি কারো কাছে কিছু না বলিয়া যাইবে অথবা মহেশ চৌধুরীর অনুমতি নিয়া যাইবে, সমস্ত সকালটা মাধবীলতা আজ এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে। মহেশ চৌধুরী তাকে সদানন্দের আশ্রমে যাইতে দিতে রাজি হইবে কিনা এ বিষয়ে মাধবীলতার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু বলিয়া যাওয়াই ভালো মনে করিয়া অনুমতি চাহিতে গিয়া তার বিস্ময়ের সীমা থাকে নাই।

মহেশ চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে রাজি হইয়া বলিয়াছিল, আশ্রমে ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে মা? বেশ তো। তারপর হাসিয়া বলিয়াছিল, পুরোনো সাথীদের দেখতে সাধ হচ্ছে?

মহেশ চৌধুরীই যে সদানন্দকে তাড়াইয়া দিয়াছে, সদানন্দকে ভক্তি করার বদলে সে যে এখন তার অধঃপতনের জন্য আফসোস করে, এ সব মাধবীলতার অজানা নয়। একটা প্রশ্ন পর্যন্ত জিজ্ঞাসা না করিয়া হাসিমুখে তাকে সদানন্দের আশ্রমে যাইতে অনুমতি দেওয়া মহেশ চৌধুরীর মতো মানুষের পক্ষেও সম্ভব মাধবীলতা ভাবিতে পারে নাই। সদানন্দের অধঃপতনে বিশ্বাস হইয়াছে, কিন্তু তাকে যে সদানন্দ সত্যই অপমান করিয়াছিল, মহেশের মনে কি এ বিষয়ে একটু খুঁতখুঁতানিও জাগে নাই? যে কাণ্ডের ফলে নিজেকে তার হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিতে হইয়াছিল?

দুপুরবেলা আশ্রমে যে যার ঘরে বিশ্রাম করিতেছিল, উমা ছিল রত্নাবলীর ঘরে। শশধরের বৌ আর মনোহর দত্তের মাকে সঙ্গে করিয়া মাধবীলতা প্রথমে সে ঘরে গেল, তারপর সঙ্গী দুজনকে সেখানে বসাইয়া রাখিয়া একা দেখা করিতে গেল সদানন্দের সঙ্গে।

রত্নাবলী বলিল, একটু বোন্না ভাই, দুদণ্ড গল্প করি। সেদিন তো কথা বলারই সময় পেলাম না।

সদানন্দের নির্দেশে উমার সঙ্গে মাধবীলতাকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া রত্নাবলী একাই প্রায় তিনঘণ্টা মাধবীলতার সঙ্গে গল্প করিয়াছিল। কিন্তু যে রকম রোমাঞ্চকরভাবে মাধবীলতার বিবাহ হইয়াছে, তাতে দু-চার ঘণ্টার গল্পে কি মনের কথা সব বলা হয়?

মাধবীলতা বলিল, না ভাই, চট করে আগে দেখাটা করে আসি। সেদিন আসি নি বলে বড্ড চটে আছেন।

তুই কি করে জানলি চটে আছেন?

ওঁকে চিনি না আমি?

সদানন্দের মহলে ঢুকিতে গিয়া আগে দেখা হইল বিপিনের সঙ্গে। বিপিন তাকে দেখিয়াই বলিল, কি সর্বনাশ, তুমি এখানে!

ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

কেন?

আমার দরকার আছে।

কি দরকার?

আছে।

বিপিন খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বলিল, সেদিন তোমাকে অত করে তোমাকে অত করে বুঝিয়ে বলে এলাম—

মাধবীলতার নিজেরও বৃকের মধ্যে অকথ্য রকমের টিপটিপ করিতেছিল, তবু সে মুখে সাহস দেখাইয়া বলিল, আপনার ভয় নেই, উনি আমার কিছু করতে পারবেন না। আপনার যত সব উদ্ভট ধারণা—উনি সে রকম মানুষ নন।

ইতিমধ্যে বিপিন একটু আত্মসংবরণ করিয়াছিল, সে গম্ভীরমুখে বলিল, আমার যেমন ধারণাই থাক, ওঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। চল, তোমাকে বাইরে রেখে আসি।

কেন?

কেন আবার কি? আমার আশ্রমে যদি তোমায় ঢুকতে না দিই, তুমি কি গায়ের জোরে ঢুকবে?

কথা হইতেছিল সদানন্দের ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়াইয়া। মাধবীলতার গলা শুনিয়া সদানন্দ আগেই দরজার কাছে উঠিয়া আসিয়া দুজনের কথা শুনিতেছিল, এবার ডাকিয়া বলিল, এস মাধু, ভেতরে এস। বিপিন তুমি একটু বাইরের দরজার কাছে বসবে যাও তো, কেউ এসে আমাদের বিরক্ত না করে।

আগাইয়া আসিয়া বিপিনের চোখের সামনে মাধবীলতার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সদানন্দ তাকে ঘরের মধ্যে নিয়া গেল, বিপিনের মুখের উপর বন্ধ করিয়া দিল দরজা।

মাধবীলতার আতঁকঠের চিৎকার শোনা গেল, বিপিনবাবু! ও বিপিনবাবু! তারপর স্পষ্টই বুঝা গেল সদানন্দ তার মুখে হাত চাপা দিয়াছে।

দরজার কাছে সরিয়া গিয়া বিপিন চাপা গলায় বলিল, সদা, তুই কি আমাদের সকলকে না ডুবিয়ে ছাড়বি না? দরজা খুলে দে-ওকে ছেড়ে দে।

সদানন্দ ভিতর হইতে বলিল, কেন ভাবছিষ্ তুই? কিছু হবে না, তার কোনো ভাবনা নেই। যদি হয়, তার বোকামির জন্যে হবে।

তোর পায়ে পড়ি সদা-

পায়ে পড়ি আর যাই করিস্ কিছু লাভ হবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাধার মতো কেন সময় নষ্ট করছি, একজন কেউ এসে পড়লে ভালো হবে? এই সোজা কথাটা তুই বুঝতে পারছি না। নছার, মাধু একা ফিরে গেলে ও কারো কাছে কিছু বলবে না। কিন্তু অন্য কেউ জানতে পারলে, না বলে মাধুর উপায় থাকবে না।

বিপিন জানিত মানুষটা সদানন্দ ভয়ানক, কিন্তু এতটা সেও ভাবিতে পারে নাই। এর চেয়ে ঢের বেশি অমানুষিক কাণ্ড সর্বদাই সংসারে ঘটে, কিন্তু নিজের সামনে না ঘটা পর্যন্ত নিজের জানাশোনা মানুষের সম্বন্ধে কে তা সম্ভব ভাবিতে পারে। বিপিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। সদানন্দ যা বলিতেছে তাই করাই হয় তো ভালো, তা ছাড়া আর কি উপায় আছে!

ভিতর হইতে সদানন্দ বলিল, বিপিন, গেলি?

বিপিন বলিল, যাচ্ছি।

ধীরে ধীরে বিপিন সদরের দরজার দিকে আগাইয়া যায়, মাথার মধ্যে তার যেন সব গোলমাল হইয়া যাইতে থাকে। দরজা বন্ধ না করিয়া খোলা দরজার সামনেই সে বসিয়া থাকে। মাথার মধ্যে তার যত গোলই পাকাইয়া যাক, এ বুদ্ধিটা তার থাকে যে, দরজা বন্ধ করার চেয়ে দরজা খুলিয়া রাখিয়া নিজে বসিয়া সকলের পথ আটকানো ভালো।

আশ্রমের একজন সামনে দিয়া যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করে, এখানে বসে আছেন?

এমনি। উনি একজনকে বিশেষ উপদেশ দিচ্ছেন আমারও একটু দরকার আছে উনার সঙ্গে।

বেলা পড়িয়া আসে, সামনে দিয়া আশ্রমের শিষ্য-শিষ্যার যাতায়াত বাড়িয়া যায়। কেউ কেউ বিপিনকে এখানে এভাবে বসিয়া থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করে, কেউ দুদণ্ড দাঁড়াইয়া বাজে কথা বলিয়া যায়। চালার নিচে নিত্যকার সভার জন্য গ্রামবাসী নরনারী একে একে আসিয়া জমা হইতে থাকে। তৃষ্ণায় বিপিনের বুক ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হয় কিন্তু উঠিয়া গিয়া এক গ্লাস জল যে খাইয়া আসিবে, সে সাহসও হয় না, কাউকে এক গ্লাস জল আনিয়া দিতে বলিতেও ভরসা পায় না।

শেষ বেলায় চালার নিচে সকলে সমবেত হইয়া অধীর আগ্রহে যখন সদানন্দের প্রতীক্ষা করিতেছে, উমা আর রত্নাবলী শশধরের বৌকে সঙ্গে করিয়া মাধবীলতার খবর নিতে আসিল।

বিপিন পাংশু মুখে বলিল, উনি মাধুর সঙ্গে কথা বলছেন।

এখনো কথা বলছেন!-রত্নাবলী বলিল।

বিপিন হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, মাধুকে উনি একটু বেশি পছন্দ করেন। তাছাড়া, অনেকবার আমায় বলেছিলেন, বিবাহিত জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে মাধুকে কিছু বলবেন। সে সব কথা বলছেন বোধহয়।

রত্নাবলী বলিল, এতদিন এক বাড়িতে থেকে বললেন না, এখন—

বিপিন বলিল, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দিলে কি হবে? উনি অ্যাদিন ইচ্ছে করেই কিছু বলেন নি। আজ মাধু নিজে শুনতে চাইল—

আমরাও একটু শুনে আসি বলিয়া রত্নাবলী ভিতরে ঢুকিতে যায়, বিপিন ব্যস্ত হইয়া বাধা দিয়া বলিল, না না, যেও না। উনি কাউকে যেতে নিষেধ করেছেন।

কিন্তু রত্নাবলীকে আটকাইবার মতো গায়ের জোর বিপিনের ছিল না, তাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া রত্নাবলী ভিতরে চলিয়া গেল।

রত্নাবলী মনটা একটু সন্দিগ্ধ।

সদানন্দের ঘরের সামনে রত্নাবলী একটু দাঁড়াইল। সন্দিগ্ধমনে সাহস থাকে না, থাকে কৌতূহল। দরজা বন্ধ না খোলা? ঠেলা দিলেই যদি খুলিয়া যায়? সদানন্দ দরজা খুলিয়া যদি জিজ্ঞাসা করে, কি চাই? বিপদ হিসাবে কোনোটাই কম নয়।

সাহস যে মনে নাই, কৌতূহল দমন করার মতো মনের জোর সে মনে কোথায় পাইবে, দরজাটা ভেজানোই ছিল।

সদানন্দ খাটে বসিয়া আছে, পা ঝুলাইয়া। দুপাশে হাতের তালু দিয়া খাটে চাপ দিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় হাতের উপরেই শরীরের ভর দিয়া যেন সদানন্দ বসিয়াছে। মাধবীলতা বসিয়াছে। মেঝেতে তার ঝুলানো পায়ের কাছে—উর্ধ্বমুখী, উত্তেজিতা, শব্দময়ী মাধবীলতা। উপদেশ দেওয়ার কথা সদানন্দের, কিন্তু সে রীতিমতো অস্বস্তির সঙ্গে মাধবীলতার বক্তৃতা শুনিতেছে।

সদানন্দের চোখে না পড়িলে রত্নাবলী হয়তো চোরের মতো পালাইয়া যাইত, সদানন্দ তাকে দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে আহ্বান করিয়া বসায় সে সুযোগটা আর পাওয়া গেল না।

এস রতন।

মাধবীলতা মুখ নামাইয়া ভালো করিয়া গা ঢাকিয়া কুঁজো হইয়া বসিল। পায়ে পায়ে আগাইয়া আসিয়া রত্নাবলী তার কাছে বসিল, সন্তর্পণে। মনের মধ্যে তার ওলট-পালট চলিতেছিল। অবস্থাবিশেষে কত রকম সন্দেহই মনে জাগে।

তুমি একা এসেছ রতন?

আজ্ঞে হাঁ। ভাবলাম যে একবার-

দেখে আসি ওরা কি করছে? সদানন্দ হাসিল। রত্নাবলীর বিব্রত ভাব দেখিয়া আবার বলিল, বন্ধুর জন্য ভাবনা হচ্ছিল, চাবুক মারছি না গায়ে ছাকা দিচ্ছি ভেবে পাচ্ছিলে না, কেমন? আশ্রম ত্যাগ করার জন্য আমি কাউকে শাস্তি দিই না রতন! যার গলায় খুশি মালা দিয়ে তুমিও যেদিন ইচ্ছা আশ্রম ছেড়ে চলে যে, আমি কিছু বলব না।

সত্যমিথ্যায় জড়ানো কথা, না-চাওয়া কৈফিয়তের মতো। সদানন্দের ভাবটা যেন নতুন জামাইয়ের মতো, শালীর সঙ্গে ফাজলামি করিতেছে। রত্নাবলী কিছুই বুঝিতে পারে না, কারণ, বুঝিবার মতো কি যেন একটা জ্ঞান মনের অন্ধকার তলা হইতে উপরে উঠিতে উঠিতে চাকায় লাগা নোংরা কিছুর মতো পাক খাইয়া নিচে তলাইয়া যায়। সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

সকলে চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে কেন? মাধবীলতা তাই বলে, এবার থেকে মাঝে মাঝে আশ্রমে আসব ভাই। ওঁকে প্রণাম করে যাব।

তারপর আবার তিনজনেই চুপ করিয়া থাকে, তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়। একটু পরেই বিপিন আসিয়া গম্ভীরমুখে খবর দেয় যে, চালার নিচে বসিয়া বসিয়া অনেকে চলিয়া যাইতেছে, অনেকে অপেক্ষা করিতেছে। সদানন্দ যদি না যায়, বিপিন তাদের খবরটা দিতে পারে।

চল যাচ্ছি। সদানন্দ যেন একটু ব্যস্ত হইয়াই চলিয়া গেল।

তারপর দুজনে চুপচাপ বসিয়া থাকে। অনেকক্ষণ। শেষে মাধবীলতাই বলে, এখানে বসে থেকে কি হবে, চল আমরাও যাই।

আশ্রমে থাকবে নাকি আজ?

থাকবার কি উপায় আছে ভাই? তোমার ঘরে বসে নিরিবিলি দুদণ্ড কথা বলিগে চল।

রত্নাবলীর মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন পাক খাইয়া বেড়াইতেছিল, সে খানিক খানিক জানে কিন্তু সব জানে না। সব তাকে জানানো হয় নাই বলিয়া অভিমানে প্রশ্নগুলি গলার কাছে আসিয়া আটকাইয়া যাইতেছিল। তবে জানার সাধটা জোরালো হইলে প্রায় সব মেয়েরাই খুখুক করিয়া একটু কাশির ধাক্কাতেই দারুণ অভিমানের বাধা ঠেলিয়া দিতে পারে। জিজ্ঞাসা তাই হয় আকস্মিক।

হঠাৎ এলে যে?

হঠাৎ এলাম? ও হঠাৎ কেন এলাম? এমনি এলাম আর কি।

এমনি এলে না তোমার মাথা এলে। ছি, ধিক্ তোকে। ঘরে যদি মন না বসে, ঘরের বৌ সাজতে গেলি কেন? কে তোর পায়ে ধরে সেধেছিল?

একজন সেধেছিল ভাই।

ফাঁকি দেওয়া হাসি। হাসির ভঙ্গির সঙ্গে হাল্কা কথা রতনকে রাগে যেন অন্ধকার দেখাইয়া দেয়। আশ্রমের মানুষ-দেবতার পূজার জন্য কোন গ্রামের কে যেন কি উপলক্ষে এক বোঝা নৈবেদ্য পাঠাইয়াছিল, আশ্রমের সকলেই ভাগ পাইয়াছে। ত্রুদ্র চোখে চাহিতে চাহিতে রত্নাবলী বন্ধুর জন্য একটা পাথরের থালায় ফলমূল আর মিষ্টান্ন সাজাইতে থাকে। সন্দেহটা মনের মধ্যে ধীরে ধীরে বিশ্বাসে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। মনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

না জানিলেও মানুষের বড় বড় ভাব পরিবর্তনের মধ্যে মনের পরিবর্তন আবিষ্কার করা যায়। ভদ্রগৃহস্থের ছেলের সঙ্গে সামাজিক বিবাহের ফলে জীবনের সমস্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটি যার কাছে এমন গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল যে, প্রায় মুচকি একটু হাসি পর্যন্ত অন্যায় মনে হইত, বন্ধুর এ রকম সাংঘাতিক জেরার সময় সে যদি এমন শয়তানি-ভরা ফাজলামি করিতে পারে, কিছু একটা ঘটিয়াছে বৈকি। হায়, মাঝখানে কিছুদিনের ছেদ পড়িয়া সদানন্দের সঙ্গে আবার কি মাধবীলতার আগের সম্পর্ক পাতানো হইয়া গেল?

খা।

তুইও বোস ভাই, দুজনে একসঙ্গে খাই?

এতক্ষণে, মাধবীলতা যখন এক টুকরো ফল মুখে তুলিতেছে, রত্নাবলীর নজর পড়িল, মাধবীলতার ডান হাতের কজির কাছটা লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।

হাতটা প্রায় ভেঙে গেছে ভাই, গায়ে কি জোর মানুষটার!

চিবানো ফলের সঙ্গে টোক গিলিয়া রত্নাবলী ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করে, কেন, এত জোরে হাত ধরল কেন?

মাধবীলতা হাসিয়া বলে, রাগের চোটে, আবার কেন।

তারপর?

তারপর আবার কি? আমি কটমট করে তাকাতে হাত ছেড়ে দিয়ে বকবকানি আরম্ভ করে দিল।

মাধবীলতা তৃপ্তির হাসি হাসে।

## ১৭. সত্য কথা বলতে

সত্য কথা বলতে কি, মাধবীলতা কটমট করিয়া তাকানোর অবসর বেশিক্ষণ পায় নাই। অবসর পাইলেও সে তাকানিতে বিশেষ কোনো কাজ হইত কিনা সন্দেহ। মূর্ছার উপক্রম হইলে যেমন হয়, মাথা সেই রকম বে বোঁ করিয়া পাক খাইতে আরম্ভ করায় সে চোখ বুজিয়া মূর্ছা গিয়াছিল। সদানন্দের চোখ মুখ দেখিয়া সে যেমন ভয় পাইয়াছিল, অন্ধকার রাত্রে হঠাৎ ভূত দেখিলে সে রকম ভয় পাইত কিনা সন্দেহ। তার মুখের সেই বীভৎস ভঙ্গি আর চোখের মারাত্মক দৃষ্টির মধ্যে পাশবিক কামনার একটু চিহ্ন খুঁজিয়া পাইলে মাধবীলতা হয়তো মূর্ছার চরম শিথিলতা আনিয়া সদানন্দের আলিঙ্গনে গা এলাইয়া দিত না, আলিঙ্গন আরেকটু জোরালো হইলেই সে দেহে কয়েকটা পাঁজর নির্ঘাত মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া যাইত। মাধবীলতা নিঃসন্দেহে টের পাইয়াছিল, সদানন্দ তাকে খুন করিবে সঙ্গে সঙ্গেই হোক অথবা অকথ্য যন্ত্রণা দিবার পরেই হোক। খবরের কাগজে যে সব খুনের খবর বাহির হয়, সোজাসুজি সেই রকম অভদ্র অমার্জিত হত্যা, উপন্যাসের পাষাণেরা যে রকম রসালো খুন করে, সে রকম নয়।

মাধবীলতার ভয় পাওয়ার আরেকটা কারণ ছিল।

সদানন্দ তখন মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে, তাকে নূতন আশ্রমে সরানোর আয়োজন চলিতেছে। একদিন হঠাৎ নির্জন বারান্দায় সদানন্দের সামনে পড়িয়া সে পাশ কাটাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছে, সদানন্দ ডাকয়া বলিয়াছিল, একটা কথা শোন মাধু।

মাধবীলতা কথা শুনিতে দাঁড়ায় নাই। তখন তীব্র চাপা গলায় সদানন্দ বলিয়াছিল, একদিন তোমায় হাতে পেলে গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেব।

তখন কথাটার দাম ছিল না। আজ মূর্ছা যাওয়ার আগে মনে হইয়াছিল সদানন্দের পক্ষে ও কাজটা অসম্ভব কি?

বিভূতি জিজ্ঞাসা করে, কেন গিয়েছিলে?

মাধবীলতা জবাব দেয়, তোমার পেছনে কেন পুলিশ লেলিয়ে দিল!

মাধবীলতার সর্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, জাগিয়া আছে তবু ঘুমেই দুচোখ বুজিয়া গিয়াছে। মনের মধ্যে একটা ধিক্কার-ভরা আত্ননাদ গুণ্ণুনানো গানের মতো মৃদু চাপা সুরে গুমরাইতেছে। কি হইয়াছে? কেন হইয়াছে? কোথায় হইয়াছে? কবে হইয়াছে? কিছুই যেন মনে নাই। অবসাদের যন্ত্রণা যে এমন বৈচিত্র্যময় সকলেই তা জানে, তবু সকলের পক্ষেই এটা কে তা। জানিতর পর্যায়ে।

[লেখকের মন্তব্য : অনেকে বিশ্বাস করে না, তবু জীবনের একটা চরম সত্য এই যে, সমস্ত অন্যায় আর দুর্নীতির মূলভিত্তি জীবনীশক্তির দ্রুত অপচয়-ব্যক্তিগত অথবা সম্ভবদ্ব জীবনের। যতই বিচিত্র আর জটিল যুক্তি ও কারণ মানুষ খাড়া করুক, ভালো-মন্দ উচিত-অনুচিত মানুষ ঠিক করিয়াছে এই একটি মাত্র নিয়মে। অবশ্য, মানুষের ভুল করা স্বভাব কিনা, তাই এমন একটা সোজা নিয়ম মানিয়া জীবনের রীতিনীতি স্থির করিতে গিয়াও কত যে ভুল করিয়াছে, তার সংখ্যা নাই।

মাধবীলতার তৃপ্তি উবিয়া যায় নাই, অবসাদের যন্ত্রণায় নিচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে মাত্র। এটা অনুতাপ নয়।]

সে রাত্রে আর বেশি জেরা করা গেল না। কারণ, বিড়বিড় করিয়া কয়েকটা ভাঙা ভাঙা দুর্বোধ্য কথা বলিতে বলিতে মাধবীলতা ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন সে অনেক কথাই বলিল বটে কিন্তু বিভূতি ভালো করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। মাধবীলতার অনেক কথার মানেটা দাঁড়াইল সেই একই কথায়, সে গিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া বলিয়া আসিয়াছে বিভূতির পিছনে আর যেন সদানন্দ পুলিশ না লাগায়। কথাটা জটিলও নয়, দুর্বোধ্যও নয়, তবু বিভূতির মনে হইতে লাগিল, মাধবীলতা যেন একটা খাপছাড়া কাজ করিয়া

ব্যাখ্যা আর কৈফিয়তের বদলে একটা হেঁয়ালি রচনা করিতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে মাধবীলতা একদিন যার বিরুদ্ধে তার কাছে নালিশ করিয়াছিল আর সে যাকে গিয়া মারিয়াছিল ঘুসি, এতকাল এক বাড়িতে আর বাড়ির কাছে আশ্রমে থাকার সময় যে মাধবীলতা তার ধারেকাছে ঘেঁষে নাই। এখন বলা নাই কওয়া নাই এত দূর আশ্রমে গিয়া তার হাতে পায়ে ধরিয়া সাধিয়া আসিল যেন বিভূতির পিছনে আর পুলিশ না লেলাইয়া দেয়। কচি খুকি। তো সে নয় যে এটুকু জ্ঞান তার নাই, এভাবে তার সদানন্দের হাতে পায়ে ধরিয়া সাধিতে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না? তার ভালোর জন্য গিয়াছিল? তার বিপদের ভয়ে দিশেহারা হইয়া? কথাটা ভাবিতে ভালো লাগে কিন্তু বিশ্বাস যে করা যায় না। দিশেহারা আতঙ্ক ছাড়া আর কিছুতেই প্রকাশ পায় না সে আবার কোন দেশী সৃষ্টিছাড়া প্রেম, সে প্রেম মাধবীলতা পাইলই বা কোথায়? তাছাড়া দিশেহারা আতঙ্কের আর কোনো লক্ষণ তো তার মধ্যে দেখা যায় নাই?

মনটা এমন খারাপ হইয়া গেল বিভূতির বলিবার নয়। আটক থাকার সময় প্রায়ই যেমন মনে হইত সব ফাঁকি আর সব ফঁকা, কাঁটা বিছানো বিছানায় এপাশ ওপাশ করাটাই জীবন আর মেশানো আলো অন্ধকারের আবছা অর্থহীন উপমার মতো স্মৃতি-কল্পনা আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখের খিচুড়ি পাকানো ভোঁতা অনুভূতিগুলির মাথার মধ্যে মাথাধরার মতো টিটিপ্ করাটাই বাঁচিয়া। থাকার একমাত্র অভিব্যক্তি, আজ তেমনি মনে হইতে লাগিল, মাধবীলতাও যে তার আপন নয়, এই সত্যটা ধীরে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হওয়াটাই তাকে আপন করিতে চাওয়ার একমাত্র সম্ভবপর পরিণতি। আটক থাকার সঙ্গে মাধবীলতা আপন নয় ভাবার পার্থক্য অনেক, কিন্তু মন খারাপ হওয়াটা একরকম কেন, এই দার্শনিক সমস্যাটা মনে উদয় হওয়ায় বিভূতি একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেল এবং সকল অবস্থার সুখদুঃখ একই রকম কিনা এই কথাটা ভাবিতে আরম্ভ করায় আধঘণ্টার মধ্যে ঘটিয়া গেল স্নায়বিক বিপর্যয়। তখন, মৃদুস্বরে সে ডাকিল, মাধু।

আজ অবসাদ কমিয়াছে, কারণ বিভূতির রকমসকম দেখিয়া অল্প অল্প ভয়ের উত্তেজনা আসিয়াছিল। ঘুম তাই একেবারেই আসে নাই। ঘুমের ভানে মাধবীলতা এমনভাবেই সাড়া

দিল যে, পরমুহূর্তে আকস্মিক আবেগে বিভূতি তাকে জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু কি মৃদু আর সশঙ্ক সে আলিঙ্গন, পিজর যদি মাধবীলতার পাটখড়ির হইত, তবু ভাঙিবার কোনো ভয় ছিল না।

অনেকগুলি দিন কাটিয়া গেলে হয়তো আবার একদিন আশ্রমে যাওয়ার সাধটা মাধবীলতার। অদম্য হইয়া উঠিত কিন্তু কয়েকটা দিন কাটিবার আগেই একদিন মহেশ চৌধুরী বলিল, চল মা, একবার আশ্রম থেকে ঘুরে আসি।

না গেলেও চলিত, খুব বেশি ইচ্ছাও ছিল না যাওয়ার, তবু মাধবীলতা শ্বশুরের সঙ্গে আশ্রমে বেড়াইতে গেল। তখন সকালবেলার মাঝামাঝি, আবহাওয়া অতি উত্তম। এক বছর সদানন্দের উপদেশ শোনার চেয়ে এক বছর আশ্রমে পায়চারি করিলে প্রকৃতির প্রভাবেই মনের বেশি উন্নতি হয়। মহেশ চৌধুরীকে একটু চিন্তিত দেখাইতেছিল। চিন্তা মহেশ চৌধুরী চিরকালই করিয়া থাকে কিন্তু বেশ বোঝা যায় যে, এখন তার মুখের ছাপটা দুর্ভাবনার। কি হইয়াছে কে জানে!

গাছতলায় আশ্রমের সকলে সদানন্দকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। প্রাচীন ভারতের তপোবনে শিষ্যবেষ্টিত ঋষির ছবি যার কল্পনায় আছে, দেখিলেই তার মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। মহেশ চৌধুরী ভুরু কুঁচকাইয়া বিস্ময়ের সঙ্গে চাহিয়া থাকে আর মৃত্যুর মধ্যে জীবনের কতখানি শেষ হইয়া যায় সকলকে তার হিসাব বুঝাইতে বুঝাইতে হাসিমুখে সদানন্দ মাথাটা হেলাইয়া তাকে অভ্যর্থনা জানায়। মাধবীলতা রত্নাবলীর কাছে গিয়া বসে আর সদানন্দের ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া মহেশ চৌধুরী বসে সকলের পিছনে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বেশ বুঝিতে পারা যায় একমনে সে সদানন্দের কথা শুনিতোছে, অসম্ভব কিছু সম্ভব হইতে দেখিবার বিস্ময়ের সঙ্গে।

অন্য সকলের, পুরুষ ও নারীদের, বিস্ময় নাই। সকলে মুগ্ধ, উত্তেজিত। কথা শেষ করিয়া সদানন্দ হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়ায়, ধীরে ধীরে একা নদীর দিকে আগাইয়া যায়। যে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি ক্ষণকালের স্তব্ধতার শেষে শুরু হয়, তার মধ্যে অনেকগুলি আত্মসমর্পিত

মনের সার্থকতার আনন্দ যেন রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের মতো প্রাঞ্জল মনে হয়। অন্তত মহেশের যে মনে হয় তাতে সন্দেহ নাই, কারণ সে আরো বেশি খতমত খাইয়া সদানন্দের গতিশীল মূর্তির দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে।

রত্নাবলীর সঙ্গে তার কুটিরে যাওয়ার আগে মাধবীলতা তাকে খবরটা দিতে আসিল, ফিরিবার সময় যাতে তাকে খোঁজ করার হাঙ্গামা না বাধে।

মহেশ চৌধুরী বলিল, আমরা আজ এখানে থাকব মাধু।

সারা দিন?

সারা দিন তো বটেই, সারা রাতও থাকতে পারি।

মাধবীলতা এই উদ্ভট সিদ্ধান্তের কারণটা জানিবার চেষ্টা আরম্ভ করার আগেই মহেশ চৌধুরী উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সদানন্দ তখন চোখের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে। নদীর ধারে অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও তার দেখা না পাইয়া মহেশ চৌধুরী অবশ্য বুঝিতে পারিল যে, নদীর দিকের খিড়কি দরজা দিয়া সদানন্দ কুটিরে ফিরিয়া গিয়াছে, কিন্তু নিজে সে কুটিরে ঢুকি না। রত্নাবলীর কুটিরে ফিরিয়া গিয়া মাধবীলতাকে বলিল, ওঁকে একবার ডেকে আন তো মাধু।

মাধবীলতা অবাক! ডেকে আনব? এখানে?

হ্যাঁ। বলগে, আমি একবার দেখা করতে চাই।

মহেশ চৌধুরী হুকুম দিয়া ডাকিয়া আনিয়া দেখা করিবে সদানন্দের সঙ্গে। প্রতিবাদ করিতে গিয়া কিছু না বলিয়াই মাধবীলতা চলিয়া গেল। হঠাৎ তার মনে পড়িয়া গিয়াছিল মহেশ চৌধুরীর পাগলামির মানে বুঝিবার ক্ষমতা এতদিন এক বাড়িতে থাকিয়াও তার জন্মে নাই।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে, রত্নাবলী যখন ব্যস্ত আর বিব্রত হইয়া বার বার বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে, তার একবার গিয়া খোঁজ করিয়া আসা উচিত, মাধবীলতা ফিরিয়া আসিল। সদানন্দ বলিয়া পাঠাইয়াছে, দেখা করিবার দরকার থাকিলে মহেশ চৌধুরী যেন সন্ধ্যার পর তার সঙ্গে দেখা করিয়া আসে। শুনিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া মহেশ চৌধুরী বলিল, চল আমরা ফিরে যাই মাধু।

সারা দিন এখানে থাকবেন বলেছিলেন যে?

আর থেকে কি হবে? ভেবেছিলাম মানুষটা বুঝি হঠাৎ বদলে গেছে, কিন্তু মানুষ কি কখনো বদলায়?

মানুষ যে বদলায় না, তার আরেকটা মস্ত বড় প্রমাণ পাওয়া গেল ফিরিবার পথে। চরডাঙ্গা গ্রামের কাছাকাছি মস্ত একটা মাঠে পঁচিশত্রিশ জন অর্ধ-উলঙ্গ নোংরা মানুষকে আত্মহত্যা করিতে বিভূতি নিষেধ করিতেছে। মুখে ফেনা তুলিয়া এমনভাবে নিষেধ করিতেছে যেন কোনোরকমে এই লক্ষ্মীছাড়া বোকা মানুষগুলোকে কথাটা একবার বুঝাইয়া দিতে পারিলেই তারা হত্যা করিবে।

তবু আর এভাবে আত্মহত্যা করিবে না।

একসঙ্গে খাইতে বসিয়া মহেশ চৌধুরী সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিল, আবার কি তুমি জেলে যেতে চাও?

সাধ করে কেউ জেলে যায়?

বিভূতির মেজাজটা ভালো ছিল না।

অমন করে ওদের ক্ষেপিয়ে তুললে জেলেই তো যেতে হয় বাবা? একটু কিছু ঘটলেই তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

নেয় নেবে।

মহেশ চৌধুরী ডালমাখা ভাত খায় আর ভাবে। বুঝাইয়া কোনো লাভ হইবে না। এই কথাটাই অনেকবার অনেকভাবে ছেলেকে সে বুঝাইয়াছে যে, অকারণে জেলে গিয়া কোনো লাভ হয় না, সেটা নিছক বোকামি-কাজের মতো কোনো কাজ করিয়া ছেলে তার হাজার বার জেলে যাক, হাজার বছরের জন্য জেলে যাক, মহেশ চৌধুরীর তাতে তো কোনো আপত্তি নাই! কিন্তু পাহাড়ে উঠিবার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার মতো দেশ আর দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য চোখ কান বুজিয়া জেলে যাওয়ার তো কোনো অর্থ হয় না। মনে হইয়াছিল, বিভূতি বুঝি কথাটা বুঝিতে পারিয়াছে বিভূতি চুপচাপ শুনিয়া গিয়াছে, তর্কও করে নাই, নিজের মতামত জাহির করিবার চেষ্টাও করে নাই। আজ আবার মহেশ চৌধুরীর মনে হইতে লাগিল, অনেক দিন পরে বাড়ি ফিরিয়া সে শুধু বাপের সঙ্গে কথা কাটাকাটি এড়াইয়া চলিয়াছিল, কথাগুলি তার মাথায় ঢোকে। নাই।

একবার টোক গিলিয়া মহেশ চৌধুরী এক চুমুকে জলের গ্লাসটা প্রায় অর্ধেক খালি করিয়া ফেলিল। ছেলেও যদি তার সহজ সরল কথা না বুঝিয়া থাকে-

অথবা এ সব কথা বুঝিবার নয়? মানুষ যা করিতে চায় তাই করে?

অল্প দূরে মহেশের পোমানা বিড়ালটি ঘাপটি মারিয়া বসিয়া ছিল। মাছের ঝোল পরিবেশন করিতে আসিবার সময় বেচারির লেজে কি করিয়া মাধবীলতার পা পড়িয়া গেল কে জানে, চমক দেওয়া আওয়াজের সঙ্গে লাফাইয়া উঠিয়া মাধবীলতার নতুন শাড়িখানা আঁচড়াইয়া চিড়িয়া দিল। মাছের ঝোলের থালাটি মাটিতে পড়িয়া গেল, বিড়ালটির মতোই বিদ্যুৎগতিতে লাফ দিয়া পিছু হটিতে গিয়া মাধবীলতা ধপাস করিয়া মেঝেতে পড়িয়া গেল পা ছড়াইয়া বসিবার ভঙ্গিতে। গায়ে তার আঁচড় লাগে নাই, পড়িয়া গিয়াও বিশেষ ব্যথা লাগে নাই, কিন্তু চিৎকার শুনিয়া মনে হইল তাকে বুঝি বাঘে ধরিয়াছে।

কাঠের মোটা একটা পিঁড়ি কাছেই পড়িয়া ছিল, দুহাতে পিঁড়িটা তুলিয়া নিয়া এমন জোরেই। বিভূতি বিড়ালটিকে মারিয়া বসিল যে, মরিবার আগে একটা আওয়াজ করার সময়ও বেচারির জুটিল না।

সকলের আগে মহেশ চৌধুরীর মনে হইল তার পোমানা জীবটি আর কোনোদিন লেজ উঁচু করিয়া তার পায়ে গা ঘষিতে ঘষিতে ঘড় ঘড়, আওয়াজ করিবে না। তারপর অনেক কথাই তার মনে হইতে লাগিল।

জটিল, খাপছাড়া, সব রাশি রাশি কথা চিন্তাগুলি যেন হেঁড়া কাগজের মতো মনের ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ দমকা হাওয়ায় এলোমেলো উড়িতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এ রকম অবস্থায় মহেশ চৌধুরী কথা বলে না। তাছাড়া আর উপায় কি আছে? এমন অভ্যাস জন্মিয়া গিয়াছে। যে, বিচার-বিবেচনার পর একটা কিছু সিদ্ধান্ত দিয়া না বুঝিলে মনের ভাব আর প্রকাশ করা যায় না। আত্মা-বিরোধী মত যদি কিছু প্রকাশ করিয়া বসে? সেটা প্রায় সর্বনাশের শামিল। কেন সর্বনাশের শামিল, তা অবশ্য মহেশ চৌধুরী কখনো ভাবিয়া দেখে নাই, তবে ক্ষতির সম্ভাবনাকে আত্মরক্ষী জীবমাত্রেরই ভয় করে। নিজের সুখ-দুঃখের মুখাপেক্ষী করার নীতি যাকে মানিয়া নিতে হয়, অস্বাভাবিক সংযম তার একমাত্র বর্ম। রাগে, দুঃখে, অভিমানে বিচলিত হওয়া মহেশ চৌধুরীর পক্ষে সম্ভব, কিন্তু উচিত কি অনুচিত না জানিয়া পোষা বিড়ালকে মারার জন্য বিভূতিকে চড়চাপড়টা মারিয়া বসাও সম্ভব নয়, গালাগালি দেওয়াও সম্ভব নয়।

কয়েকবার টোঁক গিলিয়া মহেশ চৌধুরী একেবারে চুপ করিয়া যায়। অন্য বিষয়েও একটা শব্দ আর তার মুখ দিয়া বাহির হয় না। খাওয়াও তখনকার মতো শেষ হয় সেইখানে।

বিস্ফারিত চোখে খানিকক্ষণ মরা বিড়ালটার দিকে চাহিয়া থাকিয়া মাধবীলতা প্রথম ভয়ে ভয়ে। কথা বলে, কেন মিরলে? কি নিষ্ঠুর তুমি!

যেখানে যেখানে আঁচড় দিয়েছে, আইডিন লাগিয়ে দাও গিয়ে।

আঁচড় লাগে নি।

কথাটা বিভূতি সহজে বিশ্বাস করিতে চায় না। একটুও আঁচড় দেয় নাই? একেবারে না? কি আশ্চর্য ব্যাপার! তবে তো বিড়ালটাকে না মারিলেও চলিত। বোকার মতো একটু হাসে বিভূতি, মরা বিড়ালটার দিকে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া নেয়। বেশ বুঝিতে পারা যায় সে যেন একটু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে বিস্ময়ে নয়, ব্যথা লাগে না এমন কোনো আকস্মিক ও প্রচণ্ড আঘাতে। মহেশ চৌধুরীর নির্বাক থাকার চেয়ে বড় সংযম যেন বিভূতির দরকার হইতেছে শুধু সহজ নির্বিকার ভাবটা বজায় রাখতে। বিচলিত হওয়ার উপায় তো বেচারির নাই। মনের কোমল দুর্বলতা যদি প্রকাশ পাইয়া যায়? সেটা প্রায় সর্বনাশের শামিল। কেন সর্বনাশের শামিল, তা অবশ্য বিভূতি কখনো ভাবিয়া দ্যাখে নাই, তবে অন্যায়-বিরোধী মানুষমাত্রেই নিজের দুর্বলতাকে চাপা দিতে চায়। পরের দুঃখ কমানোর জন্য নিজের দুঃখকে তুচ্ছ করার নীতি যাকে মানিয়া নিতে হয়, অস্বাভাবিক সংযম তারও বর্ম। অনুতাপে খতমত খাইয়া যাওয়া বিভূতির পক্ষে সম্ভব, কিন্তু স্ত্রীকে আক্রমণ করার জন্য তুচ্ছ একটা বিড়ালকে শাস্তি দিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

চাকর বিড়ালের দেহটা তুলিয়া নিয়া যায়। বিভূতি আবার খাইতে আরম্ভ করে। খাইতে খাইতে ধীরে ধীরে সে আত্মসংবরণ করিতে থাকে। আত্মসংবরণ করিতে সময় তার বেশিক্ষণ লাগে। না, খাওয়াদাওয়ার পর মাধবীলতা যখন আজ শশধরের বৌয়ের সঙ্গে গল্প করার বদলে পান হাতে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়, বিভূতির মন তখন কঠিন কর্তব্য সম্পন্ন করার গাঢ় আর আঠার মতো চটচটে তৃপ্তিতে ভরিয়া গিয়াছে। দুপুরটা সেদিন দুজনের গভীর আনন্দে কাটিয়া গেল। পুরুষ আর নারীর প্রথম যৌবনের সব দুপুর ও রকম আনন্দে কাটে না।

বিভূতির মা ঘরে যায় দুধের বাটি হাতে। মহেশ একরকম কিছুই খায় নাই।

খাও?

মহেশ কথা বলে না, শুধু মাথা নাড়ে। কিন্তু শুধু মাথা নাড়িয়া পতিব্রতা স্ত্রীকে কে কবে ঠেকাইতে পারিয়াছে? শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিতে হয়, কেন জ্বালাতন করছ? এখন কিছু খাব না।

কেন খাবে না?

বিভূতির মার নিজেরও খাওয়া হয় নাই, ক্রমে ক্রমে মেজাজ চড়িতেছিল, আবার খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া মহেশ যখন সংক্ষেপে কৈফিয়ত দেয় যে, মনের উত্তেজনার সময় খাইলে শরীর খারাপ হয়-বিভূতির মার মেজাজ রীতিমতো গরম হইয়া ওঠে।

কচি খোকার মতো কি যে কর তুমি!

ভালো করিয়া কথা বলিলে, এমন কি রীতিমতো ঝগড়া করিলেও, হয়তো বিভূতির মা তখনকার মতো শুধু রাগে গগর করিতে করিতে চলিয়া যাইত, এক ঘণ্টা পরে আবার ফিরিয়া আসিত দুধের বাটি হাতে। কিন্তু এভাবে কথা পর্যন্ত বলিতে না চাহিলে কি মানুষের সহ্য হয়? বিভূতির মা তো আর জানি না, নিজের মনের সঙ্গে মহেশ বোঝাপড়া করিতেছে, কত যে বিচার-বিশ্লেষণ চলিতেছে, তার সীমা নাই। খোলা দরজা দিয়ে দুধের বাটিটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বিভূতির মা আগাগোড়া একটা বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়া দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া রহিল।

তখন মনটা মহেশ চৌধুরীর বড় খারাপ হইয়া গেল। কি দোষ করিয়াছে বিভূতির মা? অন্যের পাপে সে কেন কষ্ট পায়? সেদিনের কথা মহেশের মনে পড়িতে থাকে, সদানন্দের কুটিরের সামনে তার সঙ্গে বিভূতির মা যখন গাছতলায় বৃষ্টিতে ভিজিতেছিল। বিছানার একপ্রান্তে পা গুটাইয়া বসিয়া। মহেশ ভাবিতে থাকে। বিভূতির মাকে তুলিয়া খাওয়ানো যায়, সেটা তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু কি লাভ হইবে? বিভূতির সম্বন্ধে যা সে ভাবিতেছে, তাই যদি স্থির করিয়া ফেলে, তখন বিভূতির মাকে যে কষ্টটা ভোগ করিতে হইবে, তার তুলনায় এখনকার এ কষ্ট কিছুই নয়।

বিভূতিকে বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে বলিবে কিনা, এই কথাটাই মহেশ ভাবিতেছিল। বিড়াল মারার জন্য নয়, বিভূতির প্রকৃতি যে কখনো বদলাইবে না, এটা সে ভালো করিয়া টের পাইয়া গিয়াছে বলিয়া। এখন বিভূতিকে বাড়িতে থাকিতে দেওয়ার অর্থই কি তাকে সমর্থন করা নয়? শুধু ছেলে বলিয়া তাকে আর কি ক্ষমা করা চলে, চোখ কান পুঁজিয়া আর কি আশা করা চলে এখনো তার সংশোধন সম্ভব? বিনা প্রতিবাদে এখন চুপ করিয়া থাকা আর বিভূতিকে স্পষ্ট বলিয়া দেওয়া যে, সে যা খুশি করিতে পারে, এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। তার ছেলে বলিয়া বিভূতির অন্যায় করার যে বিশেষ সুযোগসুবিধা আছে, মানুষের উপর যে প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, বিভূতিকে জানিয়া শুনিয়া সে সমস্ত ব্যবহার করিতে দেওয়া আর তার নিজের অন্যায় করার মধ্যেই বা পার্থক্য কি? মনে মনে মহেশ চৌধুরী স্পষ্টই বুঝিতে পারে, এ বিষয়ে আর ভাবিবার কিছু নাই, বিভূতিকে বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা উচিত কি অনুচিত, এটা আর প্রশ্নই নয়, এখন আসল সমস্যা দাঁড়াইয়াছে এই যে, বিভূতি তার ছেলে। বিভূতি যে তার স্ত্রীরও ছেলে, এটা এতক্ষণ মহেশের যেন খেয়াল ছিল না। বিভূতির মার চাদরমুড়ি দেওয়া মূর্তি এই আসল সমস্যাটাকে তাই একটু বেশিরকম জটিল করিয়া দিয়াছে।

বিভূতির মার ছেলেকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেওয়ার অধিকার কি তার আছে?

ভালো ছেলে, সৎ ছেলে, আদর্শবাদী ছেলে গ্রামে আর এমন ছেলে নাই। কেবল বুদ্ধিটা একটু বিকৃতভালো মন্দের ধারণাটা ভুল। অনেকগুলি মানুষকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার আনন্দ, দুদিন পরে যখন প্রচণ্ড একটা সংঘর্ষ ঘটিয়া যাইবে, কতকগুলি মানুষ যাইবে জেলে আর কতকগুলি যাইবে হাসপাতালে আর কতকগুলির দেহ উঠিবে চিতায়, আনন্দের তখন আর তার সীমা থাকিবে না। জেল, হাসপাতাল বা চিতা, এর কোনোটার জন্য নিজেরও অবশ্য তার ভয় নাই। ছেলের এই নির্ভীকতাও মহেশের আরেকটা বিপদ। নিজের কথা যে ভাবে না, স্বাধীনভাবে চলাফেরার বয়স যার হইয়াছে, ছেলে বলিয়া আর মতের সঙ্গে মত মেলে না বলিয়া তার উপর বাপের অধিকার খাটানোর কথা ভাবিতে মনটা মহেশের খুঁতখুঁত করে।

মহেশ চৌধুরী নির্বাক হইয়া থাকে প্রায় তিন দিন। গম্ভীর নয়, বিষণ্ণ নয়, উদাস নয়, শুধু নির্বাক। বিভূতির মাও নির্বাক হইয়া থাকে, কিন্তু তাকে বড় বেশি গম্ভীর, বিষণ্ণ আর উদাস মনে হয়।

বিভূতি বলে, কি হয়েছে মা?

বিভূতির মা বলে, কিছু হয় নি।

বিভূতি পিছন হইতে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কানের কাছে মুখ নিয়া চুপি চুপি বলে, শোন, আমার জন্যে ভেব না। ভয় নেই, আমি আর জেলে যাব না। সে সব ছেলেমানুষি বোকামির দিন কেটে গেছে।

তবু বিভূতির মার প্রথমটা মন-মরা ভাব কাটিতে চায় না। বরং বাড়িবার উপক্রম হয়। কারণ, একদিন মহেশ চৌধুরী সোজাসুজি বিভূতির সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্তের কথাটা তাকে শুনাইয়া দেয়।

বিভূতির মা প্রথমটা শোনে হাঁ করিয়া, তারপর সঁতে দাঁতে ঘষিয়া বলে, বেশ তো, তাড়িয়ে দাও।

তুমি কি করবে?

আমিঃ গলায় কলসী বেঁধে পুকুরে গিয়ে ডুব দেব।

সত্যি? না, তামাশা করছ?

ছোট ছেলেকে প্রথমভাগ পড়ানোর মতো ধৈর্যের সঙ্গে বিভূতির মা বলে, দ্যাখ, স্পষ্ট কথা বলি তোমাকে, শোন। তুমি না থাকলেও আমার একরকম করে দিন কেটে যাবে, কিন্তু ছেলে ছাড়া আমি বাঁচব না বলে রাখছি।

মহেশ তা জানি, এতদিন খেয়াল করে নাই।

এই কথা ভাবছ বুঝি কদিন? বিভূতির মা জিজ্ঞাসা করে।

মহেশ চৌধুরী নীরবে মাথা হেলাইয়া সায় দেয়।

বিভূতির মা তার মুখের সামনে হাত নাড়িয়া বলে, কেন শুনি? কি জন্যে শুনি? ওর কথা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার কি শুনি? ছেলে বড় হয়েছে বিয়ে-থা দিয়েছ, তার যা খুশি সে করুক। তোমার তাতে কি? তোমার কাজ তুমি করে যাও, তার কাজ সে করুক তুমি কেন ওর পেছনে লাগতে যাবে?

মহেশ ভাবিতে ভাবিতে বলে, নিজের কাজ করার জন্যই তো ওর পেছনে লাগতে হচ্ছে গো।

ভাবিতে ভাবিতে মহেশ চৌধুরীর দিন কাটে। মানুষটার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে সদানন্দের অধঃপতনের আঘাতে অথবা সদানন্দের সম্বন্ধে ভুল করার ধাক্কায়। আর যেন নিজের উপর সে সহজ বিশ্বাস নাই। সমস্ত প্রশ্নই আজকাল ধাধার মতো মনে হয়। কত সন্দেহই যে মনে জাগে। জীবনের পথে চলিবার জন্য আত্মবিশ্বাসের একটিমাত্র রাজপথ ধরিয়া এতকাল চলিবার পর বুদ্ধিবিবেচনা যেন ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন পথের অস্তিত্ব দেখাইয়া তার সঙ্গে খেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বিভূতির মার সঙ্গে আলোচনা করার পর একটা যে প্রচণ্ড সংশয় মহেশের মনে জাগে, তার তুলনা নাই। বিভূতি সম্বন্ধে কি করা উচিত স্থির করিয়া ফেলার পর সেটা করা সত্যই উচিত কিনা। সে বিষয়ে আরো কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি তার মনে আসিয়াছে, প্রথমে যা খেয়ালও হয় নাই। বিভূতির সম্বন্ধে কি করা উচিত জানিয়াও তা না করা এক কথা-নিজের অনেক দুর্বলতার মধ্যে একটির সম্বন্ধে সুনিশ্চিত প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা যায় আর দুঃখিত হওয়া চলে। কিন্তু এ তো তা নয়। অনেক বিষয়-বিবেচনা না করিয়াই সে যে কি করা উচিত স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। তার সমস্ত বিচার-বিবেচনাই কি অসম্পূর্ণ, একপেশে? কেবল উপস্থিত প্রমাণ-প্রয়োগের উপর

নির্ভর করিয়া আদালতের চোখ-কান বুজিয়া বিচার করার মতো নিজের জ্ঞান আর বুদ্ধির উপর নির্ভর করাই কি তার নিরপেক্ষতা একটা প্রশ্ন সম্বন্ধে কত কথা ভাবিবার থাকে, নিজের ভাবিবার ক্ষমতা দিয়া কি সে প্রশ্নের মীমাংসা করা উচিত, যদি মীমাংসা করার আগেই সমস্ত কথাগুলি ভাবিবার ক্ষমতা না থাকে? চিরজীবন সে কি এমনি ভুল করিয়া আসিয়াছে? মানুষ কি এমনি ভুল করে, পৃথিবীর সব মানুষ?

মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জানে আর নূতন জ্ঞানের আলোকে এই ভুলকে আবিষ্কার করে?

এবং হয়তো আবার নূতন জ্ঞানের আলোকে আবিষ্কার করে যে, এই আবিষ্কারটাও মিথ্যা?

সুতরাং বিষম এক জটিল সমস্যা নিয়া মহেশ চৌধুরী বড়ই বিব্রত হইয়া পড়ে। ব্যাপারটা কিন্তু হাস্যকর মোটেই নয়। জগতে এমন কে চিন্তাশীল আছে, এ সমস্যা যাকে পীড়ন না করে? এ সংশয়ের হিমালয় না ডিঙাইলে তো চরম সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

[লেখকের মন্তব্য : মহেশ চৌধুরীর আসল সমস্যার কথাটা আমি একটু সহজভাবে পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিই। বলার প্রয়োজনও আছে। মহেশ চৌধুরীর মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়াইলে তার মনের অবস্থাটা বোঝা সম্ভব, ধাধাটা পরিষ্কার হওয়া সম্ভব নয়।

কোনো প্রশ্নের বিচারের সময় সেই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত যুক্তিতর্ক বিবেচনা করা উচিত, এই কথাটা মহেশ চৌধুরীর মনে হইয়াছে। কথাটা গুরুতর বটে, যুক্তিসঙ্গতও বটে। কিন্তু মুশকিল এই, কেবল প্রশ্ন নয়, জগতে এমন কি আছে, যার সঙ্গে জগতের অন্য সমস্ত কিছু সংশ্লিষ্ট নয়? অস্তিত্বের অর্থ তাই সমগ্রতা। বিচ্ছিন্ন কোনো কিছুর অস্তিত্ব নাই। এদিকে মানুষের মস্তিষ্ক এমন যে, সেখানে এক সময় একটির বেশি সমগ্রতার স্থান হয় না অংশও মস্তিষ্কের পক্ষে সমগ্র। জগতের অসংখ্য আংশিক সমগ্রতাকে ধারাবাহিকভাবে বিচার করিয়া কোনো প্রশ্নের জবাব পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীর সমস্ত দর্শন তাই একটিমাত্র উপায় অবলম্বন করিয়াছে আংশিক সমগ্রতার পরিধি বাড়াইয়া চলা। দুটি অংশের একত্ব আবিষ্কার করিয়া, দুটি আংশিক সমগ্রতাকে এক করিতে পারিলে জ্ঞানের পথে চরম বা পরম সত্য আবিষ্কারের পথে, এক পা অগ্রসর

হওয়া গেল। আজ পর্যন্ত কেউ বিশ্বের সমগ্রতাকে নিজের ব্যক্তিগত একটিমাত্র সমগ্রতায় পরিণত করিতে পারিয়াছে কিনা, ভবিষ্যতে কোনোদিন পারিবে কিনা, জানি না।

তবে, সীমাবদ্ধ জ্ঞান মানুষকে এমনভাবে সংগ্রহ করিতে হয়, সঙ্কীর্ণ জীবনের তুচ্ছ সমস্যার বিচারও করিতে হয় এমনভাবে। তা ছাড়া আর উপায় নাই। জন্ম হইতে সকলে আমরা করিয়াও আসিতেছি তাই। শৈশবেও সমস্যার মীমাংসা করিয়াছি, আজো করিতেছি। তখন যেটুকু জ্ঞান . আয়ত্তে ছিল কাজে লাগাইতাম, আজ যেটুকু জ্ঞান আয়ত্তে আছে কাজে লাগাই। তখনকার জ্ঞান হয়তো ছিল মোটে কয়েকটি টুকরা জ্ঞানের যোগফল, আজকের জ্ঞান হয়তো অনেক বেশি টুকরার মিলিত পরিণাম, কিন্তু তখনো যেমন আর টুকরাগুলির জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে মাথা ঘামাইতাম না, আজো ঘামাই না। জলের সঙ্গে জল মেশার মতো, আলো মেশার মতো, আলোর সঙ্গে আলো মেশার মতো, মিলিত আংশিক জ্ঞানের পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়াছে।

সমস্ত মানুষ, মনের মধ্যে কোনো প্রশ্ন জাগিলে, সাময়িক যুক্তি বা সত্যোপলব্ধির সম্পত্তি দিয়া তার বিচার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জবাবও পায়। জবাব না মানা আর নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করা আর নিজের ভবিষ্যৎ পরিবর্তিত যুক্তি বা সত্যোপলব্ধির কাছে আপিলের ভরসা করা। অবশ্য ভিন্ন কথা। তবে সাধারণ আপিলের ফলটাও হয়তো মন মানিতে চায় না-শেষ যুক্তি বা শেষ সত্যের আদালত খুঁজিয়া মরিতে হয়।

সীমাবদ্ধ সংক্ষিপ্ত জ্ঞানের জগতের সমগ্রতার আশীর্বাদ মানুষ ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছে। সংশয়বাদের রোগ ধরিয়াছে মানুষকে। প্রত্যেক প্রশ্নের বিচার করিতে আজ তাকে সেই প্রশ্নের সঙ্গে। সংশ্লিষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খোঁজ করিতে হয়। কে জানে এমন একদিন আসিবে কিনা, যেদিন কেহ আমার এই উপন্যাসটি পড়িতে বসিয়া প্রথম লাইনটি পড়িয়া ভাবিতে আরম্ভ করিবে, লাইনটির যে অর্থ মনে আসিয়াছে তাই কি ঠিক, অথবা প্রত্যেকটি শব্দের আর প্রত্যেকটি অক্ষরের অর্থ বিশ্লেষণ। করিয়া, ব্যাকরণের নিয়ম-কানুনগুলি ভালো করিয়া ঘটিয়া, শব্দতত্ত্ব আর ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান। অর্জন করিয়া লাইনটির মানে যাচাই করা উচিত?]

একটি দুপুর তো বিভূতির মাধবীলতার সঙ্গে অপরিসীম আনন্দে কাটিয়া গেল, কিন্তু রাত্রি? পরের দিনের দুপুরটা? তার পরের দিনগুলি? দুপুরটা যেন ছিল মাতালের মাঝরাত্রির মতো, শেষ হওয়ার সঙ্গে জীবনের আর কিছুই যেন রহিল না। তারপর কয়েকদিন ধরিয়া মাতলামির ক্ষুধায়। ভিতরটা যেন জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু স্নায়বিক বিকারের ভাটিখানায় বড় বেশি খামখেয়ালি চলে।

তাই আর কোনো কারণ, কোনো তুচ্ছতম নূতন ঘটনা না ঘটিলেও মাধবীলতার উপর অবিশ্বাসে বিভূতির যেন প্রায় বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। অনেক যুক্তিই মনে আসিতে লাগিল, তার মধ্যে সর্বপ্রধান, সে নিজে অতি অপদার্থ, আকর্ষণহীন, কুৎসিত পুরুষ। কেবল তাকে নিয়া খুশি থাকা মাধবীলতার পক্ষে কি সম্ভব?

হঠাৎ আবার একদিন বিভূতি জেরা আরম্ভ করে, কই, সেদিন আশ্রমে গিয়েছিলে কেন, তা তো বললে না?

মাধবীলতা ভয় পাইয়া বলে, বললাম যে?

কই বললে? ওই যে সেদিন বললাম।

হুঁ, বলিয়া বিভূতি চুপ করিয়া যায়।

গভীর বিতৃষ্ণায় পিছন ফিরিয়া সে শুইয়া থাকে, মাধবীলতা মৃদুস্বরে ডাকিলে বলে বড় ঘুম পাইয়াছে। ঘুম কিন্তু আসে না, মনের অস্বস্তি দেহের একটা অপরিচিত যন্ত্রণার মতো তাকে জাগাইয়া রাখে। মনে হয়, ঠিক চামড়ার নিচে সর্বাস্থে পেটের অম্বলের জ্বালা যেন ছড়াইয়া গিয়াছে আর বাহিরের গুমোটে তাতিয়া উঠিয়াছে মাথাটা। অথচ এমন আশ্চর্য ব্যাপার, শেষত্রে ঘুমাইয়া পরদিন যখন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙে, মনের অবস্থাটা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। পাশে যে অসতী স্ত্রী ছিল গত রাত্রে, অবিশ্বাসের সবকিছু ঝাড়িয়া ফেলিয়া আজ সকালে সে যেন চোখের আড়ালে সংসারের কাজ করিতে গিয়াছে।

আগের রাত্রে ধারণা আজ বিভূতির নিছক ছেলেমানুষি মনে হয়। এমন তুচ্ছ মনে হয় কথাটা যে, ও বিষয়ে একটু চিন্তা করাটাও তার কাছে পরিশ্রমের অপচয়ের শামিল হইয়া দাঁড়ায়। দুঃস্বপ্ন দেখিয়া যেন বিচলিত হইয়াছিল, দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে। অনুভূতির জগতে যদি বা একটা দুর্বোধ্য আতঙ্কের জের এখনো আছে, পেটে অম্বলের শত্রুতা নাই, দেহে টনটনানি নাই, মাথায় গ্রীষ্মবোধও নাই। একটু শুধু ভারি মনে হইতেছে দেহটা। বোধহয় হৃদয়ের ঈষৎ চাপা-পড়া বেদনাবোধের ভারে।

চা আর খাবার খাইয়া বিভূতি গ্রামের দিকে যায়। শেষরাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশে অল্প অল্প মেঘের জন্য রোদেরও তেমন তেজ নাই। ঘুরিতে ঘুরিতে বিভূতি গিয়া হাজির হয় শ্রীধরের দোকানে। দোকানের সামনে কাঠের বেঞ্চে বসিয়া কয়েকজন ফিসফাস করিতেছিল, বিভূতিকে দেখিয়া তারা অপরাধীর মতো চুপ করিয়া যায়।

শ্রীধর অভ্যর্থনা জানাইয়া বলে, আসেন। বসেন। বিড়ি খান?

বিভূতি বসে কতকটা উদাসভাবেই, মাথা নাড়িয়া বলে, বিড়ি তো আমি খাই না।

শ্রীধর সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া বলে, ঠিক বটে, শহরে ছিলেন এতকাল, আপনারা খান সিগারেট। তা তো নেই দাদাবাবু! তারপর কোথা হইতে কি করিয়া শ্রীধর যে মারাত্মক গান্ধীর্ষ মুখে টানিয়া আনে, সে-ই জানে, একটা অদ্ভুত আফসোসের শব্দ করিয়া বলে, শহর ভালো। জানেন দাদাবাবু, মোদের এ সব লক্ষ্মীছাড়া গাঁয়ের চেয়ে শহর ঢের ঢের ভালো। বৌ-ঝি নিয়ে নিস্তাবনায় ঘর তো করা চলে-ঘরের বৌ-ঝিকে তো কেউ জোর করে ধরে নিয়ে যায় না।

যারা ফিসফাস করিতেছিল, তারা সকলে একবাক্যে সায় দেয়। একজন, রামলোচন দে, কাঁচাপাকা চুলের বাবরিতে ঝাঁকি দিয়া বলে, আপনি তো বলে খালাস দাদাবাবু, মরি যে আমরা। হুঁ, নিজের দোষে মরি তো বটে, উপায় কি বলেন?

ক্রমে ক্রমে নানারকম আফসোসমূলক মন্তব্য ও প্রশ্নের বাধা ডিঙাইয়া আসল ব্যাপারটা বিভূতির বোধগম্য হয়। কারো বৌ-ঝি কেউ সম্প্রতি হরণ করে নাই, যদিও কিছুকাল আগে এ রকম একটা ব্যাপার এই গ্রামেই ঘটয়া গিয়াছে। সকলের বর্তমান রাগ, দুঃখ আর আফসোসের কারণটা এই। নন্দনপুরের ভদ্রলোকেরা গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুলিয়া পাকা নাটমন্দিরের অভাব মিটানোর জন্য খড়ের একটা চালা তুলিয়াছে। তার নিচে নানা উপলক্ষে, মাঝে মাঝে বিনা উপলক্ষেও, যাত্রাগান, কীর্তনগান প্রভৃতি হয়। খড়ের নাটমন্দিরটিতে স্থান একটু কম, তবে সাধারণ অনুষ্ঠানের সময় সেই স্থানও সবটা ভরে না। মুশকিল হয় ভালো দলের যাত্রা বা নাম-করা কীর্তনীয়ার কীর্তন বা ঐ রকম কোনো প্রোগ্রাম থাকিলে, যার আকর্ষণ আছে! তখন চালার নিচে অর্ধেক লোকের বসিবার স্থান হয় না, ভিড়ের বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতে হয়। তাতেও কোনো আপত্তি ছিল না, যদি ও-গ্রামের ভদ্রলোকেরা এগ্রামের ভদ্রলোকদের মাঝে মাঝে সামনে গিয়া বসিতে দিত।

জায়গা থাকলেও বসতে দেয় না দাদাবাবু। এগিয়ে গিয়ে বসতে গেলে ঠেলে পিছনে হটিয়ে দেয়। কেন আমরা শতরঞ্ধিতে বসতে পারি না সামনের দিকে? চাঁদা দিই না আমরা? ওকি তোদের বাপের সম্পত্তি যে, শুধু গাঁয়ের বাবুদের জন্যে বেদখল করে রাখিস?

আগের দিন শ্রীধর, রামলোচন এবং আরো অনেকে যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। সামনের দিকে। অনেকটা জায়গা খালি পড়িয়া আছে দেখিয়া যেই বসিতে গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে গলাধাক্কা। কে একজন শ্রীধরের পিঠে সত্যই একটা ধাক্কা দিয়াছিল এবং আরেকজন রামলোচনের বাবরি ধরিয়া দিয়াছিল টান।

শেষে ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাত্রা শুনি।

বিভূতি আশ্চর্য হইয়া বলে, তারপরেও যাত্রা শুনলে?

শুনব না? চাঁদা দিই নি আমরা?

বিভূতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া সকলের মন্তব্য শুনিয়া যায়, তারপর জিজ্ঞাসা করে, ওরা কি বলল, যারা তোমাদের ঠেলে সরিয়ে দিলে?

জবাব দিল শ্রীধর, কি আর বলবে দাদাবাবু, বলল, পিছন দিকে তোমাদের জন্যে বসবার জায়গা থাকে, আগে এসে বসতে পার না?

একটা দিন হয়তো বিশেষ কারণে—

একটা দিন? প্রত্যেকবার এমনি হচ্ছে, একটা দিন কি দাদাবাবু! মোদের গায়ের কেউ সামনে গিয়ে বসতে পায় না।

এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বিভূতির সাধ যায় না। মনে হয়, প্রতিবাদ করার মতো ব্যাপারও এটা নয়। যাত্রা শুনিতে গিয়া গ্রামের কয়েকজন বসিবার স্থান পায় নাই বলিয়া কি বিচলিত হওয়া চলে? তবু বসিবার স্থানের উপর এ-গ্রামের লোকেরও অধিকার আছে, স্থান থাকিলেও যদি তাদের বসিতে দেওয়া না হয়, সেটা অন্যায়। অন্যায়ের প্রতিকার করা কর্তব্য। নিজের চোখে দেখিয়া ব্যাপারটা ভালো করিয়া বুঝিবার উদ্দেশ্যে বিভূতি বলে, সামনের জন্মাষ্টমীতে যাত্রাটাত্রা হবে না?

শ্রীধর বলে, তিন রাত্তির হবে, অনেক মজা আছে দাদাবাবু।

বিভূতি বলে, তোমরা সবাই আমার সঙ্গে যে, দেখি কেমন বসতে না দেয়।

একজন একটু সংশয়ভরে জিজ্ঞাসা করে, কি করবেন?

বিভূতি হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলে, আমি একা কি করব? তোমরা সবাই করবে—জায়গা থাকলে সেখানে বসে পড়বে। আবার কি?